মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মাসিক

রোমাঞ্চ

১৯৮৯ পূজাবার্ষিকী

সম্পাদক

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - রুস্তম মুখার্জি

স্ক্যান করেছেন - পদিপিসি

এডিট করেছেন - পদিপিসি

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

মাসিক রোমাঞ্চ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬

With Best Compliments of :-

Telegram : KODEX (Cal)
Telephone : 52-7509/54-2200
55-0576

Indian Surgical Emporium

12, Indra Biswas Road, Calcutta-700037

Manufacturers & Dealers of :

SURGICAL DRESSINGS, MEDICAL DISPOSABLE PRODUCTS, SURGICAL LATEX PRODUCTS, SURGICAL EQUIPMENTS AND IMPORTERS OF SURGICAL EQUIPMENTS.

Distributors of :-

PHARMACEUTICAL DRUGS & CHEMICALS.

মাসিক রোমাঞ্চ

রোমাঞ্চ

৫৮ বর্ষ

শারদীয় সংখ্যা '৯৬

দুটি সুবৃহৎ গোয়েন্দা উপন্যাস

মোহিনী ॥ ১৩৭ ॥ অদ্রীশ বর্ধন

ভগ্ন অংশ ভাগ ॥ ২১৯ ॥ মনোজ সেন

একটি রহস্য নভেলেট

নিহত একজন ॥ ৫১ ॥ আনন্দ বাগচী

তিনটি বড় রহস্য গল্প

সাপের ছোবল ॥ ১১৬ ॥ অমিত চট্টোপাধ্যায়

দ্বিচারিণী ॥ ৯৩ ॥ অমল রায়

একটি খুনের ঘটনা ॥ ১৫ ॥ অনীশ দেব

পাঁচটি ছোট রহস্য কাহিনী

কাঠকয়লার আঁচড় ॥ ৪ ॥ বিমল কর

পা ॥ ৪১ ॥ শোভন সোম

হাবুল দারোগার গল্প ॥ ৪৪ ॥ অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

চোখের বাহিরে ॥ ৩৩ ॥ হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বিন্দু ॥ ২০৭ ॥ শ্রীধর সেনাপতি

প্রচ্ছদপট ॥ পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

এই সংখ্যার দাম কুড়ি টাকা

কাঠকয়লার আঁচড়

বিমল কর

ভূতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ নেই, আমি প্রত্নতত্ত্বজ্ঞও নই যে কলকাতা থেকে প্রায় দু'শো মাইল দূরে সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে মাচানময়না নামের এক গণ্ডগ্রামের বুনো গন্ধ খুব খুশি হয়েই হপ্তা তিনেক গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াতে সেখানে গিয়েছিলাম। না, আমার তেমন কোন উদ্দেশ্য ছিল না—মাচানময়নার মাটির তলায় কয়লা আছে না অন্য কিছু খনিজ সম্পদ, তা জানার প্রয়োজন আমার ছিল না, আয়রন ওর্-এর খোঁজ আমি করি নি। যদিও শুনেছিলাম, সুবর্ণরেখা নদীর যে ক্ষীণ জলস্রোত এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং তার দক্ষিণ বাঁকের মুখে যে জঙ্গল সেখানের মাটিতে একটি প্রাচীন জনপদের ইতিহাস স্তূপ, পাথর এবং নানা গহ্বরে নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে মিশে আছে—তবু সে সম্পর্কে কোন আকর্ষণ আমি বোধ করি নি। মাচানময়নায় কিছু বিশেষ রকমের ভারতীয় উদ্ভিদও হয়তো ছিল, বটানিস্ট নয় বলে আমার চোখে শাল, সেগুন, আমলকী, দেবদারু, তেঁতুল ছাড়া আর সব গাছগাছড়াই জঙ্গল বলে মনে হয়েছে।

মাচানময়নায় আমি গিয়েছিলাম নিছক বেড়াতে। লোকের কাছে তাই বলতাম। অবশ্য লোক আর সেখানে কটাই বা ছিল। স্টেশনমাস্টার, দু'চারজন রেল-কেরানী, কয়েকজন কুলি খালাসী, সামান্য কিছু কাঠের কারবারী—। আর ছিল মাচানময়নার ধারে-কাছে অল্প কিছু সাঁওতাল দিনমজুরের ঘরবাড়ি।

লোকে এখানে বেড়াতে আসে না—কারণ টাইম টেবিলের

পাতায় স্বাস্থ্য-নিবাস হিসেবে এর নাম নেই। কোন সাহিত্যিকও সম্ভবত এখানে আসেন নি, যিনি মাচানময়নার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কিছু লেখার ফলে অন্তত বাঙালী বায়ুভূকদের দৃষ্টি এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তবু আমি বেড়াতে গিয়েছি এ-কথাই মাস্টারমশাইকে বলেছিলাম। তিনি রীতিমত অবাক হয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আমার তেমন কিছু যায় আসে নি। আসলে আমি তখন কোনো এক বিশেষ কারণে পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম। আত্মসম্মানের জন্যে বলে রাখা ভাল, আমার আত্মগোপনের কারণটা ছিল রাজনৈতিক।

মাচানময়না জায়গাটা আমার ভাল লেগেছিল। দূর দিগন্ত-জোড়া উঁচু-নিচু মাঠ, শাল-সেগুনের বন, শিরিষের ঝোপ—হু-হু হাওয়া, সুবর্ণরেখার ঝিরঝির জল যাওয়া। আর সকাল-দুপুর জুড়ে সুন্দর রোদ, বিকেলে অদ্ভুত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা স্তব্ধতা আর ছায়া—আর রাত্রে অন্ধকার। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন কৃষ্ণপক্ষের শেষ হপ্তাটা চলেছে, এক সপ্তাহ বাদেই শুক্লপক্ষ শুরু হল। এবং শুক্লপক্ষের শেষ দিন—সেই পৌষ-পূর্ণিমার পরের সকালেই আমি মাচানময়না ছেড়ে পালিয়ে এলাম। কেউ যেন আমাকে জোর করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল।

হ্যাঁ, ফেরৎ পাঠিয়ে দিল বলতে হয়, কেননা স্ব-ইচ্ছায় আমি আসি নি, আমায় আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। কোনো মানুষ, রক্তমাংসের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কোনো মানুষ যদি এ-চেষ্টা করত, তাহলে অবশ্য বলার কিছু থাকত না। কিন্তু কী আশ্চর্য এবং অদ্ভুত কাণ্ড যে কোনো মানুষ আমায় মাচানময়না থেকে পালিয়ে যেতে বলে নি, পালিয়ে যাওয়ার জন্য সতর্ক করে নি, ভয় দেখায় নি। একটা অদ্ভুত নিষ্প্রাণ ছবিই আমায় মাচানময়নার আকাশ-বাতাস ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসতে বাধ্য করল। ভেবেই পাই না, কি করে এটা সম্ভব হল। কিন্তু সম্ভব যে হয়েছে, সে-বিষয়ে আমি

অন্তত সন্দেহ করতে পারি না।

ঘটনাটা ঘটতে শুরু করে প্রথম সপ্তাহের পর। হ্যাঁ, প্রথম সপ্তাহটা কিছু হয় নি। বেশ ছিলাম। স্টেশনের প্রায় কাছেই—বচন সিংয়ের কাঠগোলার দোতলায় থাকবার মত একখানা ঘর জোগাড় করেছিলাম। একটা কুকার আর স্টোভ আমার সঙ্গে ছিল। চাল, আলু, ডিম—মাচানময়নায় পাওয়া যেত। কাজেই দিব্যি ছিলাম। কুকারের ভাত আর সেদ্ধ ডিম খেয়ে—ফাঁকা জায়গায় বেড়িয়ে শরীর সুস্থ যাচ্ছিল। হয়তো-ভালই হচ্ছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম মাস দুয়েক অন্তত থেকে যাব।

কিন্তু প্রথম সপ্তাহের পরই—আমার আসার ঠিক সাত দিন পরেই কাণ্ডটা ঘটল।

সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতে গা থেকে র‍্যাগটা একটু সরিয়ে শীতের প্রকোপটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছি,—কাঠের বাড়ি—ফাঁক দিয়ে দিয়ে হাওয়া আর রোদের ছিটে আসছে—চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি এবং ভাবছি এবার স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়াতে হবে—হঠাৎ, হঠাৎ আমার চোখ পুব দিকের কাঠের দেওয়ালে আটকে গেল। প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না—ওটা কি—দাগ না ময়লা না আর কিছু। চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখলাম—এবং শেষ পর্যন্ত অবাক লাগছিল, ঠিক একটি মেয়ের মুখের ছাঁদ যেন ...টি লাইন দিয়ে কেউ এঁকে দিয়েছে। স্পষ্ট। একেবারে স্পষ্ট। এতদিন যে কেন এটা চোখে পড়ে নি ভেবে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য সে-মুখের চোখ-নাক কিছুই ছিল না—কাজেই আমার ধারণা সত্যি হতে নাও বা পারে।

স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালাম। হাত-মুখ ধুয়ে এসে জামা-কাপড় পরলাম প্রাতঃভ্রমণের জন্যে, চা ঢেলে নিলাম। বিছানায় বসে চা খেতে খেতে আবার তাকালাম সেই দেওয়ালে। কী জানি কেন—ওটা, ওই অস্পষ্ট রেখার জটিলতা আমায় আকর্ষণ করছিল।

তখন জানলা খোলা, দরজাও। ছায়া-ছায়া হলেও ঘরে রোদ ঢুকেছে খানিকটা, বাইরে হিমভিজে সকাল। চোখের ভুল হবার কোন কারণ ছিল না। আমি তন্ময় হয়ে সেই অস্পষ্ট রেখার অবয়ব গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছিলাম। আমার চোখে অন্তত ওটা কারুর আঁকা ছবির খসড়া বলে মনে হচ্ছিল। এবং সবটাই বেশ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সাদা রঙ করা কাঠের দেওয়াল, এখন যদিও বিবর্ণ, তবু কালো রেখায় আঁকা বলে যথেষ্ট স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ভাবছিলাম, এই ছবি কেন এতদিন আমার চোখে পড়ে নি। হতে পারে ছবিটা আগে ছিল না—সম্প্রতি কেউ এঁকেছে। মাচানময়নায় এমন কোন্ শিল্পী হঠাৎ এসে উদয় হলেন এবং এত জায়গা থাকতে হঠাৎ আমার ঘরের দেওয়ালে তাঁর শিল্পের কারুকার্য ফলাবার ঝোঁক চাপল কেন—তাও ভেবে অবাক হচ্ছিলাম।

জিনিসটা আর যাই হোক—অবাক হওয়ার মতন, তার বেশি কিছু নয়। আমিও অবাক হলাম একটু এবং সমস্তটা চোখের ভুল হতে পারে, তাও ভাবলাম। আর বেড়াতে যাবার সময় দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ছবির সেই কালো রেখাটা মুছে, আঙুলে ঘষে পরীক্ষা করে দেখলাম—ওটা কাঠকয়লার আঁচড় ছাড়া আর কিছু নয়।

বলতে বাধা নেই—সেদিন মাঝে মাঝেই এই অসমাপ্ত ছবিটার কথা মনে পড়েছে।

ইচ্ছে করলে ছবিটা অবশ্য আমি মুছে দিতে পারতাম। কিন্তু দিই নি। দেবার কোন কারণই ছিল না।

রাত্রে শোবার আগে লণ্ঠনের আলোয় সেই কাঠকয়লায় আঁকা মুখের ছবি এমনিতে দেখা যাচ্ছিল না—নিছক কৌতূহলবশে আলো ধরে একবার আমি যা দেখেছিলাম। তারপর বই পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে কাঠের ফাঁক দিয়ে গলে আসা রোদের আভা দেখে বেলা অনুমানের চেষ্টা করছি, হঠাৎ

ছবিটির কথা মনে পড়ল। আর মনে পড়তেই চোখ ফিরিয়ে তাকালুম।

কাঠকয়লায় আঁকা সেই ছবির আদলের দিকে চেয়ে এবার আমি চমকে উঠলাম। কী আশ্চর্য, কাল দেখেছি মুখের একটা আবছা আভাস, আজ দেখলুম সে-আভাস আরও স্পষ্ট, দাগগুলো আরও যেন ঈষৎ গভীর—চিবুকের অংশটা যেন দৃঢ় করে দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া কাল যে-মুখে চোখ, নাক, ঠোঁট কিছুই ছিল না—আজ সেই মুখে কে যেন দুটি ঠোঁট এঁকে দিয়ে গেছে। আশ্চর্য দুটি ঠোঁট, একটু বিচ্ছিন্ন কিন্তু সরল; সুস্পষ্ট সুন্দর এবং কেমন যেন নরম। সেই সঙ্গে মাথার সেই চুলের ঢেউয়ে আর কটি রেখা যেন ঘন করে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে এঁকে দিয়েছে।

গা থেকে র‍্যাগখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটিয়াটার ওপর লাফিয়ে বসলাম। চোখের পাতা পড়ছিল না আমার। অদ্ভুত লাগছিল—এই অর্ধমুখ, মেয়েলি মুখ, ঘরের এই আবছা অন্ধকারে আল্‌-রোদের সরু সরু কটি কালির মধ্যে।

জানলা খুলেছিলাম এবং দরজা। আলোয় ঘর ভেসে গেল। ছবিটার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলুম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না—এ কি করে সম্ভব, কেমন করে।

স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে নিত্যকার মত মুখ-হাত ধুয়ে এসে জামাকাপড় পরলাম। চা ঢাললাম। খাটিয়ায় বসে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম—এই কাণ্ডটা কি করে ঘটছে, হওয়া সম্ভব হচ্ছে। রাত্রে আমি দরজা বন্ধ করে শুই। দরজাটা অবশ্য আগল দেওয়া, চেষ্টা করলে বাইরে থেকে খোলা যায়। অবশ্য এ-যাবৎ কেউ সে চেষ্টা করে নি। ঘরে জানলা মাত্র দুটি, তাতে অবশ্য রড নেই, কিন্তু ছোট ছোট, একটা লোককে শরীর গলাতে হলে বিশেষ রকম কষ্ট করতে হবে। শীতের দিন, এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে—তাই জানলা আমি বন্ধই রাখি। কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়ে যা হাওয়া আসে, তাতেই

ভেন্টিলেশনের কাজ ভালভাবেই হয়ে যায়। বিশ্বাস করা মুশকিল, রাত্রে কেউ লুকিয়ে এসে আমার ঘরে শিল্পচর্চার চিহ্ন রেখে যায়। তবে? কে এই ছবি আঁকে, সে কোথায় এবং কেনই বা আঁকে?

কাঠগোলার নিচে যে সব কুলি মিস্ত্রিরা খাটে, তারা শিল্পচর্চা করে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না। বাঙালী এক ছোকরা আছে—হিসেবপত্র লেখে বচন সিংয়ের—সে ছোকরা অবশ্য মাঝে মাঝে গান গায়, কিন্তু সে গান, মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরা, তাকে সঙ্গীত বলতে আমার আপত্তি আছে। যদিও না হয় ধরলাম গানই গায়, ছোকরা সঙ্গীতজ্ঞ, তবু এ-থেকে এ-কথা প্রমাণ হয় না যে সে ছোকরা চিত্রকরও। আবার এও প্রমাণ করা মুশকিল যে, কেউ গান জানলে সে ছবি আঁকতে জানবে না। আসলে ছোকরাকে হয়তো সন্দেহ করা চলে, কিন্তু সে যে ছবি আঁকতে জানে, এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তা ছাড়া ছবি আঁকতে জানলেও আমার ঘরে রাত দুপুরে এসে সে মেয়ের মুখ এঁকে যাবে কেন? কি দরকার?

ছোকরার নাম যামিনী। জিজ্ঞেস করবো না করবো না করেও একসময় তাকে নানা কথার পর শুধোলাম, 'তুমি কি ছবি-টবি আঁকতে পার নাকি যামিনী?'

আমার প্রশ্ন শুনে যামিনী অবাক। বেচারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বললে, 'আজ্ঞে না।'

হঠাৎ কি মনে এল আমার, প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা, এখানে কেউ ছবি আঁকতে পারে বলে জানো তুমি?'

যামিনী আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে, এই জংলী দেশে ছবি আঁকতে কে আর জানবে। কি দরকার বলুন তো?'

'এমনি, আমার একটা দরকার ছিল।' যামিনীর সঙ্গে আলোচনাটা ওখানেই থামিয়ে দিলুম।

সকাল গেল, দুপুর গেল—বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে

সারাক্ষণ ওই ছবির কথা ভেবেছি। রাত করে বাড়ি ফিরেছি এবং শোবার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলো ধরে সেই মুখটি ভাল করে দেখে রেখেছি, যাতে করে কাল যদি আরও কিছু যোগ হয় ওই মুখে, যাতে না চোখের ভুল বা মনের ভুল বলে সন্দেহ করি।

পরের দিন খুব সকালেই ঘুম ভাঙল। প্রথমেই চোখ মেলে ছবির দিকে তাকালাম। আবছা অন্ধকারে ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। জানলা খুলে দিতেই চোখে পড়ল—আজ সামান্য একটি জিনিস যোগ করা হয়েছে। চিবুকের পাশে ছোট্ট একটি তিল। না, এ তিল কাল ছিল না।

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ পড়ে গিয়েছিল ছবিটার ওপর। ইচ্ছে করলেই ছবিটা আমি মুছে দিতে পারতাম। কিন্তু দিই নি। বরং কী রকম এক নেশা লেগে গেল, কেমন এক কৌতূহল হল—দেখা যাক এই ভৌতিক চিত্রচর্চা কতদিন চলে, মেয়েটির মুখ কতদূর পর্যন্ত ফুটে ওঠে। ছবির কথা কাউকে আমি বলি নি। বরং পাছে বেফস্‌কা কাউকে কথাটা বলে ফেলি, সেজন্যে স্টেশনে মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মারাও হঠাৎ কমিয়ে দিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে লাগলাম।

এ-কথা কাউকে বিশ্বাস করানো মুশকিল যে আমার ঘরের সেই কাঠের বিবর্ণ শ্বেত দেওয়ালে কাঠকয়লায় আঁচড়ে আঁচড়ে দিনে দিনে একটি মেয়ের মুখ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। হ্যাঁ, যে ছবিতে মুখের আভাস ছাড়া কিছুই ছিল না—সেই ছবিতে একে একে একটু লম্বাটে নাক, গালের ঢোল, কপালের সামান্য কুঞ্চন, ঘাড়ের ভাঁজ, কাঁধের রেখা—একে একে সমস্ত ফুটে উঠল। এবং সর্বশেষে চোখ।

চোখ যেদিন আঁকা হয়ে গেল, অর্থাৎ যেদিন চোখ সমেত সেই মেয়ের মুখটি আমি দেখলাম, সেদিন সারা শরীর আমার চমকে

গেল। এতদিন ওই মুখ যেন থেকেও ছিল না—। ওর সব ছিল তবু কিছু ছিল না। চরিত্র ছিল না, চেহারা ছিল না, সৌন্দর্য ছিল না—চোখ পেয়ে মুখটি যেন সব পেল। আর আমিও সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল, যার ছবি আমি দেখছি, সেই মেয়েটির বয়স খুব বেশি হতে পারে না, তার স্বভাবে দৃঢ়তা আছে, চোখে চাপা ভর্ৎসনা—ঈষৎ ঘৃণাও—এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন নরম একটি মেয়েলি মন যেন তার সর্বত্র ফুটে রয়েছে।

যে ছবি ছিল এতদিন কৌতূহলের বস্তু, হঠাৎ আমার কাছে তা ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হত—ওই মেয়ে যেন সর্বক্ষণ আমার দিকে চেয়ে আছে—আমার এই নির্জনতার দিকে। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও অন্ধকারের একটি অশরীরী অস্তিত্বের মতন তার চোখ আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে, আমি ঘরে থাকলে সে আমায় দেখছে—আমি ঘরের বাইরে থাকলেও সেই মুখ আমার শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে রয়েছে।

আমার অস্বস্তি হতে লাগল এবং শেষে ভয়। জানি না কেন, আমি—যে কোন ভৌতিক অস্তিত্ব কোনদিনই বিশ্বাস করি নি, আমার পক্ষে এই ছবি যদিও ভৌতিক নয় তবু অবিশ্বাস্য অতীন্দ্রিয় কিছু মনে হতে লাগল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, ভয় পেতে শুরু করেছিলাম। এখানের আলো, বাতাস, হাওয়া, শাল-সেগুনের বন, সুবর্ণরেখার বালুচর, বুনো পাখির ডাক কিছুই আমার ভাল লাগছিল না। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। রাত্রে ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, লণ্ঠন জ্বেলে সারারাত বসে থাকতাম। কান পেতে থাকতাম যদি শোনা যায় কোন পদশব্দ। কিন্তু কোন শব্দ আমি শুনতে পেতাম না।

ভাবতে ভাবতে আর সেই মুখ দেখতে দেখতে আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য কাণ্ড, অন্য কাউকে সেই ছবির কথা আমি বলতে পারতাম না। কতবার চেষ্টা করেছি। বলব বলব

পারিনি। কে যেন নিষেধ করেছে। মুখ চেপে ধরেছে।

ছবিটি মোছার জন্যে একদিন এক বালতি জল পর্যন্ত আনিয়ে একটা ছেঁড়া শার্ট ন্যাতা করে নিলাম। কিন্তু মুছতে পারলাম না। হাত তুলতে গিয়ে হঠাৎ কেমন যেন সব অসাড় হয়ে গেল। আর মনে হল, সেই মুখ—সেই মেয়েটি আমার চোখে তার চোখ তুলে কেমন এক ঘৃণার হাসি হাসল। যেন বললে, 'আমি আমি—এর বেশি তুমি কিছু করতে পারো না। সে ক্ষমতা তোমার নেই।'

তারপর একদিন—সে দিনটি বুঝি ছিল পৌষ-পূর্ণিমা। বাইরে শাল-সেগুনের বন আর মাঠঘাট মাখামাখি হয়ে হিমকুয়াশা জড়ানো জ্যোৎস্না ঝরছে, উত্তুরে হাওয়া বয়ে চলেছে, দূরে কোথাও একটা রাতপাখি ডেকে উঠে উড়ে গেল—আমি ঘরে জানলা খুলে দিয়ে একটি শবের মত দাঁড়িয়েছিলুম। আমার সমস্ত গা জ্বরো রুগির মত বেহুঁশ মনে হচ্ছিল—মাথা দপদপ করছিল আর সমস্ত গলা চোখ-মুখ যেন ভীষণ শুকনো আর রুক্ষ মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ সেই খোলা জানলা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত যেন নিজেকে শক্ত করে নিলুম। তারপর কিসের এক হিংস্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লুম কাঠকয়লায় আঁকা সেই ছবির ওপর। আশ্চর্য, আমি যেন বিছানার চাদর দিয়ে দুহাতে পাগলের মতন ঘষে ঘষে সেই ছবি মুছছিলাম না, একটা রক্তমাংসের মেয়েকে নির্জনে, এমন চাঁদের আলোতে আমার কোন্ এক সুগুপ্ত ঘৃণা, আক্রোশ আর হিংসা দিয়ে রগড়ে রগড়ে নখে নখে পিষে পিষে মেরে ফেলছিলাম।

হ্যাঁ, এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের পর আমি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন সকালে চোখ মেলতে দেখি, আলোয় আলোয় ঘর ভরা। সেই ছবির প্রায় সবই মোছা, কোথাও কোথাও একটু কালচে দাগ পড়ে আছে।

গায়ে জ্বর, চোখ লাল, সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা—এবং ঠিক

একজন খুনীর মতন আমি সর্বদাই আতঙ্কিত। পারলাম না—থাকতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল এই কাঠের বাড়ির কোথাও আমি একটি সুন্দর নরম মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলে লুকিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, আমার ঠিক সেই রকম ভয় হচ্ছিল। সেইদিনই আমি পালিয়ে এলাম।

মাস্টারমশাই অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'একি, আপনার যে ভীষণ জ্বর, সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে—এই দেহ নিয়ে চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আমার বোধ হয় বসন্ত হবে। তাই চলে যাচ্ছি।'

চলে এলুম কলকাতায়। জ্বরে ভুগলাম বেশ কিছুদিন। ধীরে ধীরে জ্বর ছাড়ল। সেই ছবির কথাও একটু যেন ফিকে হয়ে এল। একটি বছর কেটে গেল। তারপর একদিন মা-বৌদির সঙ্গে সামান্য কি একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় নিছক যেন অভিমান বশেই প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলাম—মেয়ে আমি দেখতে চাই না, দেখব না, তোমরা মেয়ে পছন্দ কর—আমি বিয়ে করব।

মেয়ে আমি দেখি নি। মা, দাদা, বৌদিরা সকলেই দেখেছিলেন। বরবেশে গিয়ে বিয়ে করলুম। শুভদৃষ্টির সময়ই যেন চমক গেলাম, তারপর বাসরে।

ফুলশয্যার দিন আমার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্ন করেছিলাম আমি, 'তোমার গালের তিলটা কি আসল না নকল?'

স্ত্রী আমার বোবা নন, লাজুকও নন। চোখ তুলে বললেন, 'জল দিয়ে অবশ্য ঘষলেই সেটা তুমি জানতে পারবে। বরং ব্লেড দিয়ে একটু কেটেই দেখ আসল-নকলের তফাৎটা আরও ভাল বোঝা যাবে।'

'জানি। কিন্তু এও জানি তুমি নকল।'

'নকল!' স্ত্রী বিস্মিত হবার শব্দ করলেন যদিও কিন্তু তাঁর চোখে বিরক্তি ফুটে উঠছিল।

আমি বললুম, 'রক্ত ছিল না তার—তবু সে আসল। তাকে আমি দেখেছি। আশ্চর্য। নকল বলে মনে হচ্ছে তোমায়। কিন্তু কী নিখুঁত। কিন্তু—'

আমি চুপ করে গেলাম।

'কি ?' স্ত্রী শুধোলেন।

'কিছু না।' আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত এক ভয় আমায় জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম কাঠকয়লার আঁচড় আমি নিজের হাতে মুছেছিলাম—এই রক্তমাংসের আঁচড়কেও তো শেষ পর্যন্ত—। আমার নিজের হাতে মুছতে হবে। কী আশ্চর্য, স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলুম এবং আমার আর তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না যে এই মেয়ের পরিণতিও সেই ছবির মত হবে, হতে বাধ্য।

হ্যাঁ, গত ছ' বছর যাবৎ আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আর কতকাল পালিয়ে বেড়াতে হবে বলতে পারি না। তবে সর্বক্ষণই আমি এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আমি খুনী—একটি হত্যা আমার নৃশংসতার অপেক্ষা করছে।

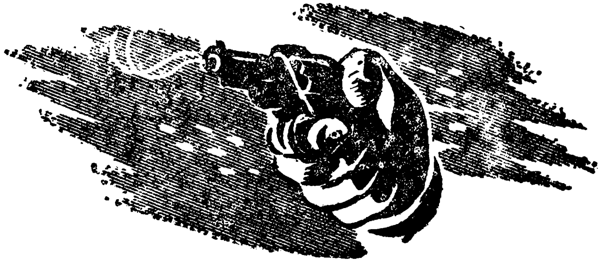

একটি খুনের ঘটনা

অনীশ দেব

'আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করতে চান?' কাউন্টারে বসে থাকা কালো চেহারার লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। না···মানে···ঠিক খুন···'

'নাম?'

'ওর, না আমার?'

'আপনার।'

'অভিষেক রায়।'

'ঠিকানা?'

'পাঁচের এক বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। কলকাতা।'

যান্ত্রিকভাবে লিখে চলল লোকটির হাত। যেন এরকম নাম ও ঠিকানা সে অসংখ্য লেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

'আপনার স্ত্রীর নাম?'

'মালবিকা।'

'বয়েস?'

'একত্রিশ।'

তারপরেই শুরু হল একের পর এক ধারাবাহিক ও গতানুগতিক

প্রশ্নোত্তরের পালা। মালবিকার গায়ের রঙ, মুখের গড়ন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, নাক-মুখ-চোখের বৈশিষ্ট, ইত্যাদি কত কি।

'আপনার কাছে মিসেস রায়ের হলোগ্রাফিক ফটোগ্রাফ আছে? গলার স্বর রেকর্ড করা আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। এই নিন।' পকেট থেকে দুটো জিনিসই বের করে দিলাম।

ভাল করে জিনিস দুটো উল্টেপাল্টে দেখল লোকটি। তারপর বলল, 'আচ্ছা—এবারে শুনুন...'

দেখতে দেখতে একটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল। টের পেলাম আমি ঘামতে শুরু করেছি।

'ব্যস, সব শুনলেন তো? এবারে ভেবে দেখুন, শেষ পর্যন্ত আপনার মনের জোর থাকবে তো?' লোকটি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। মুখে ফুটিয়ে তুলল প্রচণ্ড একঘেয়েমি ও বিরক্তির অভি-ব্যক্তি। তার সহজাত প্রমাণ স্বরূপ একটা হাই উঠল একই সঙ্গে।

আমি সবিনয়ে জানালাম যে আমার মনের জোর থাকবে।

'তাহলে এখানে সই করুন।'

সই করলাম।

'আপনি জানেন এ কাজটা বে-আইনী?'

'জানি।'

'এ কাজের জন্যে যদি আপনি বিপদে পড়েন, তাহলে আমরা কিন্তু একটুও দায়ী হবো না।'

এবারে বিরক্ত আমিও হলাম। বললাম, 'ঢের হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসুন।'

লোকটি হাল্কা ভাবে হাসল। আমার এই ধৈর্যচ্যুতিও তার বহুদিনের চেনা। তারপর বলল, 'আপনার স্ত্রীর যান্ত্রিক সদৃ প্রতিবিম্ব তৈরি করতে আমাদের ন' ঘণ্টা লাগবে। ততক্ষণ আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, আরাম পাবেন। ডান হাতের তিন নম্বর আয়না-ঘরটা

খালি আছে। আপনি ওটায় চলে যান।'

আমি শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চললাম তিন নম্বর আয়না-ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে নীল রঙের ভেলভেটের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বিছানায় শরীরের চাপ পড়তেই মাথার ওপরে লাগানো আয়নার সিলিংটা দুরন্ত গতিতে ঘুরতে শুরু করল। আর একটা নরম কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলে বলে চলেছে, 'ঘুমোও···ঘুমোও···ঘুমিয়ে পড়ো···'

আমি অস্ফুট কণ্ঠে মালবিকার নাম উচ্চারণ করে চলেছি।

মালবিকা, আমি এখানে আসতে চাই নি। তুমিই আমাকে বাধ্য করলে। তুমিই আমাকে দিয়ে এ অন্যায় কাজ করালে। ওঃ ভগবান! কেন যে আমি এখানে এলাম! যদি এই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারতাম? ওঃ···আমি তোমাকে খুন করতে চাই না।

ঘূর্ণ্যমান আয়নায় জটিল আলোর ঝিলিকের কম্পাঙ্ক ক্রমে বেড়ে চলেছে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি।

স্বপ্নে দেখলাম আমি ফিরে গেছি সেই চল্লিশ বছর বয়েসে। খোলা সবুজ মাঠের ওপর উজ্জ্বল কিশোর-কিশোরীর মত ছুটে বেড়াচ্ছি আমি ও মালবিকা। রঙীন তোয়ালের ওপরে পড়ে আছে টিফিন ক্যারিয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও, কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল। একটু দূরেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিমিয়ার পদ্মিনী। তার ঝকঝকে সবুজ রঙ ঘাসের সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

মালবিকা হাসছে। ওর একরাশ কালো চুল মুখের ওপর ঝিলিমিলি হয়ে নাচছে। আমার নাম ধরে ডাকছে ও, 'অভিষেক··· অভিষেক···'

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। হাতে হাত। ঠোঁটে ঠোঁট। যৌবনে যৌবন। উত্তাপে উত্তাপ। পশ্চিমের আকাশ তখন লাল কালিতে কবিতার পাণ্ডুলিপি শেষ করে সূর্য বিদায়ের প্রস্তুতি নিয়ে

পড়েছে।

দৃশ্য পাল্টে যায়। কাশ্মীর, নৈনিতাল, দার্জিলিং। আমরা যেন অপ্রাকৃত গতিতে উড়ে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে। ১৯৯৭ সালের চিরসতেজ বসন্ত।

আর তারপর—যন্ত্রণাময় দুঃস্বপ্ন। মালবিকা ও কিংশুক। স্বপ্নের মধ্যেই এক অজানা অচেনা আবেগ আমার শরীরটাকে আমূল কাঁপিয়ে দিল। কি করে সব জলছবি ওলোটপালোট হয়ে গেল? কোথা থেকে এসে হাজির হল কিংশুক? কেন এল সে আমার ও মালবিকার ভালোবাসার মৃত্যু-পরোয়ানা হাতে নিয়ে? জীবন কেন এত জটিল, কেন এত দুঃখময়? এ কি শুধু বয়সের পার্থক্য? উত্তাপের পার্থক্য? আমি, পঞ্চাশ ছোঁয়া প্রৌঢ়, আর মালবিকা যুবতী, এত ভয়ঙ্কর যুবতী। কেন, কেন, কেন এমন হল?

নির্ভুল খুঁটিনাটি সমেত চোখ ধাঁধানো হয়ে দৃশ্যটা ফুটে উঠল। কিংশুক পাল ও মালবিকা বসে রয়েছে এক বহুবর্ণ ফুলের বাগানে। ওদের চুম্বনে রত ঠোঁট অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে আমার অনুপ্রবেশ।

সেই প্রচণ্ড রাগ। নিজের সঙ্গে এক দুরন্ত যুদ্ধ। কিংশুককে খুন করার চেষ্টা।

আরও দিন যায়। সংখ্যায় ও বিষয়বস্তুতে দুঃস্বপ্ন আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অবশেষে মালবিকা—

ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার চোখ জ্বালা করছে। আমার স্বপ্নের কান্না মোটেই স্বপ্ন নয়।

'উঠুন মিস্টার রায়, আমরা তৈরি।'

অগোছালো ভাবে উঠে বসলাম। ওপরের নিস্পন্দ শীতল আয়নায় নিজের অপ্রতিভ ছায়া দেখলাম। পঞ্চাশটি ক্লান্তিকর

বছরের প্রত্যেকটি যেন স্বতন্ত্র শিলালিপি খোদাই করেছে আমার অসহায় মুখে। ভয়ঙ্কর ভুল করেছি আমি। বহু পুরুষই যুবতী স্ত্রী বেছে নিয়েছে,তারপর জলে আক্রান্ত চিনির দানার-মত তারা অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বহীন হয়ে গেছে উদ্ধত যৌবনের হাতের মুঠোয়। নিজেকে পরখ করলাম আমি। খুঁতখুঁতে এই জরিপে সূচ্যগ্র মেদিনীর পার্থক্যও ধরা পড়ে। পেটে এখন চর্বির থাক—যারা কখনও রুগ্ন হওয়ার আশ্বাস দেয় না। তেমনই চিবুক। মাথার চুল উদ্বাস্তু হয়ে রওনা হয়েছে কোন দূর অঞ্চলের দিকে। শরীরের প্রতিটি কোষে এক অনিবার্য ছায়া ফেলেছে।

কালো লোকটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল অন্য কোন ঘরের দিকে।

গন্তব্যে পৌঁছে চমকে উঠলাম আমি, 'এ তো মালবিকার ঘর।'

'আমাদের কোন কাজে খুঁত পাবেন না, মিস্টার রায়।'

'সত্যিই তাই। এতকুটু তফাৎ নেই।'

পকেট থেকে দশ হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল বের করে লোকটির হাতে দিলাম। সে সামান্য হেসে বিদায় নিল। সেই হাসির অর্থ: আপনার টাকা খরচ সার্থক হবে।

ঘরটা নিস্তব্ধ এবং উষ্ণ। এ কি মালবিকার উষ্ণতা?

একটা সোফায় বসে পকেটে হাত দিলাম। রিভলবারের শীতল স্পর্শ অনুভবে সাড়া দিল। দশ হাজার টাকা। কিন্তু এই মানসিক হত্যাকাণ্ড আমাকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। একটা বাস্তব হত্যাকাণ্ডকে এড়াতে গেলে এই খরচের প্রয়োজন আছে। নৃশংস অথচ নৃশংস নয়। মৃত্যু অথচ মৃত্যু নয়। হত্যা অথচ হত্যা নয়। আমার মনটা হাল্কা হল, শান্ত হল। লক্ষ্য করতে লাগলাম ঘরের দরজার দিকে। গত ছ'মাস ধরে দিন রাত আমি মালবিকাকে হত্যা করার স্বপ্ন দেখেছি। এখন হবে সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি। যে কোন মুহূর্তে ঘরে এসে উপস্থিত হবে মালবিকার বাস্তব প্রতিবিম্ব,

একটি রোবট, যাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, অথচ···

'অভি—'

'মালবিকা !'

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'মালা—' শ্বাস নিতেও যেন আমার কষ্ট হচ্ছে।

ও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পালকের মত কোমল কচি কলাপাতা রঙ শাড়ি। পায়ে সুদৃশ্য সোনালী চটি। চুলের ঢালে এক অদ্ভুত মেঘলা পটভূমি। চোখ আয়ত। এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ভালোবাসাময় দৃষ্টি।

বহুক্ষণ নীরব রইলাম। শুধু ওকে দেখছি। অবশেষে কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে অবাক স্বরে বলে উঠলাম, 'তুমি কি সুন্দর, মালা—'

'সুন্দর কখনও সুন্দর না হয়ে পারে ?' ও হেসে জবাব দিল।

'দাঁড়াও, তোমাকে দেখি—' অস্ফুট স্বর কেমন অলৌকিক শোনালো।

ঘুমিয়ে-চলা মানুষের মত দুটো আচ্ছন্ন হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম। বুকের ভেতর অবাধ্য দামামা। গভীর জলের তলায় দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলার মত অনিশ্চিত টলোমলো পায়ে ওকে ঘিরে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ওকে স্পর্শ করেও দেখছি।

'এত বছরেও আমাকে ভাল করে দেখো নি ?'

'এ দেখা কখনও ফুরোয় না।' আমার চোখে জল।

'আমাকে ডেকেছো কেন ?'

'প্লীজ, একটু সময় দাও, মালা, একটু সময় দাও আমাকে।' ওর পাশে শরীর এলিয়ে বসে পড়লাম। কাঁপা হাত দুটো বুকের ওপর রাখলাম উত্তাপের খোঁজে। আমার অবিশ্বাসী চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। 'এ অসম্ভব। নির্ঘাৎ দুঃস্বপ্ন। কি করে ওরা তোমাকে তৈরি করল ?'

'সে কথা আলোচনা করার অনুমতি নেই ; তাতে ঘোর কেটে যায়।'

'এ কি ম্যাজিক ?'

'না, বিজ্ঞান।'

ওর স্পর্শে উষ্ণতা। নখের পালিশ ও বাঁক নিখুঁত। কোন জায়গায় কোন গরমিল নেই। বাস্তব সদ্‌বিম্ব। ভাল করে ওকে দেখলাম। মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কবিতা—যখন প্রতিদিন সূর্য উঠত, অথচ অস্ত যেত না।

'…সময়ের পায়ে একজোড়া ঘুঙুর থাকলে
অবিকল তার রঙ হতো সবুজ
অনায়াসলব্ধ ঘাসেদের মতন
বেড়ে ওঠা দুরন্ত হিজলের মতো তোমার বুকের সবুজও তখন
ধরা থাকতো না শাড়ির ছোট্ট আঁচলে…'

'অভি ?' ওর চোখ কাঁচের মত। বুকজোড়া কি ধরা থাকবে না শাড়ির ছোট্ট আঁচলে ?

'কি ?' ওকে চুমু খেতে হচ্ছে করছে।

'…তুমি গীতোক্ত পুরুষের মতো
উদাসীন হলে আমি লজ্জা পাই…'

'অভি।'

একটা আগ্রাসী গুঞ্জন শুরু হল কোথাও। ঘরটা যেন বনবন করে ঘুরছে।

'এক মিনিট, এক মিনিট।' এ গুঞ্জন কি আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ?

'…তুমি হলুদ সবুজ সাদা প্রজাপতি দেখ
আমি ফড়িং-এর কাঁচপোকা পাখা
তন্ময় তুমি নির্মম হাতে নির্মোক ভাঙো
আমি নির্ঝর
চূর্ণিত শিলা যেন…'

'কি করে ওরা তোমাকে তৈরি করল ?' আমি অবিশ্বাসে ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠলাম। এত অল্প সময়ে। মাত্র ন'ঘন্টায় ? যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তখন কি ওরা সোনা গলিয়ে ঢালাই করেছে মালবিকাকে ? তারপর হীরে-চুনী-পান্না, তরল রুপো আর মেঘের সুতো ব্যবহার করেছে প্রয়োজন মতো ? হলদে আগুনের ছাঁচে ফেলে জমাট বাঁধিয়ে কি তৈরি হয়েছে মালবিকার বরতনু ?

'তুমি এসব কথা জিজ্ঞেস করলে আমি কিন্তু চলে যাব।' ও বলল।

'না, না।'

'তাহলে কাজের কথায় এসো। তুমি কি কিংশুকের বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে চাও ?' মালবিকার স্বর হঠাৎই শীতল হয়ে গেছে। এ কণ্ঠস্বর কি গলিত ধাতুর তৈরি ?'

'একটু সময় দাও, মালা, বলছি।'

'না, এক্ষুণি!'

আমার সমস্ত ক্রোধ দ্রবীভূত হয়ে গেছে। মালবিকার উপস্থিতি কাজ করছে সর্বদ্রাবী দ্রাবকের মত।

'তুমি আমাকে কেন ডেকেছো ? কিংশুকের বিষয়ে কথা বলতে, তাই তো ? তুমি তো জানো আমি ওকে ভালোবাসি। তোমার চেয়ে বেশি বা কম ভালোবাসার কোন ব্যাপার নয়। কারণ ওকেই আমি একমাত্র ভালোবাসি।' ওর কণ্ঠস্বর বিষাক্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

'ওঃ থামো, থামো।' দু-হাতে কান ঢাকলাম আমি।

কিন্তু ও থামলো না, 'এখন তো সব সময় কিংশুকের সঙ্গেই আমি ঘুরে বেড়াই। তুমি আর আমি আগে যেখানে যেখানে যেতাম, এখন সেখানে কিংশুক আমার সঙ্গী। এই তো গত মাসে ওর সঙ্গে মধুপুরে তিনদিন ঘুরে এলাম। ওঃ, দারুণ। আর কিংশুক যা দুরন্ত কি বলব।'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে

গিয়ে মালবিকার হাত ধরলাম একান্ত অনুনয়ে। বললাম, এসব তো তোমার দোষ নয়। তুমি নিষ্পাপ। তুমি পবিত্র। তুমি সেই মালবিকা নও। তুমি আলাদা।'

'ঠিক তার উল্টো,' রোবট যুবতী বলে উঠল, 'আমার সঙ্গে মালবিকার কোন তফাৎ নেই। আমিই মালবিকা। ও যা যা করে আমাকেও তাই তাই করতে হয়। আমরা দুজন সবদিক থেকেই এক।'

'কিন্তু ও যা পাপ করেছে তুমি তো তা করো নি।'

'করেছি। সব পাপই করেছি। কিংশুককে আমি চুমু খেয়েছি। ওর সঙ্গে রাতে...'

'হতেই পারে না, মালা, কারণ একটু আগেই তোমার জন্ম হয়েছে। তুমি এখনও কোন পাপ করার সময় পাও নি।'

'তোমার হৃদয় এবং মালবিকার অতীত থেকে আমার জন্ম।'

আমি ওর দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, 'শোন মালা—নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় আছে। আমি দরকার হলে আরও—টাকা দিতে পারি। তোমাকে কিনে নিতে পারি। তারপর আমরা দূরে কোথাও চলে যাব। কেউ জানবে না। শুধু আমরা দুজনে—'

ও হাসলো, 'তা হয় না। আমরা শুধু ভাড়া দেবার জন্যে। বিক্রির জন্যে নয়।'

'কিন্তু যে কোন অঙ্কের টাকা দিতে আমি রাজী আছি।'

'এ চেষ্টা যে আগে হয়নি তা নয়। তার পরিণাম মস্তিষ্ক-বিকৃতি। বললাম তো, এ সম্ভব নয়। এমনকি এটুকুও বে-আইনী, সে তো আপনি ভাল করে জানেন। সরকারকে লুকিয়ে চুরিয়ে আমাদের এসব কাজ করতে হয়।'

'আমি তোমাকে নিয়ে থাকতে চাই, মালা।'

'তা হয় না, কারণ আমি সত্যিই মালা, মালবিকা, আমাদের প্রতিটি কণা এক। তাছাড়া অফিসের বাইরে বেরিয়ে আমরা

প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না। ব্যবচ্ছেদ করলে আমাদের সব রহস্যই ফাঁস হয়ে যাবে।···যাক, ঢের হয়েছে, আপনাকে আমি বারবার সাবধান করেছি যে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন না। তাহলে শুধু শুধু স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। আর আপনার টাকাটা নষ্ট হবে। তার চেয়ে যা করতে এসেছেন তাই করুন। চটপট।'

'তোমাকে আমি খুন করতে চাই না।'

'আপনার একটা সত্তা চায়। সেটাকে আপনি দমিয়ে রেখেছেন। প্রকাশ করতে চাইছেন না।'

পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে নিলাম।

'আমার সত্যিই ভীমরতি ধরেছে। এখানে আসা আমার উচিত হয় নি। তুমি এত সুন্দর!'

'আজ রাতে আমি কিংশুকের কাছে যাচ্ছি।'

'কথা বোলো না, প্লীজ।'

'রাতে ওখানে থাকব।'

'আমার কথা কানে যায় নি তোমার!'

মিষ্টি করে হাসল ও। আমার চিবুকটা নেড়ে দিল, 'আহারে, আমার মোটকু সোনা। রাতে বিছানায় একা একা শুয়ে খুব ছটফট করবে। তার চেয়ে বরং একটা কোলবালিশ নিয়ে নিও।'

আমার অভ্যন্তরে একটা অজ্ঞাত আলোড়ন শুরু হল। আমার মুখ কি বিবর্ণ হয়ে গেছে? অনিবার্য কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বন্দী ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তি চিন্তায় ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে। এবং ওর মস্তিষ্কের টেলিপ্যাথিক নেটওয়ার্ক এই মৃত্যু-স্পন্দন অনুভব করতে পারছে। রোবট। টেলিপ্যাথি। হত্যাকাণ্ড।

'ভাবতে অবাক লাগে অভি, কি করে তোমাকে একদিন ভালো-বেসেছিলাম।' ও হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি।

'থামো, মালা, থামো।'

'আমি সবে তিরিশ পেরিয়েছি আর তুমি হয়ে উঠেছ পরিপূর্ণ

বৃদ্ধ। তোমার তরল আগুন শুকিয়ে গেছে বয়েসের বাতাসে। কি বোকা তুমি, অভি? দিনের পর দিন টাকা রোজগার করেছ, অক্লান্ত খেটেছ, আর আমাকে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ার সুযোগ দিয়েছ। আচ্ছা, তোমার কি কিংশুককে পছন্দ হয় না?'

অন্ধকারে রিভলবার উঁচিয়ে ধরলাম আমি।

'মালা!'

'ওর মাথা পবিত্রতম সোনায় তৈরি—' ও ফিসফিস করে বলল।

'মালা, এখনও বলছি চুপ করো!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'ওর চুলের গুচ্ছ ঘন মেঘের মখমলকেও হার মানায়, ওর হাত শুভ্র নিষ্কলঙ্ক গজদন্তের মত সুঠাম।

কি করে এসব কথা ও বলছে। এ তো আমার মনের ছায়া, নিছক কল্পনা। তাহলে কেমন করে ওর ঠোঁট উচ্চারণ করছে এইসব অশ্লীলতম শব্দের মিছিল?

'মালা, আমাকে বাধ্য করো না বলছি।' আমার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র কেঁপে ওঠে।

'কিংশুকের গালে অস্তাচলের সূর্য রক্তিম ছায়া ফেলে রাখে সর্বক্ষণ—' ওর চোখ বুজে আসে, অস্ফুটে বেরিয়ে আসে কথাগুলো, এবং ও হাল্কা পায়ে ভেসে বেড়ায় ঘরের সর্বত্র।

'…ওর পা দুটো যেন তাজমহলের পাথর দিয়ে তৈরি একজোড়া স্মৃতিসৌধ, যেখানে অর্চনা অঞ্জলি কখনো শেষ হয় না। ওর চোখের পাতায় রামধনু-রঙ স্বপ্ন খেলা করে…'

'মালবিকা।' ভয়ঙ্কর স্বরে চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'ওর ঠোঁট সত্যিই ফুলের মত…'

প্রথম গুলি ছুটে গেল।

'…ও আমার জন্মান্তরের প্রেমিক…'

দ্বিতীয় গুলি।

ও পড়ে গেল।

'মালবিকা! মালা—মালবিকা!'

আরও চারবার ওর শরীর লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম আমি।

ওর পড়ে থাকা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর চেতনাহীন ঠোঁট আভ্যন্তরীণ কোন এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নড়ে উঠছে বারবার। বলছে, '...জন্মান্তরের প্রেমিক, জন্মান্তরের প্রেমিক, জন্মান্তরের প্রেমিক...'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। কোন এক অস্পৃশ্য নেশা শুষে নিচ্ছে আমার বোধশক্তি—

ঘুম ভাঙতেই একটা ভিজে কাপড়ের ছোঁয়া অনুভব করলাম ভুরুর ওপর।

'সব শেষ।' কালো লোকটি বলল।

'শেষ?' আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম।

নীরবে সম্মতি জানালো কালো লোকটি।

অতি ক্লান্তভাবে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকালাম। দু-হাতে যথেষ্ট রক্তের দাগ ছিল। আবছাভাবে মনে আছে, জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে আমি পড়ে গিয়েছিলাম মেঝেতে। এবং সত্যিকারের রক্তের এক ফোয়ারা অবিশ্রান্তভাবে মাথা কুটে মরেছে আমার দু-হাতে।

কিন্তু এখন রক্তাক্ত হাত দুটো অপরাধহীন নিষ্পাপ। কেউ ধুয়ে দিয়েছে সযত্নে।

'আমাকে এখুনি যেতে হবে।' অস্পষ্ট গলায় বললাম।

'পারবেন তো?'

'হ্যাঁ পারব।' আমি উঠে বসলাম, 'মালবিকার সঙ্গে এখন আর কোন যোগাযোগ রাখতে পারব না?'

'মালবিকা মারা গেছে।'

'হ্যাঁ। আমিই ওকে খুন করেছি। ওঃ, রক্তটা একেবারে সত্যিকারের ছিল।'

'এ জন্যেই তো আমাদের কোম্পানীর এত সুনাম।'

ওদের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। আমার শুধু হাঁটতে ইচ্ছে করছে। ক্রোধ ও প্রতিশোধের দুরন্ত জ্বালা এখন আর নেই। ওই কাল্পনিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সে স্মৃতি এত ভয়ঙ্কর যে দ্বিতীয়বার খুন করার ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। যদি বাস্তবের মালবিকাও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আমি শুধু অচেতন হয়ে বসে পড়ব হাঁটু গেড়ে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। মালবিকা মরে গেছে। আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। আমি অন্যায় করেছি, তবে কেউ তা জানতে পারবে না।

মুখের ওপর ছুটে আসা বৃষ্টির ফোঁটা যেন ঠাণ্ডা বরফের কুচি। এখুনি আমাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে একটু আগে ঘটে যাওয়া নাটকের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। যদি পুরনো সুতো ধরেই আবার জীবনের মালা গাঁথবো, তাহলে দশ হাজার টাকায় বিনিময়ে ওই নাটকীয় অনুভূতি কেনার কি প্রয়োজন ছিল? সত্যিকারের হত্যাকাণ্ডকে রোধ করতেই কালো লোকটির এত আয়োজন। মনের মধ্যে খুন করার বা কাউকে যন্ত্রণা দেবার প্রতিজ্ঞা থাকলে কোন যান্ত্রিক রোবটের ওপর চরিতার্থ হয় সেই নৃশংস ভয়াবহ প্রতিজ্ঞা। আবদ্ধ আবেগ খুঁজে পায় নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পথ। এখন ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। সেখানে মালবিকা হয়তো বসে আছে। ওকে আমি আর দেখতে চাই না। আমার কাছে ও মৃত।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেখছি চলমান যানবাহন। জীবন গতিময়। বিশুদ্ধ বাতাসে গভীর শ্বাস নিলাম। মন যেন আরও হাল্কা লাগছে।

'মিস্টার রায়?' পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল। আমি চমকে ফিরে তাকালাম।

একটা হাতকড়া পেশাদারী ক্ষিপ্রতায় এঁটে বসল আমার ডান

হাতের কব্জির ওপর।

'আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল, মিস্টার রায়।'

'কিন্তু—'

গম্ভীর স্বরটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল পাশের লোকটিকে, 'এসো চক্রবর্তী, ওপরের লোকগুলোকে এবার অ্যারেস্ট করা যাক।'

'শুধু শুধু আমাকে আপনারা—'

আমাকে বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'শুধু শুধু নয় মিস্টার রায়, খুনের জন্যে আমরা কাউকে রেহাই দিই না।'

কালো আকাশে কোথাও বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বাজ পড়ল সগর্জনে।

রাত প্রায় ন'টা। গত দশদিন ধরেই টানা বৃষ্টি পড়ছে। জেলের পাথুরে দেওয়াল বেয়েও গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। হাত পাতলেই বৃষ্টির ফোঁটা জমা হয়ে ছোট্ট হ্রদ তৈরি করে ফেলছে। আমার হাত কাঁপছে।

দরজার ধাতব শব্দ শোনা গেল। আমি দাঁড়িয়ে জলে হাত ভিজিয়ে চলেছি। আমার উকিল দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আর কোন আশা নেই। আজ রাতেই আপনাকে নিউক্লিয়ার হার্নেসে যেতে হবে।'

আমি তখনো বৃষ্টির রিমঝিম শুনে চলেছি।

'ও বাস্তব ছিল না। স্বপ্ন ছিল। আমি ওকে সত্যি সত্যি খুন করি নি।'

'কিন্তু আইন তো আর পাল্টানো যাবে না। জানেন তো, অন্য সবারও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। রাত ঠিক বারোটায় ওই রোবট কোম্পানীর চেয়ারম্যানের মৃত্যু হবে নিউক্লিয়ার হার্নেসে। তিনজন কর্মচারি মরবে রাত একটায়। আর আপনি দেড়টার সময়।'

আমি উত্তাপহীন সহানুভূতির গলায় বললাম, 'সত্যি আপনি

অনেক করেছেন। আসলে সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, স্বপ্নে হোক বা বাস্তবে হোক, ব্যাপারটা সরকারের চোখে খুন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এখানে খুনের ইচ্ছে রয়েছে, রয়েছে মোটিভ, পরিকল্পনা রয়েছে, সবই আছে, একমাত্র আসল মালবিকা ছাড়া।'

'ব্যাপারটা কি জানেন, মিস্টার রায়? আপনার কপাল খারাপ যে এই সময়টাতে আপনি ধরা পড়লেন। দশ বছর আগে হলে আপনাকে এজন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। দশ বছর পরে হলেও না। এই কয়েকটা বছরে কাল্পনিক খুনের ব্যাপারটা এমন হঠাৎ করে বেড়ে উঠেছে যে সরকার পক্ষ একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে আসল খুনের সংখ্যা কমে যাওয়ার বদলে বরং বেড়ে উঠছে আশ্চর্য ভাবে। সুতরাং কড়া শাস্তির ব্যবস্থা না করলে রোবট কোম্পানীও থামবে না, আর আপনার মত ক্লায়েন্টরাও না। আসলে আপনার হয়তো সত্যিকারের খুন করার বুদ্ধি বা সাহস নেই। কিন্তু দেখা গেছে, এই নকল খুন বার কয়েক করলেই আপনার হাত পেকে উঠছে। বেড়ে উঠছে সাহস, আত্মবিশ্বাস, বুদ্ধি। ফলে আপনারই হাতে ঘটে যাচ্ছে সত্যিকারের খুন। তাছাড়া, এ জাতীয় রোবটদের সরকারী আইনে ঠিক নিষ্প্রাণ জড়বস্তু বলে ধরা হয় না। কারণ এরা চিন্তা করতে পারে, যুক্তি দিয়ে ভাবতে পারে। আড়াই মাস আগে 'জীবন্ত রোবট' নামে একটা আইন পাশ করা হয়েছে। আপনি সেই আইনের আওতায় ধরা পড়েছেন। নেহাৎই খারাপ সময়, মিস্টার রায়, নেহাৎই খারাপ সময়।'

আমি ক্লান্ত স্বরে মন্তব্য করলাম, 'এখন বুঝতে পারছি, বিচারে সরকার কোন ভুল করে নি।'

'যাক, আপনি যে আইনের যুক্তিটা বুঝতে পেরেছেন, এতেই আমি খুশি। তবে আমিও চেষ্টা নেহাৎ কম করি নি।'

'ঠিকই বলেছেন। 'খুন'কে কখনো মেনে নেওয়া যায় না। হোক সে রোবট, যন্ত্র, কল্পনা। আমি অন্যায় করেছি, তাই শাস্তি পেতে

হচ্ছে। আমি সত্যিই খুন করেছি। কারণ সেই খুনের পর থেকেই আমি নিজের কাছে কেমন যেন অপরাধী হয়ে পড়েছি। চেয়েছি আমার শাস্তি হোক। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? সমাজ তো এভাবেই সকলকে বন্দী করে। আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে আপনি অপরাধী—যদিও তার কোন জোরালো কারণ থাকে না…'

'আমি তাহলে চলি, মিস্টার রায়। আপনার আর কোন দরকার থাকে তো বলুন?'

'না। ধন্যবাদ।'

'গুড বাই, মিস্টার রায়।'

দরজা বন্ধ হল।

গরাদের বাইরে বাড়িয়ে দেওয়া আমার দু-হাত ভিজে জড়সড়। তবুও এ প্রকৃতির অকৃত্রিম স্পর্শ। হঠাৎই দেওয়ালে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। মাইক্রোফোনে ভেসে এল যান্ত্রিক স্বর: 'মিস্টার রায়, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আমি জানলার গরাদ আঁকড়ে ধরলাম সজোরে।

ও মরে গেছে। ওর কোন অস্তিত্ব নেই।

'মিস্টার রায়?' যান্ত্রিক স্বর প্রশ্ন করল উত্তরের প্রত্যাশায়।

'ও মারা গেছে। আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি।'

'আপনার স্ত্রী পাশের ঘরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'আমি ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছি। ও লুটিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'মিস্টার রায়, আপনি এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নি—'

আমি পাগলের মত দেওয়ালে ঘুষি মারতে লাগলাম। চিৎকার করে উঠলাম, 'ও মরে গেছে, ও মরে গেছে, আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি। আমি এর কাছে শুধু শাস্তি চাই, একটু একা থাকতে চাই আমি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব না। ও মরে গেছে,

আমি ওকে নিজের হাতে খুন করেছি।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আবার যান্ত্রিক গুঞ্জন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রায়।'

লাল আলোটা নিভে গেল।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ঠাণ্ডা গরাদের গায়ে চেপে ধরলাম আমার উত্তপ্ত গাল। অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি পড়ছে। অপেক্ষা করছি। অনেকক্ষণ পর রাস্তার দিকের একটা দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বর্ষাতি পরা দুটো শরীর আমার চোখে পড়ল। একতলার অফিস থেকে বেরিয়ে পা দিয়েছে রাস্তায়। একটা ভেপার ল্যাম্পের নিচে ওরা থমকে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

মালবিকা। ওর পাশে দাঁড়িয়ে কিংশুক।

'মালা!'

ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিংশুক ওর হাত ধরল। তারপর দ্রুত-পায়ে রাস্তা পার হয়ে দুজনে উঠে বসল একটা কালো গাড়িতে।

'মালবিকা!' আমি গরাদের রড ধরে ঝাঁকুনি দিতে চাইলাম। চিৎকার করে চললাম। ঘুষি মারতে লাগলাম পাথরের দেওয়ালে। জানলাটাকে উপড়ে নিতে চাইলাম সর্বশক্তিতে।

মডার্ণ ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের
প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়
৬৫এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন-৫৫-২৫৪৯

'গার্ড। গার্ড। ও বেঁচে আছে। এইমাত্র আমি ওকে দেখেছি ও মরে নি. আমি ওকে খুন করি নি. তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাউকে খুন করি নি, সব অভিনয়, স্বপ্ন, কল্পনা—আমি ওকে এইমাত্র দেখলাম, ও বেঁচে আছে। মালা—ফিরে এসো মালা। ওদের বলো, তুমি বেঁচে আছো। বলো, আমি তোমাকে খুন করি নি। ওরা আমাকে ভুল করে ধরে রেখেছে। মালবিকা, প্লীজ…'

প্রহরীরা ছুটে এল ঘরে।

'তোমরা আমাকে আর মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে না। আমি কোন অন্যায় করি নি। মালবিকা বেঁচে আছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আমরাও দেখেছি, স্যার।'

'তাহলে আর আমাকে আটকে রেখেছ কেন? ছেড়ে দাও।' আমার গলা বুজে এল। প্রচণ্ড কাশির দমকে শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বার বার।

'বিচারের সময় তো এসব অনেকবার বলেছেন, স্যার—'

'না, না, এ ভীষণ অন্যায়। একজন নিরপরাধ লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। ছি-ছি—' আমি জানলায় মুখ উঁচিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। হিংস্র থাবা দেওয়ালে বসাতে চাইছি ক্ষণে ক্ষণে।

কালো গাড়িটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ভেতরে রয়েছে মালবিকা ও কিংশুক। ওরা কাশ্মীর, নৈনিতাল, দার্জিলিং, মধুপুর সব ঘুরে বেড়াবে। ওদের কাছে সারা বছরই বসন্তকাল। প্রেমের কাল। ভালোবাসার কাল। আর আমার কাছে তা কালবসন্ত।

'মালা, ফিরে এসো মালা, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এভাবে আমাকে নিরাশ্রয় করে যেও না, মালা।'

ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটায় গাড়ির লাল রঙের টেল-লাইট জোড়া হারিয়ে গেল। পেছন থেকে এসে প্রহরীরা হঠাৎ আমাকে সজোরে জাপটে ধরল। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমি বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে চলেছি।*

* কাহিনীর কবিতার অংশ অসিত সরকারের রচনা।

চোখের বাহিরে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বুড়িদের ওই এক দোষ, সবসময় বকবক করবেই—সায় দেবার মতো কাছে কেউ থাক আর নাই থাক।

মণিপিসিকে খানিকটা সেইজন্তেই এ বাড়ির কেউ পছন্দ করে না, আমি ছাড়া। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরে যায়, যেমন এখন। কিন্তু মণিপিসিকে আমি ভালোবাসি। গুরুজনদের মধ্যে একমাত্র মণিপিসিই জীবিত বলে নয়, মণিপিসি আমায় সত্যি ক'রে স্নেহ করেন বলেই। আমার বাবার নিজের বোন অবশ্য ছিল না, মণিপিসি বাবার খুড়তুতো বোন, বাবার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। কিন্তু মানুষ হয়েছে সব একসঙ্গে—একই একান্নবর্তী পরিবারে। একান্নবর্তী পরিবার কবে ভেঙেচুরে গিয়েছে, সুতরাং আমার সম্পর্কিত পিসি সংসারের অন্ন ধ্বংস করবেন—সুরমা স্বাভাবিক ভাবেই সেটা পছন্দ করে নি। বাধা দিতে পারে নি আমার জন্যেই, কিন্তু ওর বিরক্তিও আমি চাপা দিতে পারি নি। আমার একমাত্র মেয়ে মোম যে ওর পিসিকে খুব অপছন্দ করে তা নয়, অফিস থেকে ফিরে অনেকদিনই আমি দেখতে পেয়েছি মোম পিসির কোলের কাছ

ঘেঁষে বসে গল্প শুনছে। কিন্তু ওর পছন্দসই কাজ না হলেই দিদার ওপর ও চোটপাট করে, এবং বলা বাহুল্য মায়ের কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোন বাধা পায় না।

মণিপিসিকে বলতে গেলে আমিই আড়াল করে রেখেছি। বাবা নেই মা নেই—ওঁদের স্মৃতি আগলে রাখার মতো একটিমাত্র আপন-জন এ পৃথিবীতে আমার আছে, মণিপিসি। সব ভাল মণিপিসির, কেবল এই সন্ধ্যের সময়টুকু ছাড়া। একবাটি মুড়ি নিয়ে এই সময় বসবেন মণিপিসি প্রায়ান্ধকার বারান্দার একটা কোণে। ওপরে তিনটে আর নিচে চারটে—সাকুল্যে এই সাতটা দাঁত নিয়ে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে যাবেন মুড়িগুলোকে কায়দা করবার। আসলে মুড়ি খাওয়াটাও যেন পিসির আসল উদ্দেশ্য নয়, এই সময়টা কেমন ঝিমুনি ধরে পিসির। এই দৃশ্যটা ছুটির দিনে আমি অনেকবার দেখেছি। মুড়ির বাটি নিচে নামানো। চোয়াল নড়ছে মণিপিসির। শরীর এলানো। চোখ বোজা নয়, সামনে চেয়ে আছেন—কিন্তু চোখের দিকে তাকালে মনে হবে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আকাশের তারা দেখছি। আর ওই বিড়বিড় করে চলেছেন একটানা—যতো সব অর্থহীন কথাবার্তা। বেশির ভাগ কথাই আপন মনে এবং এইরকম :

'কে রে, বুড়ো নাকি। কেমন আছিস বাবা? কেন যে কষ্ট করে আসিস—আমি তো ভালোই আছি। খোকা আমায় খুব ভালবাসে।'

অথবা এইরকম :

'না না, ভয় নেই বিভা—তোমার ছেলের আমি মাথায় করে রেখেছি। বৌমার কথা বলছো? না ও খারাপ না বলে—মনে মনে আমাকে বেশ ভক্তি করে ও।'

বুড়ো আমার বাবার নাম, পিসি এই নামেই বাবাকে ডাকতেন। বিভা আমার মায়ের নাম। বাবা মারা গেছেন আমি যে বছর কলেজে ভর্তি হই সেই বছর, আর মা মারা গেল বছর পাঁচেক আগে।

মণিপিসি ভুল বকছেন মনে করা শক্ত, কারণ এসব তিনি জ্বর-জারি হলে বলেন না, সুস্থ অবস্থাতেই বলেন। দ্বিতীয়ত, ঘুমের ঘোরে বা ঘুমিয়ে স্বপ্নটপ্ন দেখে এসব বলতে আমি পিসিকে কখনো শুনি নি। এসব শুরু করলে সুরমার বিরক্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়, সৌজন্যের আবরণ না রেখে ওঁকে শুনিয়ে ও প্রায়ই বলে, 'বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি হয়!'

মোম প্রথম প্রথম মজা পেতো, বলতো, 'ও পিতু, তুমি যাত্রার পার্ট বলছো নাকি!' পরে অবশ্য জ্বালাতন করে পিসির ভুল বকা বন্ধ করার আগ্রহই ওর বেশি দেখতে পাই।

আমি নিজেও পিসিকে বারণ করেছি, বলেছি, 'সন্ধ্যেবেলা ওরকম আবোলতাবোল বকে তুমি কী আনন্দ পাও বল দেখি!'

মণিপিসি একগাল হেসে বলেছেন, 'ওমা, আবোলতাবোল কীরে, ওরা এলে:আমি চুপ করে থাকব?'

'ওরা মানে? বাবা মা তোমার কাছে আসে বলতে চাও?'

'না এলে কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলে?'

'আর কে কে আসে?'

'আসে—কখনো সখনো তোর জ্যেঠাকেও দেখতে পাই, কচিৎ কখনো পিসেমশাইও আসে—'

'আসে তো আমরা দেখতে পাই না কেন?'

'সে তো আমি জানি না বাবা।'

'দেখো পিসিমা—' আমি পিসিকে প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার এ কথা বলেছি, 'এসব তোমার মনের ভুল। এরকম করে আপন মনে কথা বললে লোকে তোমায় পাগল বলবে।'

'তোর মেয়ে তাই মনে করে বটে!'

'সবাই তাই মনে করবে। এসব পাগলামি তুমি আর কোরো না।'

ওই বলাই সার। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি আমি।

বুড়িদের একটু বেশি বকার দোষ থাকে, মণিপিসি আপন মনে এরকম বাজে বকে, এই ভেবেই ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়েছি।

কিন্তু সব সময় তো আর মানুষের মনমেজাজ ভালো থাকে না। যেমন, এখন। বৃষ্টি-বাদলা দেখে চারটের মধ্যে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু তার পর থেকে আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি চলছে তো চলছেই—আটটা বাজে, ছাড়া দূরে থাক কমারও কোন লক্ষণ নেই। অথচ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সেন-সাহেবের মেয়ের বিয়ে, এদের যদি নিয়ে নাও যাই, নিজে তো একবার হাজির হতেই হবে। সেনসাহেবের বাড়িও কাছেপিঠে নয়, দমদমের ওদিকে জয়পুর রোডে। নিজের গাড়ি আছে বটে, কিন্তু ভবানীপুর থেকে দমদম যাওয়া এই দুর্যোগে কি চাট্টিখানি কথা। যাওয়া হবে না বলে মোম যখন গাল ফুলিয়ে বসে আছে, সুরমা ওকে জামাকাপড় ছাড়িয়ে একটা বোনা নিয়ে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই মণিপিসি শুরু করেছেন তাঁর বকুনি।

সুরমার ভুরু কুঁচকে উঠেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। হতেই পারে, কারণ বৃষ্টির জন্যে বারান্দায় নয়—এই ঘরেই বসেছেন আজ। আমার নিজের মনের অবস্থাও তো তেমন ভালো নয়। বেশ চড়া মেজাজেই বললাম, 'মণিপিসি, তুমি একটু থামবে?'

প্রথমে যেন শুনতেই পেলেন না, দ্বিতীয়বার কথাটা বলতে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বলছিস কিছু?'

'হ্যাঁ, বলছি। রোজই তো চলে পাগলামী—আজ অন্তত একটু থামাও।'

মুখ ঘুরিয়ে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন, বললেন, 'তুই আজ যা বুড়ো, খোকা রাগ করছে। অ্যাঁ, কি বললি—যেতে বারণ করব? বারণ করলে কি আর শুনবে রে—বারণ তো আগেও করেছি। কোন সাহেবের মেয়ের বিয়ে যেন আজ—'

বিরক্তিকর। মণিপিসির দিকে না তাকিয়ে সুরমাকে আমি

বলেছি বৃষ্টি কমার কোন লক্ষণ নেই। আমি ঘুরেই আসছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

গ্যারেজের সামনেটাও পায়ের পাতা ডোবানো জল। ছাতাটা গ্যারেজের ভেতরেই ঝুলিয়ে রেখে সন্তর্পণে বার করলাম গাড়ি। বাইরের ফটক বন্ধ করার জন্যে একবার বেরুতে হল। তাতেই অর্ধেক ভিজে গেলাম প্রায়।

সবে স্টার্ট দিয়েছি, লোডশেডিং হয়ে গেল।

অসহ্য! বিরক্তিতে আমার মাথার শিরা দপদপ করতে লাগল। বিপদ যখন আসে সব দিক দিয়েই আসে। ব্যাটারি অবশ্য ফুল চার্জ করা আছে—কিন্তু ঘন বৃষ্টির দেওয়াল ফুঁড়ে আলো আর যাচ্ছে কতদূর! সামনে আসা গাড়িগুলোও হাত বিশেকের মধ্যে না এসে গেলে তাদের আলো দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে আমি কতক্ষণে পৌঁছুবো দমদম!

মোটামুটি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই চালাচ্ছিলাম, স্পীডও কম রেখেছিলাম যতটা সম্ভব। ঝামেলাটা হয়ে গেল থিয়েটার রোডের কাছাকাছি এসে। ডান দিকের রাস্তা থেকে সবেগে বেরিয়ে আসা একটা মোটর-সাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ে গেলাম সামনে এগিয়ে আসা একটা বাসের।

কী যে হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুটো হেডলাইটের তীব্র চোখ-ঝলসানো আলো, সজোরে ব্রেক চাপার বীভৎস শব্দ, মাথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা—তারপরই সবকিছু অন্ধকার।

আস্তে আস্তে জ্ঞান যখন ফিরে এল, কোথায় আছি বুঝতেই আমার খানিকটা সময় কেটে গেল।

বুঝতে পারলাম, গাড়িতেই আছি। কিন্তু গাড়িটা এখন সোজা নেই—বেশ খানিকটা কাত হয়ে রয়েছে। রাস্তার ওপরও ঠিক নেই, একটা ধারে টাল খেয়ে পড়েছে।

বেরুলাম কোনরকম করে। মাথায় যন্ত্রণাটা এখন টের পাচ্ছি না। এত বড় দুর্ঘটনার পর হাতে-পায়ে ব্যথা-বেদনাও তেমন কিছু নেই। এখন হয়তো বুঝতে পারছি না, পরে জানান দেবে।

বৃষ্টি তখনও হয়ে চলেছে সমান তালে। রাস্তায় গাড়িও চলছে এখনও, তবে সংখ্যায় কম। ক'টা বাজে বুঝতে পারছি না, হাতের ঘড়িটা আটটা পঁচিশ হয়ে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

গাড়ির অবস্থা দেখে কান্না পেলো। সামনের বনেট দুমড়ে যা তা অবস্থা। এঞ্জিনটা প্রায় বিধ্বস্ত বলা চলে। এ গাড়ি যে চলবে না সেটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। পোশাকের অবস্থা অন্ধকারে ভাল টের পাচ্ছি না, কিন্তু এ অবস্থায় কোথাও যাওয়া যায় না। বাড়ি ফিরতে হবে?

গাড়ির মায়া ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। বাসের আশা এখন না করাই ভাল। রাত যতই হোক, পথচারী প্রায় নেই। ট্যাক্সিও দেখা যাচ্ছে কদাচিৎ, এবং কোনটাই খালি নয়। সুতরাং হাঁটা ছাড়া পথ নেই।

কী করে যে এলাম এতটা রাস্তা সে-কথা না বলাই ভালো। গেট খুললাম নিজের হাতে। গ্যারেজের দরজা তখনও হাঁ হয়ে আছে। বারান্দায় উঠে নিশ্চিন্ত হলাম। রাত বেশি হয় নি। জানলা দিয়ে বাইরের ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। যেমন দেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই রয়েছে অবস্থাটা—মণিপিসি মুড়ির বাটি নিয়ে ঝিমুচ্ছেন। সুরমা উল বুনছে। মোম একটা কমিকস পড়ছে উপুড় হয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হাসি পেল আমার। কী বিরাট দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গিয়েছি ওরা কেউ জানে না। এরকম মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে প্রাণ নিয়ে ফেরাটাই যেখানে সংশয়, সেখানে রাস্তায় পড়ে থাকা নয়, হাসপাতাল নয়, সোজা বাড়িতে ফিরে এসেছি আমি!

কলিংবেলে হাত দিলাম।

আশ্চর্য, সুরমার কোন ভাবান্তর নেই। শুনতে পাচ্ছে না নাকি! কিন্তু কলিংবেল তো ঠিকই আছে! বিকেলেও অফিস থেকে ফিরে কোন গণ্ডগোল দেখি নি।

আবার টিপলাম। আবার।

ব্যাপারটা কী! বিরক্ত হয়ে দরজায় ধাক্কা মারলাম। দরজা এমনিই খুলে গেল।

রাগ হলো সুরমার ওপর। রাত হয়েছে, ফিরতে আমার কত দেরি হত ঠিক নেই কিছু! দরজা খুলে রাখে এমনি করে!

ঘরে ঢুকতেই একরাশ উজ্জ্বল আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

একী! নিজের অবস্থা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম আমি।

সমস্ত জামাকাপড় রক্তে আর কাদায় মাখামাখি। এত বৃষ্টিতেও সেসব ধুয়ে যায় নি! কী করে যে এলাম এতটা রাস্তা সেটাই আশ্চর্য!

কিন্তু এটা কেমন ব্যাপার! ঘরে ঢুকে পড়েছি, তবু সুরমার খেয়াল নেই! এত মন দিয়ে উল বোনার কী থাকতে পারে!

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল আমার। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'সুরমা, ব্যাপার কী বল তো!'

সুরমা আগের মতই নির্বিকার। আমার গলা ওর কানে গিয়েছে বলে মনে হল না। রোম যখন বই পড়ে তখন মন দিয়েই পড়ে। কিন্তু আমি ঘরের মধ্যে চলে এসেছি—ডাকছি, তাও শুনতে পাবে না!

চকিতে একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল।

তাহলে কি, তাহলে কি আমি—

ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম.

'সুরমা, আমি এসেছি— দেখো, আমি যেতে পারি নি ওখানে—'

সুরমা একটা হাই তুলে উলকাঁঠা সরিয়ে রাখল। মোমের দিকে ফিরে বলল, 'মোম, খাবি এখন?'

মোম মুখ তুলল। এবার আমার মুখোমুখি। কিন্তু ঘরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে বলে আমার মনে হল না। কমিকসটা আবার টেনে নিয়ে বলল, বাপি আসুক মা।'

ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। পাগলের মত গলা ফাটিয়ে আমি আবার বলে উঠলাম, 'সুরমা, মোম,—তোমরা দেখো, আমি এখানে—এই ঘরে! আমি ফিরে এসেছি, আমি ফিরে এসেছি—'

আমার বিহ্বল চোখের সামনে মোম কমিকসে আবার মুখ গুঁজে দিল, সুরমা উলকাঁটা টেনে নিল ফের। কেবল মণিপিসি মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। যন্ত্রণায় পিসির মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, টেনে টেনে বলতে লাগলেন, যেমন প্রতি সন্ধ্যায় বলেন, 'খোকা রে, এত করে বারণ করলেন ওরা, তবু গেলি! কপাল আমার—সবাই তোরা এমনি করে আমার সামনে থেকে চলে যাবি রে! আয় বাবা, বোস, কী করে এমন হল বল দেখি—'

পা

শোভন সোম

সকাল থেকেই নিতুর ধেই ধেই নাচ আরম্ভ হয়েছে, ঠিক মাথার ওপর, দোতলার ঘরে। নিচের তলায় তাঁর চেম্বারে মেজমামা রুগীর প্রত্যাশায় বসেছিলেন চোখের সামনে একটা মেডিক্যাল জার্নাল মেলে। নিতুর নাচ তীব্রতর হতেই হাতের জার্নালখানা টেবিলে সশব্দে রেখে স্বগতোক্তি করলেন, ধেত্তেরি!

—মেজমামা!

ডাক শুনে তিনি ফিরে তাকালেন। মা-মরা ভাগ্নে, তাঁর পিঠোপিঠি দিদির একমাত্র ছেলে বিনু কখন দেয়াল ধরে ধরে এখানে চলে এসেছে, তিনি খেয়ালই করেন নি। বিনু পঙ্গু, পোলিও ওর দুটো পা নষ্ট করেছে। বিনু এবার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল।

—কিরে, কিছু বলবি?

মেজমামা সস্নেহে বললেন। তাঁর সন্তান নেই। বিনু তাঁর কাছে তাই আপন সন্তানের মত প্রিয়।

—অত কি পড়াশুনো কর সারাদিন!—এগারো বছরের বিনু কচি বাচ্চার মত আব্দেরে গলায় জিজ্ঞেস করল।

—ও তুই বুঝবি না। যা, মামীর কাছে যা।

বিনু তবু গেল না।

—মেজমামা!

—কিরে!—মেজমামা জার্নাল থেকে চোখ তুললেন।

—আলমারিটার কাচে মানুষের খুলি আর হাড়ের ছবি আঁকা

কেন ?

—ওর মানে ওই আলমারির ওষুধগুলো খেতে নেই।

—খেতে নেই ?

—না।

—খেলে বুঝি মানুষ মরে যায় ?

—তুই ভেতরে যা বাবা, মামীর কাছে। আমি একটু বাদে আসছি।

—ও নিতু, দুধ খেয়ে যা।—দিদিমা চেঁচিয়ে ডাকলেন, বিনু তুইও দুধটা খেয়ে নে দাদুভাই।

বিনু দুধের গেলাস তুলে নিল। নিতু স্কুল থেকে ফিরেই নাচতে শুরু করেছে। দিদিমার ডাকে সাড়া দিল না। মেজমামা রুগী দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। দিদিমা বললেন, সুবোধ, নিতুকে হাঁক দে তো বাবা, কখন থেকে দুধ ঠাণ্ডা হচ্ছে।

মেজমামা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, নিতু, নিতু!

—যাই।—সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নিতু নেমে এল।

মেজমামা বেরিয়ে চলে গেলেন।

—ধেই-নাচুনি মেয়ে। সারাদিন খালি নাচ নিয়ে আছে।—দিদিমা বললেন, তোর কি সারাদিন পা নিশপিশ করে।

দিদিমা ডাকলেন, ও বিনু, ও নিতু, দুধ খেয়ে যা।

কে কানে নেয়। নিতু তখন দোতলা কাঁপিয়ে নাচছে।

বিনু খাবার টেবিলের একটা চেয়ার টেনে বসে দুধ খেয়ে উঠে চলে গেল। নিতুর দুধ গেলাসে ঢাকা দেওয়া ছিল।

মেজমামা রুগী দেখতে বেরোচ্ছিলেন। দিদিমা রান্নাঘর থেকে বললেন, সুবোধ, দেখ তো বাবা, নিতুটা দুধ খেতে আসছে না। একটু গলা চড়িয়ে ডাক দিকি।

—ও নিতু, নিতু।

—যাই বাবা যাই, খালি ডাকো তোমরা।

মেজমামা বেরিয়ে গেলেন।

মেজমামা বড় ডাক্তার, কিন্তু তিনি তো রুগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন। বড়মামা গাড়ি করে নিতুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে পাম্প করে পেট সাফ করাবার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু নিতুকে বাঁচানো গেল না। বাড়িতে হুলুস্থুল ব্যাপার।

আকাশ ভাঙা অঝোর বৃষ্টিধারার মধ্যে রাত দশটায় মেজমামা বাড়ি ফিরে এলেন। নিতু তখন পোস্টমর্টেমে যাবার জন্যে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

দিদিমার কান্নাকাটিতে তখনই মেজমামা হাসপাতালে ছুটলেন।

ঝি মানদা এসে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বলল, বিনু, তুমি জেগে থেকো না। ঘুমিয়ে পড়ো।

—ওঁরা কখন ফিরবেন, মানদা মাসী?

—কি জানি, দেরি হবে হয়তো। আহা রে, শেষে বিষ মেশানো দুধ খেয়ে মরল! এত সুন্দর চঞ্চল মেয়েটা ছিল!

মানদা চলে যেতে, অন্ধকার ঘরে, বিনু জানলা দিয়ে দেখল, জলে রাস্তা থইথই করছে। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না। রাস্তাঘাট আরো ডুববে।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে বিনু বইয়ের তাকের পিছন থেকে দ্রুতহাতে বার করে আনল ছোট একটা শিশি। ছিপি খুলে জানলা গলিয়ে দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলল সেটা।

তারপর, অন্ধকারে নিজের পঙ্গু পা দুটোর দিকে তাকিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল।

হাবুল দারোগার গল্প

অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

জামালউদ্দিনকে চেনো? মাস্টার টেলার্স। হাবুল দারোগা প্রশ্ন করলেন।

বললাম, চিনি বৈকি। বছর দুই আগে ওদের দোকান থেকে গরম কোট তৈরি করিয়েছি।

হাবুল দারোগা বললেন, লোকে চোর ধরে, জামালউদ্দিন একবার পুলিশ ধরেছিল। অবশ্য ঠিক জামাল নয়, তার দোকানের বুড়ো কারিগর মীর্জা।

কি রকম? বলে আমি পেন আর প্যাড নিয়ে বসলুম।

দাঁড়াও হে, আগে বলতে দাও, তারপর লেখো। এডিটরদের এই এক দোষ, রান্নার আগেই পাত পেড়ে বসে থাকে। এমন গল্প-পেটুক জাত আর নেই।

হেসে বললাম, কি করব বলুন, আপনারা হচ্ছেন পাকা হালুইকর। আপনাদের ভিয়েনে নিত্যি এমন মুখরোচক গল্প-মেঠাই পাক হচ্ছে যে, লোভ সামলানোই দায়।

হাবুল দারোগাও হাসলেন। বললেন, গল্প-মেঠাই খাবে তো পাক করা হতে দাও, রসে জ্বাল দিতে দাও।

পেন আর প্যাড সরিয়ে রেখে বললাম, বেশ, আগে বলুন।

হাবুল দারোগা শুরু করলেন। সাদামাটা চুরি, কিন্তু মজার।

পার্ক স্ট্রীট থেকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ঢুকেই দোকান—জামাল ব্রাদার্স। কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো টেলার্সদের একটি। কাটার হিসেবে জামালের ঠাকুর্দা নিজামের সুনাম ছিল। প্রথম বয়সে র‍্যাঙ্কিনে

কাজ করত, পরে এই দোকানটি খোলে। জামালের বাবা কামাল-উদ্দিন মিলিটারী আর পুলিশের কণ্ট্রাক্ট ধরে ব্যবসাকে কাঁপিয়ে তোলে, দোকানের হাল ফিরিয়ে দেয়! বাপের পর জামাল যখন ব্যবসার মালিক হয়ে বসল, দোকান তখন রমরম করে চলছে। এখন তার বয়স হয়েছে, কিন্তু ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখন তার জোয়ান বয়েস।

তখন দোকান বন্ধ হত ন'টায়। ক্যাশ মিলিয়ে জামালের বাড়ি যেতে দশটা বেজে যেত। দোকানের দরজার একটা পাল্লা বন্ধ করে দেওয়া হত ন'টার পর। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই আবহাওয়াটা ঘোলাটে। আশ্বিনের মাঝামাঝি হলেও বর্ষা ছাড়ে নি। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে আর ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। তাড়াতাড়ি ক্যাশ মিলিয়ে জামাল পালাবে ভাবছিল। বাড়িতে নয়, রেনবো কাফের আড্ডায়। জামাল আজকালকার ছেলে, সৌখিন মেজাজের মানুষ। বাপ-দাদার মত ফিতে-কাঁচি নিয়ে জীবন কাটায় না, জীবনের স্বাদ নিতে জানে।

ক্যাশ মিলিয়ে লকারে চাবি দিতে দিতে জামালের মনে পড়ল রেনবো কাফের আড্ডায় এতক্ষণ হাসান, সুধীর, মণি, মোহন সিং জমায়েত হয়েছে, আর তাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে সুপর্ণা—বাংলা ফিল্মের উঠতি নায়িকা। আজকের আবহাওয়াটা সত্যিই 'হুইস্কি ওয়েদার'।

চঞ্চল হয়ে উঠল জামাল। কারিগররা একে একে চলে গেছে, শুধু বুড়ো মীর্জা চোখে চশমা লাগিয়ে বসে বসে তখনও একটা প্রিন্স-কোটে বোতাম টাঁকছিল। জামাল তাড়া দিলে, তোমার হল মীর্জা ?

দ্রুত হাত চালিয়ে মীর্জা বললে, এই যে—হল বলে। আপনে দরোজা বন্দ করতে বলেন ছোট মালিক।

দোকানের পেছন দিকে আর একটা ছোট দরজা আছে, যেটা

দিয়ে একটু ঘুরে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে এসে পড়া যায়, অতএব জামাল হাঁকলে, আবদুল, দরওয়াজা বন্দ করো, আওর টিক্‌সি বোলাও!

আবদুল ছুটে গেল দরজার আর একটা পাল্লা বন্ধ করতে, কিন্তু বন্ধ করা হল না। তার আগেই ঘ্যাঁস করে একখানা পুলিশের জীপ এসে থামল দোকানের ঠিক সামনেই। একজন উচ্চপদস্থ অফিসার তড়াক করে নেমে সোজা দোকানের ভেতর ঢুকে গেল।

আবদুল হতভম্ব, কিন্তু পুলিশ দেখে জামাল চকচকিয়ে গেল না, বরং মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললে, ছঃ শা—! আসবার আর সময় পেলো না!

অফিসারটিকে অনায়াসেই সুপুরুষ বলা চলে। রঙটা খুব উজ্জ্বল না হলেও অত্যন্ত সুগঠিত লম্বা চেহারা। চোখা মুখে সরু গোঁফ, চোখে রিমলেশ চশমা, স্টার-লাগানো তার সাদা পোশাক একই সঙ্গে ভয় আর সম্ভ্রম জাগায়।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে অত্যন্ত অমায়িক হাসি এনে জামাল বললে, ইয়েস!

ধীর গম্ভীর আওয়াজে অফিসার বললে, আপনি মিস্টার জামাল-উদ্দিন তো? আমি হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি।

একটু অবাক হল জামাল। লালবাজার থেকে! পোশাকের নতুন অর্ডার আছে নাকি?

তেমনি ধীর গম্ভীর আওয়াজ হল, আমি দুঃখিত, আপনাদের বিরুদ্ধে একটা চার্জ আছে।

এবার কিন্তু রীতিমত চকচকিয়ে গেল জামাল। কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললে, চার্জ? কিসের?

নীরস গলায় এবং বিরস মুখে অফিসার বললে, বেশ কিছুদিন ধরে প্রচুর বিদেশী গরম কাপড় আপনি স্মাগল করে আনিয়েছেন।

জামালউদ্দিনের ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল: মিথ্যে কথা, বিলকুল মিথ্যে কথা! আমি স্মাগল করে আনতে যাব কেন? আমার

পারমিট রয়েছে।

আর পারমিটের চেয়েও বেশি কাপড় আপনার স্টকে আছে, তাই না?

রিমলেশ চশমার পেছনে অফিসারের একটা চোখ ছোট দেখাল।

জামাল চড়া গলায় বললে, কী যা-তা বলছেন, আমার 'কোটা' দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনি স্টক মিলিয়ে দেখুন।

অফিসারের ডান দিকের সরু গোঁফ একটু ওপরে উঠে গেল— সেটা বোধ করি পুলিশী হাসি। অফিসার বললে, আপনার আসল স্টক যে পার্ক স্ট্রীটে নয়, স্টার রোডে—আমরা জেনে ফেলেছি মিস্টার জামালউদ্দিন। সুতরাং এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি!

রাগে অপমানে আর বিস্ময়ে জামালউদ্দিন কয়েক সেকেণ্ড হতবাক হয়ে গেল। এমন কি, মীর্জা বুড়োও চশমার ফাঁকে চোখ পিট পিট করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অফিসারের দিকে। তারপর হঠাৎ জামাল বলে উঠল, এ আজব খবরটি পেলেন কোত্থেকে?

পকেট থেকে একখানা পোস্টকার্ড সাইজ ফটোগ্রাফ বার করলেন অফিসার। জামালের সামনে সেখানা ধরে বললে, মোহন সিং পাঞ্জাবীকে আপনি চেনেন? দেখুন তো ভাল করে?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জামাল। রেনবো কাফেতে মোহন সিংয়ের পাশে সে বসে আছে। সামনে তুটো-হুইস্কির গ্লাস।

রসকসহীন গলায় অফিসার বলে যেতে লাগল, ইণ্টারন্যাশনাল স্মাগলিং ব্যাপারে পুলিশ মোহন সিং পাঞ্জাবীকে খুঁজছে, কাল শেষ রাতে সে ধরা পড়েছে। আর স্বীকারও করেছে যে, প্রচুর বিদেশী গরম কাপড় আপনার স্টার রোডের গোডাউনে তুলে দিয়েছে। সো ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট, মিস্টার জামালউদ্দিন!

জামালের টকটকে লাল মুখে সমস্ত রক্ত ভয়ের ব্লটিং পেপার যেন

শুষে নিতে লাগল। নার্ভাস গলায় সে বললে, বিশ্বাস করুন অফিসার —খোদার দোহাই—মোহন সিং যে একজন স্মাগলার আমি তা জানতুম না। তার সঙ্গে একটু-আধটু হুইস্কি খাওয়া ছাড়া আর কোন সম্পর্ক আমার নেই। এই দোকান ছাড়া আর কোথাও আমার স্টকও নেই।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় অফিসার বললে, বেশ তো, আপনার ডিফেন্স কাউন্সেলকে এই কথা বলতে বলবেন।

আঁতকে উঠল জামাল। বললে, ডিফেন্স কাউন্সেল। মানে আদালত—মামলা—আমি স্মাগলিং কেসের আসামী। প্লিজ অফিসার, আমাকে বাঁচান।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় উত্তর এল, আপনি ছাড়াও তো পেয়ে যেতে পারেন।

নিতান্ত অসহায় মুখে জামাল বললে, কিন্তু তার আগে জামাল ব্রাদার্সের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে—তিন পুরুষের এই দোকান উঠে যাবে।

কাণ্ট হেল্প মিস্টার। আমাকে আমার ডিউটি করতেই হবে। সংক্ষেপে জবাব দিল অফিসার।

বোবা হয়ে গেল জামালউদ্দিন। আর চশমার ফাঁকে চোখ রেখে পিট পিট করে তাকিয়ে রইল বুড়ো মীর্জা।

কি জানি কেন হঠাৎ সুর পাল্টে গেল অফিসারের। একটা চোখ ছোট করে বলতে লাগল, আমি দুঃখিত জামাল সাহেব, আপনি শহরের একজন সম্মান্ত দোকানদার। একটা নোংরা মামলায় জড়িয়ে পড়ে আপনার সুনাম নষ্ট হবে, এটা দুঃখের বিষয় বৈকি। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন যে আইন যেমন আছে তেমনি আইনের ফাঁকও আছে।

জামাল তাকাল অফিসারের দিকে। বিমলেশ চশমার ভেতর দিয়ে ছোট চোখে কি যেন বলছে। সাহস করে বললে, আইনের

ফাঁক আছে ?

আছে বৈকি ! ফাঁক বলুন, বা ফাঁকিই বলুন। সবই এর খেলা !

দু-আঙুলে অফিসার একটা অদৃশ্য টাকা বাজালে।

সাততলা বাড়ির ছাদ থেকে পড়তে পড়তে জামাল যেন একটা কার্নিশ ধরে ফেললে। সাগ্রহে বললে, আমি রাজী অফিসার। বলুন কত লাগবে ?

কিছু না বলে অফিসার একবার মীর্জার দিকে তাকালে।

জামাল বুঝল। বললে, আসুন ! বলে অফিসারকে নিয়ে ট্রায়াল রুমে ঢুকে গেল।

বুড়ো মীর্জা চোখ পিট পিট করে তাদের দেখল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল টেলিফোনের কাছে।

নগদ সাড়ে চার হাজার টাকা পকেটে পুরে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের অফিসার যখন ট্রায়াল রুম থেকে বেরিয়ে এল, তখন রিমলেশ চশমার ফাঁকে দুটো চোখই হাসি হাসি দেখাচ্ছে। জামালের দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিন্তু চৌকাঠ পার হবার আগেই আরেকখানা পুলিশ-জীপ সাঁ করে এসে থামল দোকানের সামনে। সঙ্গে সার্জেন্ট আর কনস্টেবল নিয়ে যে অফিসারটি ঢুকে এল, সেও হেড কোয়ার্টার্সের। তাকে দেখে ভয়ে আর আতঙ্কে রিমলেশ চশমার ফাঁকে চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় অফিসারটি সরাসরি তাকে প্রশ্ন করলে, আপনার আইডেনটিটি কার্ড ?

রিমলেশ চশমা আমতা আমতা করে কি যে বললে শোনা গেল না।

দ্বিতীয় অফিসার এবার কড়া গলায় বললে, কদ্দিন থেকে জাল পুলিশ সাজা হচ্ছে ? জীপে সি, পি. লিখতেও ভুল হয় নি দেখছি !

বাঃ! বাঃ!

জাল অফিসারের গলা দিয়ে একটা ঘরঘর আওয়াজ বেরোল শুধু।

দ্বিতীয় অফিসার জামালকে বললে, এই নিয়ে পাঁচটা কেস হল, আর এটাই শেষ। আসামীর সঙ্গে আপনাকেও একবার হেড কোয়ার্টার্সে আসতে হবে জামাল সাহেব।

অফিসারের ইঙ্গিতে সার্জেণ্ট আসামীর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে। তারপর একই সঙ্গে দুটো জীপ চলে যাওয়ার শব্দ মিলিয়ে গেল।

প্রিন্স-কোটের শেষ বোতামটা টাঁকতে টাঁকতে বুড়ো মীর্জা ফিক করে হাসলে একবার।

জিজ্ঞেস করলুম, লোকটা যে জাল পুলিশ, মীর্জা কি করে সন্দেহ করল?

হাবুল দারোগা বললেন, তার পোশাক দেখে।

পোশাক তো নিখুঁত ছিল।

কিন্তু শাদা রঙের কাপড়টা ছিল অন্য কোয়ালিটির। আগেই তো বলেছি, জামাল ব্রাদার্স পুলিশের অর্ডার সাপ্লাই করে। আর জামালের ঠাকুর্দার আমল থেকে পুলিশের পোশাক সেলাই করে আসছে ওই বুড়ো মীর্জা। সুতরাং খাঁটি পুলিশের পোশাক সে চিনবে না তো চিনবে কে?

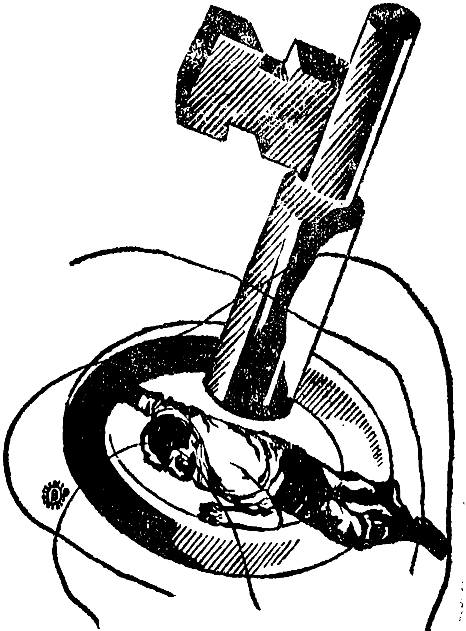

নিহত একজন

আনন্দ বাগচী

কলকাতা তখন এইরকমই, একটা কয়েন টস করার মত—কখন যে কোন্ পিঠ পড়বে কেউ জানে না।

ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য এমনি ভাবে পিঠোপিঠি খেলছে। আলো এবং অন্ধকার, কিংবা বলা ভাল, স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা। এই মুহূর্তে ঘরে ঘরে রেডিও, ঘরে ঘরে হাসি-হুল্লোড়, পথে রঙের শোভাযাত্রা মেয়ে-পুরুষ গায়ে গায়ে—দরকারে অদরকারে। ফুটপাথে হকার হাঁকছে, রকে রকে ছেলে-ছোকরাদের বেকার জটলা।

কিন্তু চোখের পলকে দৃশ্যপট উল্টে যাবে, যেন শহরের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ-তাল কেটে ফাটবে বোমা, আলো নিভবে, ধোঁয়ায় অন্ধকারে আর্তনাদে এলাকা জুড়ে এমার্জেন্সী শুরু হয়ে যাবে। তখন কোথাও কেউ স্থির নয়, স্থাণু নয়; সবাই ব্যস্ত ত্রস্ত ছুটন্ত। কেউ মারাত্মক, কেউ মরীয়া। সবাই তখন আশ্রয়-প্রার্থী, সবাই তখন অন্য মানুষ। অবশেষে আবার আলো জ্বলে উঠলে, কেউ জীবিত, কেউ মৃত। তাই বলছিলাম, কলকাতা তখন এইরকমই। একটা কয়েন টস করার মত—কখন যে কোন্ পিঠ পড়বে কেউ জানে না।

আমিও জানতাম না যখন রাখালদের বাড়ি গেছিলাম। রাখালরা থাকে সিঁথির দিকে। তখন সবে সন্ধ্যে হয়-হয়। সময়টা পুজোর মুখ-মুখ। মহালয়া পেরিয়েছে, অর্থাৎ পুজোর নোটিশ একেবারে ঘরের ভেতর পৌঁছে গেছে। ঘরে ঘরে পুজোর কেনাকাটা প্রায় শেষ। প্রায় বললাম এই জন্যে যে, কলকাতার কোন জিনিসই কখনো শেষ নয়, পুজোর জামা-কাপড় অষ্টমীর দিনেও রীতিমত বিক্রি হতে দেখেছি। হয়তো তারপরেও বিক্রি হয়। কত ঘরের কত অবস্থা, কে জানে। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কোন্ সংসারে যে কিভাবে হচ্ছে, পথে-ঘাটে ওপর-ওপর ঘুরে আমরা তার কতটুকু আঁচ করতে পারি? মুখের প্রসাধন সব সময় কি ঘামেই ধোয়? চোখের জলে কি ধোয় না?

রাখালদের ওখানে সন্ধ্যেটা ভালভাবেই কাটল। ওদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী ছিল, প্রায় পুজোবার্ষিকীই বলা যায়। গত বছর পুজোর মুখোমুখিই ওদের বিয়ে হয়। খরচ-খরচা সহজ করার জন্যে এই ব্যবস্থা। ওদের বিয়েতে আমারও সই ছিল। একদিন সুযোগ-সুবিধে পেলে অটোগ্রাফের খাতায় সই মেরেছি, বিয়ের খাতায় এই প্রথম। কিন্তু সেদিনের সইকর্তা বন্ধুদের মধ্যে আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম। খগেশ ক'মাস আগে রাজনৈতিক গুপ্তহত্যায়

কোতল হয়েছে, হরেন বদলি হয়ে গেছে বোম্বাই—একমাত্র আমিই রাখালদের বন্ধুত্বের তলানির মত কলকাতায় পড়ে আছি।

সন্ধ্যেটা রাখাল-রত্নার সাহচর্যে ভালই কাটল। একে পুজো, তায় কলকাতা জুড়ে গোপন গৃহযুদ্ধ। তাই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দু-পাঁচজন যাঁরা এসেছিলেন, সকালবেলাতেই লৌকিকতা সেরে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। বিকেলবেলার অতিথি আমিই একা। রাখাল আমার বাল্যবন্ধু, ওকে আমি ঠাট্টা করে রাখাল-বালক বলে ডাকি। রাখাল-বালিকার সঙ্গেও আমার কম করে পঞ্চবার্ষিক আলাপ-পরিচয়, অর্থাৎ ওদের বিবাহের আগে থেকেই। বলতে কি আমিই ওদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সে-পরিচয় ওরা ঘনীভূত করে নিয়েছিল ওরা নিজ গুণে। তাই আমাকে দেখে ওরা বেজায় খুশি। ভাবতেই পারে নি, বিকেলের দিকে আমি সিঁথি অভিযানে বেরোব। কারণ সিঁথির রঙ এখন রীতিমত লাল।

ওঠার তাড়া ছিল না, একেবারে স্ট্রেট অফিসে চলে গেলেই হবে। আজ নাইট ডিউটি। খবরের কাগজের আপিসে ছুটিটাই বিরল, বিশেষ করে খাস বার্তাজীবি যারা তারা আবার নিশাচর। আমি সেই নিশাচরের দলে। রত্নার হাতে ঠাণ্ডা-গরম নানারকম খাবার খেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন বিদায় নিলাম, তখন ঘড়িতে আটটা প্রায় তৈরি হচ্ছে। রাখাল আমাকে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, তাকে অনেক বচন ঝেড়ে নিরস্ত করলাম। আর সত্যিই, এগিয়ে দেবার মত কিছু ছিল না। চারপাশ একেবারে নর্ম্যাল। ঘরে ঘরে কলরব, রেডিওর কণ্ঠস্বর, আলো, পথে লোকজন, গাড়ির শব্দ।

ওদের তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে পথে নামলাম। কিছু দূরেই চৌমাথা—একটা বাঁক ঘুরলেই। রাস্তা সোজা হলে ফ্ল্যাটবাড়ির দোরগোড়া থেকেই দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বড়জোর গজ দশেক এগিয়েছি, অমনি প্রথম বোমাটা ফাটল। তারপর সামনে বাঁ [illegible]

ওদিকে একটা হল্লা উঠল। এই আকস্মিকতায় হকচকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় বিভিন্ন দূরত্ব থেকে দ্রুতলয়ে অনেকগুলো বিস্ফোরণের শব্দ। আওয়াজের গুরুত্বে আমি প্রায় বধির হবার দশা। মাটি কেঁপে উঠল, আশপাশের একতলার কাচের শার্সিগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠল। আলো নিভে গেল, দরজা-জানলা রাতের সন্ত্রস্ত পায়রার মত পাখা ঝটপটিয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিল অন্ধকারের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়া একেবারে নিশুতি। শুধু নিশুতি নয়, যেন তার নিশ্বাসও বন্ধ। বধির আমি, আলকাতরা-কালো অন্ধকারের মধ্যে স্রেফ কানার মত বেকায়দা দাঁড়িয়ে কি করব ভাবছি, এমন সময় কিছু লোক সামনের দিক থেকে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসছে টের পেলাম। সেই সঙ্গে পিস্তল আর পাইপগানের শব্দ, আর গোটা দুই বুকের রক্ত জল-করা আর্তনাদ।

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, পৈতৃক প্রাণ হাতে করে আমিও ছুটলাম। একটা বোমা ফাটল আমার খুব কাছেই, জনদুয়েক ছুটন্ত লোক আমার ঠিক পেছনেই নালার ধারে পড়ে গেল। স্প্লিন্টার কিংবা অ্যাশফল্টের টুকরো আমার পায়েও এসে লাগল। আমি থামলাম না, পড়ে গেলাম না, অন্ধকারের মধ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাখালের বাড়ির উদ্দেশে ছুটতে থাকলাম। গাঁ-দেশের অন্ধকার আর কলকাতার নিষ্প্রদীপ রাত্তিরের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ একেবারে কার্বন-কালো, এ অন্ধকার গগল্স নয়, এ ডিঙিয়ে এর ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যায় না। তবু মৃত্যুভয় মানুষের গোটাকতক ইন্দ্রিয়কে প্রখর তীক্ষ্ণ করে দেয়, চাই কি একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চেতনা এনে দেয়—যার বলে চোখ-কান বুজেও অনেক কিছু এবং আগাম কিছু দেখতে-শুনতে পারা যায়। আমিও তার বলেই নালা ডিঙিয়ে, গলি-ঘুপচি দিয়ে শর্টকাট করে চোখবাঁধা ম্যাজিসিয়ানের মত যথাজায়গায় পৌঁছলাম। ফ্ল্যাটবাড়ির একতলা ফটকে পৌঁছে একটু নিরাপদ বোধ করলাম, কারণ বাড়িটা সদর রাস্তায় নয়। একটু

থেমে দাঁড়ালাম, কয়েক নিশ্বাস দম নিলাম, তারপর ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে বোধ হয় চার পা-ও এগোই নি, কিসে যেন পা বেধে হুড়মুড় করে কার গায়ের ওপর গিয়ে পড়লাম। যার গায়ের ওপর গিয়ে পড়লাম, সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, অত বড় আঘাতেও একটা উঃ আঃ করে উঠল না। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মিথ্যেই 'স্যরি' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। অপর পক্ষের সাড়া নেই। আমার স্বাভাবিক চিন্তা-ক্ষমতা ফিরে এসেছিল ততক্ষণে। আমার হাতে গায়ে মুখে কবোষ্ণ কোন তরল গোছের পদার্থ মাখামাখি হয়ে গেছে, কেমন যেন আঠা-আঠা। হঠাৎ সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎশিহরণ খেলে গেল। ঠোঁটে কেমন নোনতা স্বাদ পেলাম। হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে আমি উঠে দাঁড়ালাম, জামাকাপড় সামলালাম। হাতের চটচটে তরল পদার্থ পাশের দেওয়ালে মুছে, পকেট থেকে রুমাল বের করলাম।

পকেটে দেশলাই ছিল না, থাকলে একটা কাঠি জ্বাললে অবস্থাটা পরিষ্কার হত। যদিও, একতলায় এই সিঁড়ির মুখের জায়গাটায় ফ্ল্যাটের দরজার সামনে যে কেউ খুন হয়েছে অনুমান করতে আমার অসুবিধে হল না। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ কোমরের দিকে ঝাঁ করে নেমে গেল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কেমন যেন মনে হল, হত্যাকাণ্ডটি এইমাত্র সম্পন্ন হয়েছে, হয়তো এই মুহূর্তে আততায়ীরা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। এই মুহূর্তে হয়তো অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আমার বুক লক্ষ্য করে পাইপগান অথবা রিভবারের নল উঁচিয়ে তাগ করছে। কপালে ফ্রীজে জমা বাষ্পবিন্দুর মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। গলা কাঠ হয়ে গেছে, মুখের ভেতরটাও শুকিয়ে আসছে। আমি যে মরতে অনিচ্ছুক এবং এতটা ভয় পাই, টের পাই নি আগে কখনো।

আমি পাগলের মত সিঁড়ি হাতড়ে ওপরতলায় ওঠবার চেষ্টা করলাম। যে কোন মুহূর্তে অন্ধকারের যে কোন দিক থেকে গুলি

গুলি এসে আমার বুকে কিংবা মাথায় লাগতে পারে—এই অনুভূতিটা ভূতের ভয়ের থেকেও কি পরিমাণে মারাত্মক, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। শত্রু যখন অদৃশ্য এবং শত্রু যখন নিকটেই মারণাস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়ে যাওয়া যায়, তখন মনের অবস্থা সহজেই কল্পনীয়। চার হাত-পায়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আমি অন্ধকার সিঁড়িগুলো দ্রুত অতিক্রম করতে গিয়ে আরো হোঁচট খাচ্ছিলাম, পিছিয়ে পড়ছিলাম। এই অবস্থায় তিনতলায় পৌঁছে আমি রাখালদের ফ্ল্যাটের দরজা দেখতে পেয়ে যেন ধড়ে প্রাণ পেলাম। ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েই আমি কম্পিত হাতে দরজা বন্ধ করে নিরাপদ হয়ে গেছি ভাবছি এমন সময় মুখের ওপর তীব্র একঝলক আলো এসে পড়ল। কেউ আমার মুখের ওপর টর্চ ফেলেছে বুঝতে পেরে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, অমনি গম্ভীর গলায় আদেশ হল : 'হাত দুটো মাথার ওপর তোল।'

গলার স্বর বাজখাঁই, রাখালের নয়। আর রাখাল এরকম তামাসাও করতে যেত না। অথচ কথাটি যে বলছে, সে রাখালদের ফ্ল্যাটের ভেতরেই রয়েছে এবং সে আমার সঙ্গে কিছু তামাসা করছে না। হাত তুলতে বিলম্ব হলে হয়তো আরেকটা ওয়ার্নিংও পাওয়া যাবে না, একটি নিরেট গুলি এসে মাথার খুলি ফুঁড়ে ঢুকবে। টর্চের তীব্র আলো আমার গোটা মুখমণ্ডলকেই স্পষ্টত টার্গেটের মধ্যে রেখেছে। আমি চোখের নিমেষে মাথার ওপর দুটো হাত উঁচু করে ধরলাম।

এমন সময় হঠাৎ ঘরের বিজলী বাতি জ্বলে উঠতেই আমার ধাঁধা কেটে গেল, কিন্তু আমি চমকে না উঠে পারলাম না। আমার থেকে হাত কয়েক তফাতে এক ভদ্রলোক বাঁ-হাতে টর্চ এবং ডান হাতে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে পা-জামা এবং ফতুয়া, বিচিত্র কম্বিনেশন, মাথায় কদমছাঁট শুভ্র কেশ। ভদ্রলোকের বয়স ষাট পেরিয়েছে। কিন্তু যে ঘরে আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে আছি,

সে-ঘর কস্মিনকালেও রাখালদের নয়। আলো জ্বলে উঠলে দর্শকরা যেমন থিয়েটারে নতুন সেট দেখতে পায়, নতুন সীন নতুন দৃশ্যপট। আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমি তো গুণে গুণে তিনতলাতেই উঠছি। এবং উঠে ঠিক বাঁ-হাতি ফ্ল্যাটেই ঢুকেছি। তাহলে এই অসম্ভব ঘটনা কি করে সম্ভব!

কিন্তু আমার তখনো একথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি যে আমি আস্ত বাড়িটাই ভুল করেছি। ভুল ঠিকানায় এসে পৌঁছেছি। হাউসিং এস্টেটের বাড়িগুলো সব এক ছাঁদের···এক ছাঁচের। আমি সম্পূর্ণ আলাদা নম্বরের বাড়িতে ঢুকে তিনতলায় উঠে এসেছি।

ভদ্রলোক এতক্ষণে টর্চ নেভালেন। তারপর কর্কশ গলায় ধমক লাগালেন: 'এখানে কি মতলবে?'

আমার জামাকাপড়ের জায়গায় জায়গায় চাপ চাপ তাজা রক্ত লেগে আছে। লোকটি ভ্রূ কুঁচকে সেগুলো লক্ষ্য করলেন: 'ক'টিকে সাবাড় করে এলে কমরেড?'

আমার গলা দিয়ে বেরোল: বিশ্বাস করুন, আমি···একটু জল···' গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, আর কথা বলতে পারলাম না।

'ন্যাকামি হচ্ছে!' হুঙ্কার ছাড়লেন ভদ্রলোক: 'পিছন ফিরে দাঁড়াও!'

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে পিছনে ফিরে দাঁড়ালাম। মাথার ওপরে হাত দু'খানা যেমন তোলা ছিল, তেমনিই থাকল। টের পেলাম উনি এগিয়ে এসে আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছেন। রিভলবারের নলটি আমার ঘাড় স্পর্শ করতেই আপাদমস্তক শিউরে উঠলাম আমি। ঠাণ্ডা নলটা ঘাড়ের খোলা অংশে ছ্যাঁক করে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, অজানা আশঙ্কায়, বুকের ভেতরটা তপ্ত তেলের কড়ায় জলের ছিটে পড়ার মত সশব্দে শিউরে উঠল। কিন্তু না, ভদ্রলোকের তেমন মারাত্মক কোন মতলব নেই। ঘাড়ের ওপর রিভলবারের নল ঠেকিয়ে রাখলেও আমাকে সম্ভবত: সাবাড় করার ইচ্ছা তাঁর নেই।

একভাবে তিনি আমার দেহ তল্লাসী করলেন পিছনে দাঁড়িয়ে। সিনেমার ছবিতে আমিও এরকম দেহ তল্লাসীর পদ্ধতি দেখেছি, এটাই তল্লাসকারীর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। আমার তাৎক্ষণিক ভয়টা মরে যেতেই স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এল। মনে হল, লোকটি এইখানকারই বাসিন্দা, পাজামা ফতুয়া পরে বেপাড়ায় বেঘরে বেড়াতে আসেন না। লোকটির যা বয়স—তাতে উগ্রপন্থী হওয়া সম্ভব নয়। মুখের শ্রী দেখে তাঁকে শিক্ষিত এবং ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। হাতে রিভলবার দেখেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, তদুপরি চুলের ছাঁট এবং এখন দেহতল্লাসীর কায়দা লক্ষ্য করে যে লোকটি অধ্যাপক কিংবা নিছক অফিসার বা ডাক্তার নন; উনি পুলিশের লোক। আলো নিভে যাওয়ায় এবং গণ্ডগোল শুরু হওয়ায় উনি হয়তো নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে আমার উন্মাদ পায়ের শব্দ শুনে সিঁড়ির বারান্দা থেকে সরে গিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমার পিছনের ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে উঠলেন: 'তাই বলুন··· তা মিস্টার চন্দ, আপনি এখানে কি করে? আয়ে ঘুরে দাঁড়ান, আর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, বরুণবাবু!'

নিজের নাম অপরিচিত লোকের মুখে শুনলে সব সময়ই রোমাঞ্চ জাগে। তারপর এইরকম পরিবেশে, যখন মৃত্যুর সঙ্গে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে মোকাবিলা চলেছে, যখন সব কিছুই, মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহার পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত, তখন আমি বরুণ চন্দ ফিরে দাঁড়ালাম নিজের নাম ভদ্রলোকের মুখে শুনে। মাথার ওপর মিনিট দুই-তিন হাত তুলে রেখেই অসাড় হয়ে এসেছিল, এখন নামিয়ে কি শান্তি। ভাবলাম ট্র্যাফিক পুলিশগুলোর সত্যিই কত না কষ্ট হয়, রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'আপনি?' আমি বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করি, 'আপনার পরিচয়টা?'

আমার চোখের ওপর থেকে পাঁচ শেলের টর্চের আলো নেমে গিয়েছিল, কিন্তু চোখের ঘোর তখনও কাটে নি। এমন সময় আলো জ্বলে ওঠায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

কদমছাঁট সাদা-মাথার বলিষ্ঠ পুরুষটি বললেন, 'বছরখানেক আগে লালবাজারে আলাপ হয়েছিল, বোধ হয় মনে নেই? শান্তি-প্রসাদ রায়।

স্মিতহাস্যে মাথা নেড়ে বললাম, 'সত্যি আমি লজ্জিত, শান্তিবাবু। এখানে হঠাৎ দেখে চিনতে পারি নি। তা আপনি এখানে?

হ্যাঁ, ছুটিতে আছি। এটা মেয়ের বাড়ি। বাড়ির সবাই অন্যত্র গিয়েছে, কাল ফিরবে। কিন্তু আপনার একি ব্যাপার, বুঝতে পারছি না তো?' এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ফের বললেন, 'জখম-টখম হয়েছেন নিশ্চয়? কোথায় লেগেছে বলুন, আমি ফাস্টএড দিয়ে দিচ্ছি।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, সেসব কিছু না। আগে এক গ্লাস জল—'

শান্তিবাবু চাকরকে ডেকে জল আনালেন, আমি ততক্ষণে তাঁর নির্দেশে সোফায় বসে পড়েছি। জল খেয়ে সুস্থ হয়ে আমি আগাগোড়া ঘটনাটা তাঁকে জানালাম। শান্তিবাবু সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করলেন। তারপর বললেন, আমি খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি এবং পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমার চলে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া পাড়া ঠাণ্ডা হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। এ অবস্থায় অচেনা মানুষ আমি পথে বেরিয়ে মারা পড়ে যেতে পারি। তার চেয়ে পুলিশ এলে পুলিশের গাড়িতে একটা ছোটখাটো লিফ্‌ট নিশ্চয়ই পেতে পারি। মার্ডারটা যদিচ রাজনৈতিক এবং আমার সম্বন্ধে শান্তিবাবুর, শুধু শান্তিবাবুর কেন, সাংবাদসাহিত্যে ওয়াকিবহাল মাত্রেরই ওয়াকিবহাল থাকার কথা। আমি যে কাগজে কাজ করি, সে কাগজ কোন রাজনৈতিক দলের নয়, দ্বিতীয়ত সাংবাদিক

কোনমতে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ অনবগত নেই কারোর। বাংলাদেশের পাঠক মাত্রেই আমার সম্প্রতি সাড়া জাগানো বাংলাদেশের তথা ভারতের রাজনৈতিক সমীক্ষার বই 'রাজা বদলের পালা' পড়েছেন। তাই সেদিক থেকে পুলিশ নিশ্চিন্ত। আমাকে খুঁজবে না। কিন্তু পুলিশী তদন্তে আমি একজন উইটনেস হিসেবে জড়িয়ে থাকবই এবং আমার নৈতিক দায়িত্বও সত্য স্বীকার না করা পর্যন্ত চুকবে না। তাই শান্তিবাবুর কথাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে, আমি অফিসে একটা টেলিফোন করে দিলাম। ডিটেলস জানালাম না, মার্ডারের কথাও না, শুধু কোন পাড়ায় যে গণ্ডগোলের জন্য আটকে পড়েছি, তাই জানিয়ে সময় চাইলাম। অর্থাৎ পৌঁছতে বিলম্ব হবে। নিউজ এডিটর লাফিয়ে উঠলেন। তিনি অবস্থাটাকে কাগজের অনুকূলে ব্যবহার করতে চাইলেন। তাঁর অভিপ্রায়, অভিপ্রায় কেন নির্দেশ, সিঁথির এই পাড়ার গণ্ডগোলের একটা জীবন্ত কাহিনী চাই। সময় লাগুক যতটা প্রয়োজন, মালমশলা নিয়ে চাই কি এখান থেকেই কাহিনী ফেঁদে নিয়ে আমি যেন অফিসে পৌঁছই। টেলিফোন করলেই প্রেসভ্যান আমাকে তুলে নিয়ে যেতে ছুটে আসবে।

পুলিশ পৌঁছে গেল ইতিমধ্যেই। থানার অফিসার শান্তিবাবুর পরিচিত এবং রীতিমত স্নেহভাজন। বয়েসে তরুণ। নিচে গাড়ি এসে পৌঁছতেই শান্তিবাবু নেমে গেলেন একতলায়। তাঁর অনুরোধ মত আমিও তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

অন্ধকারে যে অকুস্থানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমি এত ভয় পেয়েছিলাম, এখন ইলেকট্রিক বাল্বের উজ্জ্বল আলোয় সে জায়গা অনেকখানি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। অস্বাভাবিকতা শুধু রক্তের জন্যে। বলির জায়গা যেমন প্রচুর পরিমাণ রক্তে ভেসে যায়, তেমনি জায়গাটার অনেকখানি রক্ত গড়িয়ে এসে চাপ বেঁধেছে। আর রক্তের জমাট বেঁধে আসা স্রোতের মধ্যে শুয়ে আছে একটি দেহ। গৌরবর্ণের

সুশ্রী সুঠাম চেহারার সেই মৃত মানুষটি চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, চোখ দুটি আধখোলা। পরনে শ্লেট রঙের টেরিলিন স্যুট। পাচশিত রীতিতে দেহের অনেকগুলি জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ক্ষতস্থানগুলি রক্তে লাল হয়ে আছে, সেই স্থানগুলো থেকে গা-বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে প্রশস্ত হয়েছে, পরিমাণে বেড়েছে এবং ঘন হয়েছে।

এত কিছু খুঁটিয়ে দেখার আগেই শান্তিবাবু অস্ফুট ভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'আরে! এ যে ডাক্তার কুশারী!'

তরুণ অফিসার বিমান গুপ্ত শান্তিবাবুর বিস্ময়োক্তি লুফে নিয়ে বললেন, 'আপনি এঁকে চিনতেন, স্যার? ইনি কোন ফ্ল্যাটের—'

শান্তিবাবু জানালেন তিনি ডাঃ কুশারীকে ভাল করেই জানতেন। ডাঃ কুশারীর কাছেই তাঁর নাতনীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান করানো হয়েছিল। বউবাজারের কাছে তাঁর নার্সিংহোম আছে। ভদ্রলোক নিজে ভাল সার্জন ছিলেন; অকৃতদার। না, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্ভবত কোন যোগাযোগ ছিল না। এ বাড়িতে একাধিক দিন হয় শান্তিবাবুর মেয়ের ফ্ল্যাটে, নয়তো ডাঃ কুশারীর ফ্ল্যাটেই দুজনের আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, পাড়ার অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে মন খুলে আলোচনা হয়েছে। ঢাকা-বিক্রমপুরের মানুষ জানার পর থেকে দুজনেই যেন দূরসম্পর্কের আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে। ফলে নিজের নিজের মত প্রকাশ করতে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা-কপটতা ছিল না। তাই থেকেই শান্তিবাবু জানেন, লোকটি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছিলেন না। কিন্তু এখন যে দিনকাল পড়েছে, তাতে খুন হবার জন্তে বিশেষ কোন কারণ-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কে যে কার দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল, পুঁজিপতি, মজুতদার, কে যে কার অনুমানে কার দালাল, এবং কে যে কিভাবে বুর্জোয়া জান দাগিব

কোনদন নেই। আসলে ছুরির ফলায় সব মানুষই এক মানুষ, সব মানুষকেই একা এবং অসাবধান পেলে লাশ বানানো যায়।

ডাঃ কুশারী সম্ভবত সাদামাটা, নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। অমায়িক, হাসিখুশি, সাতপাঁচশূন্য। অথচ তাঁকেই মরতে হল নিজের ফ্ল্যাটের দরজায়। দরজা তখনো বন্ধ, বাড়ির লোকেরা বোধ করি এখনো জানেই না তাদের দরজার গোড়াতেই গৃহকর্তা খুন হয়েছেন। এত কাছে থেকেও মরবার সময় মুখে একটুখানি জলও দিতে পারে নি কেউ।

থানা-অফিসার মিঃ গুপ্ত শান্তিবাবুকে বললেন, 'নকশালী স্ট্যাবিং মনে হচ্ছে, স্যার। স্ট্যাবিংয়ের জায়গাগুলো দেখুন—'

শান্তিবাবু মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আগে থেকেই দেখছিলেন, কোন কথা বললেন না। গুপ্ত নিজের আবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে তখনও বলে চলেছেন, 'দেখুন, মোট ন'টি জায়গায় ছোরা মারা হয়েছে—হার্টে, লিভারে, কিডনী দুটোয়, নাভিবিন্দুতে, তলপেটে দু-জায়গায়, কুঁচকির কাছে দু-জায়গায়। এত ট্রেনড হাত, এমন অ্যানাটমি জ্ঞান অর্ডিনারি মার্ডারারের কিংবা গুণ্ডা-ফুণ্ডায় হবে না।'

শান্তিবাবু মুখ তুলে অন্যমনস্ক চিন্তাক্লিষ্ট চোখে কয়েক সেকেণ্ড গুপ্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দৃষ্টির সঠিক অর্থ ধরতে না পেরে থানা-অফিসার থমকে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্যার, কিছু বলবেন ?'

শান্তিবাবু ধার গলায় বললেন, ডক্টর কুশারীর ফ্ল্যাটে নক করো আর লালবাজারে খবর দাও। কেসটা কিরকম যেন জটিল মনে হচ্ছে।'

'কেন স্যার, কি দেখে বুঝলেন ?' গুপ্ত কৌতূহলে উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করলেন।

শান্তিবাবু কোন জবাব না দিয়ে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। আমার হঠাৎ চোখে পড়ল, সিঁড়ির দিকের সাদা

দেওয়ালের গায়ে একজোড়া রক্তাক্ত হাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। অন্ধকারে হাতের রক্ত মুছতে গিয়েছিলাম আমি, এ তারই সাক্ষ্য। মনের মধ্যে কেমন যেন শিহরণ অনুভব করলাম। হাতের ছাপের দিকে তাকিয়ে অকারণে মনে হল, একজোড়া হাতকড়া পরানো হাতের ছবি দেওয়ালে আঁকা রয়েছে। আমার নিয়তিও কি শেষ পর্যন্ত তাই? লালবাজার থেকে যদি পুলিশ-কুকুর আসে, তাহলে আমার জামাকাপড়ে—। এই পর্যন্ত ভেবেই চমকে তাকালাম নিজের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। আমার পরনে আর এখন রক্তাক্ত জামাকাপড় নেই। শান্তিবাবুর সৌজন্যে নিচে নেমে আসার আগেই জামাকাপড় বদলে নিয়েছিলাম। শান্তিবাবু আমাকে জানেন, বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু অন্য পুলিশ অফিসার কি আর তা করবেন? তবু সত্য গোপন করা চলবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো বলতেই হবে। তবে শান্তিবাবু আমাকে আগেই মুখ খুলতে বারণ করেছেন। প্রয়োজন হলে তিনি যখন বলবেন, তখনই আমি কথা বলব, তার আগে নয়।

ফ্ল্যাটের দরজায় নক করে কোন সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, দরজা বাইরে থেকে লক করা। পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেল ডাঃ কুশারী অকৃতদার। সংসারে এক অপগণ্ড ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই। অন্তত এই ফ্ল্যাটে আর কেউ বাস করে না। ঠিকে ঝি আর রাঁধুনি আসে, কাজ করে দিয়ে নিয়মমাফিক চলে যায়। বাকি সব কিছুতেই ডাক্তারবাবু ছিলেন স্বাবলম্বী। স্টোভ, কুকার, হিটার, ইলেকট্রিক কেটলি, হটপ্লেট—কুকিং ইউটেনসিলস যাবতীয় কিছু মজুত। সাহেবীআনায় তিনি নিজের হাতেও এটা-সেটা মাঝে-মধ্যেই করেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ সৌখিন। তিন বছর বিলেতে ছিলেন, এসব তারই ফল।

যাই হোক, ভাইপোটিকে অপগণ্ড না বলে [illegible]

ভাল। সে আবার নাকি আর্টিস্ট মানুষ, বছর তিনেক আর্ট কলেজে রঙ-তুলি ঘষেছিল। তারপর সেসব ছেড়েছুড়ে এক আধা-সখের নাটকের দল গড়েছে। প্রায়ই রাত কার বাড়ি ফেরে বলে ডাক্তারবাবু তার ওপরে মোটেই সুপ্রসন্ন ছিলেন না। আই-এস-সি পাশ করে ছোকরা না করল আর পড়াশোনা, না দেখল চাকরি-বাকরির চেষ্টা। নিশ্চিন্ত মনে দিব্যি স্ফূর্তিতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ডাক্তারের পকেট থেকেই ফ্ল্যাটের দরজার চাবিটি পাওয়া গেল।

বাইরে থেকে ফিরে কুশারী দরজা খোলারও সময় পান নি বোঝা গেল। শত্রুরা তাঁকে চারপাশ থেকে আঘাতের পর আঘাত হেনে চিরদিনের মত নীরব করে দেয়। টেলিফোনে ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল, লালবাজার থেকে এক্ষুণি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কেউ এবং ফটোগ্রাফার আসতে পারছেন না। স্থানীয় পুলিশ অফিসারকেই তদন্ত চালিয়ে যেতে বলা হল। শান্তিবাবু এখানে আছেন জেনে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার খুশি হলেন, বিমান গুপ্তকে তিনি শান্তিবাবুর পরামর্শ মত কাজ করতে বললেন। শান্তিবাবু লালবাজারের একটি পুরোন এবং নির্ভরযোগ্য মগজ, এর আগেও অনেক জটিলতার গিঁট তিনি ছাড়িয়েছেন।

পাড়া থেকেই একজন স্টুডিও ফটোগ্রাফারকে ডেকে আনা হল। মৃতদেহের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি, তারপর বিভিন্ন পাশ থেকে ক্লোজআপ, মৃতদেহকে উঁচু করে তুলে ধরে তার পড়ে থাকার জায়গাটার ছবি নেওয়া হল। খড়ির দাগ টেনে, মাপজোক করে বিবরণী লেখা হল মৃতদেহ একটু তফাতে সরিয়ে রাখার আগে।

শান্তিবাবু আমাকে বললেন, 'রহস্যময় কিছু লক্ষ্য করলেন, মিস্টার চন্দ?

'কি ব্যাপারে?'

'এই মৃতদেহের ব্যাপারে।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না, তেমন কিছু তো—'

আসলে এই সব বাস্তব খুন-জখমের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ যোগাযোগ বলতে গেলে এই প্রথম। পুলিশী তদন্তও নিজের চোখে দেখা এই প্রথম। অবশ্য ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে পড়ে অনুসন্ধানের ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা আছে। আর চাক্ষুষ মনুষ্যদেহে ছুরিচালনা সে শুধু ও-টিতে সার্জনের স্ক্যালপেল চালনা দেখে।

'অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ডাক্তার কুশারী, এত অতর্কিতে যে চিৎকার করার সুযোগও তিনি পান নি। শান্তিবাবু আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন, 'শুধু তাই নয়, এমন মোক্ষম মার তিনি প্রথমেই খেয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। দেহের ক্ষমতা সম্পূর্ণরকম লোপ পেয়েছিল, অথবা তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন, নইলে এতগুলি উপর্যুপরি মার খেয়েছেন, অথচ বিন্দুমাত্র বাধা দেন নি বা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেন নি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এমন অতর্কিতে সিঁড়ির প্যাসেজটুকুর মধ্যে কারো বা কাদের পক্ষে আক্রমণ করা সহজ ছিল কিনা। সম্ভব ছিল, যদি পুরো অন্ধকারের মধ্যে এই আক্রমণ করা হত। আর সম্ভব ছিল, যদি পিছন থেকে হঠাৎ কোন মারাত্মক জায়গায় ছুরি চালনা করা হত। কিন্তু ক্ষতচিহ্নগুলো লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, কোন আঘাতটাই পিছন থেকে করা হয় নি, এমন নির্ভুল লক্ষ্যভেদ দেখে এটাও সহজেই অনুমান করা চলে যে, অন্ধকারের মধ্যে নির্ভুলভাবে প্রতিটি পয়েন্টে হিট করা অ্যানাটমির প্রফেসারের পক্ষেও সম্ভব নয়। সিমেন্টের ওপরে যেভাবে রক্ত গড়িয়েছে, যেভাবে জমাট বেঁধেছে সেটা লক্ষ্য করলে, মিস্টার চন্দ, আপনিও বলে দিতে পারতেন যে, শায়িত অবস্থায় ছাড়া দাঁড়ানো বা বসা কোন অবস্থাতেই মৃতের শরীরে স্ট্যাবিং করা হয় নি। হলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়াতো, রক্ত ছেটকানোর দাগ থাকত। কিন্তু তার বদলে সমস্ত রক্তই শুধু গড়িয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ এখন সরানো হয়েছে, আপনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, জমাট রক্তের জায়গাগুলো একটা মানুষের শরীরের

আউট লাইনটাই এঁকেছে। খড়ি দিয়ে কয়েকটা রেখা যোগ করে দিলে হাত-পা-মাথাঅলা একটা ছবি ফুটে উঠবে দেখতে পাবেন। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, যখন ডাক্তার কুশারীকে স্ট্যাব করা হয়, তখন এ পাড়ার, অন্তত এ বাড়ির সিঁড়ির আলো জ্বলছিল। দ্বিতীয়, যখন তাঁকে স্ট্যাব করা হচ্ছিল, তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং অনুমান হয়, প্রথমে কেউ পিছন থেকে তাঁর মাথায় আঘাত করে। সেই প্রচণ্ড আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলে, একযোগে নয়, একের পর এক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর শরীরে আঘাত করা হয়।

শান্তিপ্রসাদবাবু থামতেই বিমান গুপ্ত কুশারীর মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখলেন, তারপরে বললেন, 'ইয়েস স্যার, ডাক্তার কুশারীর মাথার পেছন দিকে টাকের ওপর ডাণ্ডা বা হাতুড়ি জাতীয় কোন নিরেট কিছু দিয়ে খুব ভারী রকমের চোট দেওয়া হয়েছিল, তার স্পষ্ট চিহ্ন আছে।'

স্মিতহাস্যে মাথাটি দুলিয়ে শান্তিবাবু পুনরায় বললেন, 'ক্ষত-স্থানগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে, গুপ্ত, তুমি এও দেখতে পাবে, অস্ত্রের আঘাতগুলো অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এবং ঠাণ্ডা হাতে করা হয়েছে। পোশাকের ওপরে মসৃণ কাট দেখেই আমি বলে দিতে পারি যে মৃতের দেহের স্কিন-টিসু-মাস্‌ল কিছুই থেঁতলে যায় নি, পরিষ্কার এবং সরাসরি কেটেছে, অস্ত্রের ফলাটা যতখানি চওড়া ঠিক প্রায় ততখানিই ক্ষতের পরিসর এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে, প্রায় নব্বুই ডিগ্রী কোণ করে, অর্থাৎ একেবারে লম্ব আকৃতিতে অস্ত্রের ফলা দেহে প্রবেশ করেছে। হাতুড়ি ঠুকে সটান সোজা যেমন পেরেক বসানো হয়, তেমনি হাতের চাপে অস্ত্রটাকে দেহের মধ্যে প্রত্যেকবার প্রবেশ করানো হয়েছে। এবং সম্ভবত এক হাতেই প্রত্যেকটি ক্ষতছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলেছি, যে বা যারা হত্যা করেছে, মানুষের শরীর সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান তাদের

আছে। অথচ তা থাকলে এতবার অস্ত্রাঘাত করার অর্থ কি? যে হার্ট পাংচার করেছে বলে জানে, অধিকন্তু লিভার ফুঁড়েছে—তার পক্ষে অন্যত্র অস্ত্রাঘাতের বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক, এর কারণ সম্পর্কে এখন কিছুই বলতে চাই না, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। তবে ন'টি হিটিং পয়েন্ট আমি লক্ষ্য করতে বলব। চিবুকের হাড় যেখানে কানের লতি বরাবর শেষ হয়েছে, কণ্ঠনালীর দুপাশে ইন্টারন্যাল ক্যারোটিভ আর্টারি কাটা হয়েছে। বাঁ দিকের পাঁজরের ফোর্থ ও ফিফথ্ রিবস্‌এর ফাঁকে কোস্টাল কার্টিলেজ বরাবর আঘাত করে হৃদপিণ্ডটি নির্ভুলভাবে টার্গেট করা হয়েছে। চতুর্থ আঘাত ডান দিকের পাঁজরের তলা ঘেঁষে সটান লিভারে। পাঁচ ও ছয়ের চোট দুটো কিডনীতে, এই আঘাত দুটোই বেশি গভীর, ছুরির সম্পূর্ণ ফলাটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সম্ভবত। কারণ ক্ষতের প্রস্থ অপরগুলোর থেকে একটু বেশি। তারপর ঠিক নাভিমূলে। ওইখানেই অ্যাবডোমিন্যাল অ্যাওরটা নামক রক্তবাহী প্রধান শিরাটা আছে। দুই কুঁচকির কাছে, তলপেট ছুঁয়ে শেষ দুটো স্ট্যাবিং নির্ভুলভাবে ফিমোর‍্যাল আর্টারি খতম করেছে। মানুষকে মারার পক্ষে এদের যে কোন একটিই যথেষ্ট; অন্তত ওপরের দিকের আঘাতগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়। যাক, এবার কিছু তল্লাসী চালানো যাক। প্রথমে মৃতের প্যান্ট-কোটের পকেটগুলো কি বলে দেখি—'

লেকচারারের মত এতক্ষণ যেন থিওরিটিক্যাল বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে, এবার প্র্যাকটিকালে হাতে কলমে নামলেন শান্তিপ্রসাদবাবু।

ডাঃ কুশারীর পকেট থেকে বেরোল মানিব্যাগ, তাতে সামান্য কিছু টাকা আর খুচরো। একটি শ্যামবাজার সেকশানের ট্রামের মান্থলি এবং একটি টিকেট। টিকেটটি আঠারো পয়সার অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসের পুরো পথের ভাড়া। কাউন্টারের পাঞ্চ করার জায়গাটা থেকে বোঝা গেল টিকেটটি বৌবাজার থেকে শ্যামবাজার

পাশের জায়গার জন্য চিহ্ন করা। এছাড়া তাঁর হাতঘড়ির তলায় দুখানা সরকারী বাসের টিকেট ভাঁজ করে গোঁজা ছিল। সম্ভবত শ্যামবাজার থেকে সিঁথি পর্যন্ত। শান্তিবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমাদের দিকে তাকালেন। নিজের নোটবুকে টিকেট তিনখানার নম্বর লিখে নিলেন, তারপর একজন এ-এস-আইকে' ডেকে টিকেট তিনখানা দিলেন। বললেন, 'ট্রাম এবং বাস ডিপোয় ফোন করো। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোয় আর ডানলপ বাস ডিপোয়। এই টিকেট-গুলো আজকের কিনা জেনে নাও।'

এ-এস-আই একটি দর্শনীয় স্যালুট দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে ফোন করতে ছুটল। শান্তিবাবু আবার কুশারীর দেহ নিয়ে পড়লেন। হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন—ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। ঘড়িতে আটটা বাজতে দশ মিনিট বেজে রয়েছে। কাচটা একপাশে ফেটে গেছে। শান্তিবাবুর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল কিন্তু কিছুই বললেন না। টেরিলিন কোটের বুকপকেটে একটা সাদা দামি টেরিলিন রুমাল কাগজের ফুলের মত কৌশলে ভাঁজ করে রাখা ছিল। সেটা সাবধানে বের করে নাকের কাছে আগে ধরলেন, তারপর ধীরে ধীরে ভাঁজ খুললেন। বুকপকেটে গুঁজে রাখা সৌখিন রুমালের মধ্যে কিছু থাকবার কথা নয়। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু কার্যত কিছুই যে বেরোল না তা নয়, অতি ক্ষুদ্র—প্রায় চোখে না পড়বার মত একটি রঙীন চাকতি সাদা রুমালের মধ্যে ভরে আছে দেখতে পাওয়া গেল।

ভ্রূ কুঁচকে জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখলেন হাতের তালুতে রেখে। পরপর আমার আর বিমান গুপ্তের দিকে হাত বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বস্তুটি কি মনে হয়?'

বিমান মাথা চুলকোলেন। আমার মুখ ফসকে গেল: 'মেয়েদের কপালের টিপ নয় তো?'

'হ্যাঁ, তাই। একপিঠে আঠা লাগানো আছে।'

আমরা দুজনেই বিস্মিত এবং জিজ্ঞাসু চোখে শান্তিবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু তিনি আমাদের এই চাউনির কোন গুরুত্ব দিলেন না। ডাঃ কুশারীর পকেট থেকে আগেই যে চাবির রিংটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটা দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার ইয়েল লক খুললেন। ফ্ল্যাটের ভেতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে আছে।

টর্চের আলোয় সুইচবোর্ড দেখে আলো জ্বাললেন শান্তিবাবু। তারপর আমাদের দুজনকে বললেন, 'আপনারা ভেতরে আসুন, কিন্তু কোন জিনিস ছোঁবেন না। একটা পিঁপড়েও পা দিয়ে না মাড়িয়ে ফেলেন, এমনি ভাবে সাবধানে চলাফেরা করবেন। কে জানে, হত্যা সম্পর্কে এই বন্ধ ফ্ল্যাটেরও কিছু বলবার আছে কিনা।

আমরা শান্তিবাবুর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চললাম। উনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্যাসেজ পার হয়েই আমরা প্রথমে বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালাম। মাঝারি আকারে এই ঘরখানায় একটি সুদৃশ্য সোফাসেট, একটি ভরা বুককেস, একটা কাচের গা-আলমারি এবং এককোণে টিপয়ের ওপর রাখা টেলিফোন ছাড়া আর দ্রষ্টব্য কিছু ছিল না। শান্তিবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিকারের গন্ধ পাওয়া হুলো বেড়ালের মত যেন প্রথমে বাতাস শুঁকলেন, পরে ঘরের চারপাশে তাঁর চোখের সার্চলাইট ঘোরালেন। আমার নিজের অস্বাভাবিক কিছুই নজরে পড়ল না। যে জিনিস যেখানে থাকা উচিত তাই আছে, কিছুই এলোমেলো নয়—উচ্ছৃঙ্খল নয়। শান্তিবাবু সোফাসেটের মাঝখানে রাখা সেন্টার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিলটার ওপরে একটি সুদৃশ্য জাপানী সিল্কের ঢাকা, তার ওপরে খান দুই চিঠি; একখানা খাম আর অন্যটা ইনল্যাণ্ড, দুটোরই মুখ ছেঁড়া। একটা অ্যাশট্রে দিয়ে চাপা দেওয়া রয়েছে। অ্যাশট্রের মধ্যে একটু জল, তাতে একটা সিগারেটের আধখানা, একটা কাঠি, ছেঁড়া খামের সঙ্গে কাগজের ফালিটা। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে আলোটার [illegible]

থেকে চিঠি দু'খানা তুলে ঠিকানা পড়লেন, স্ট্যাম্প এবং শীলমোহর লক্ষ্য করলেন। খামের পনেরো পয়সার টিকেটটা আধখানা লাগানো, বাকি পাঁচ পয়সার টিকেটের জায়গা ফাঁকা, পোস্টমার্কের ভগ্নচিহ্ন দেখলে বোঝা যায় লাগানো হয়েছিল কিন্তু টিকেটটা খুলে পড়ে গেছে। পায়ের তলায় সুদৃশ্য গালচের ওপরে তাকালেন শান্তিবাবু, বোধ হয় খসে পড়া টিকেটটাই খুঁজলেন। আমি তাকালাম, কিন্তু পেলাম না; অবশ্য টিকেটটা যে এখানেই পড়েছে তার কোন মানে নেই, পোস্ট অফিসেও খুলে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

টিকেটের বদলে হঠাৎ আমি সাদা একটা কি জিনিস পড়ে থাকতে দেখলাম সেন্টার টেবিলের পায়ের কাছে। শান্তিবাবুকে দেখাতেই তিনি কুড়িয়ে নিলেন। বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি। শাঁখের আংটির একটা টুকরো। সযত্নে সেটা পকেটে রেখে দিয়ে শান্তিবাবু বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার চন্দ।'

হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সময় অতি তুচ্ছ বস্তু, এমন কি একটা চুল কিংবা একটুখানি ধুলোরও গুরুত্ব আছে, শার্লক হোমস্ প্রমুখ ছাপাখানার গোয়েন্দা সেকথা প্রমাণ করেছেন, জানতাম। কিন্তু আমার দেখতে পাওয়া শাঁখের আংটির টুকরোটা যে কি মূল্যে ধন্যবাদ অর্জন করল ঠিক বোধগম্য হল না। শান্তিবাবু নিচু হয়ে সেন্টার টেবিলের র‍্যাক থেকে একখানা ভাঁজকরা খবরের কাগজ টেনে বের করলেন। কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন: কিছু মন্তব্য করুন, মিস্টার চন্দ।'

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে যা মুখে এল বলে ফেললাম, কাগজ-খানা আজকের আনন্দবাজার পত্রিকা। কাগজখানার ওপরে চায়ের কাপের দাগ লেগে আছে। মনে হয়, এই কাগজ টেবিলে বিছিয়ে ডাক্তার কুশারী কিংবা তাঁর ভাইপো চা খেয়েছিলেন সকালবেলায়। তারপর ভাঁজ করে সেন্টার টেবিলের তলায় র‍্যাকের ওপরে সরিয়ে রেখেছিলেন।'

'বাঃ, এই তো।' শান্তিবাবু সপ্রশংস হাসি হাসলেন: 'সেন্টার টেবিলের তলায় একবার তাকিয়ে দেখুন তো আর কিছু বলতে পারেন কিনা?'

সেন্টার টেবিলের তলায় একটা ইলাসট্রেটেড উইকলি এবং তার তলায় আরো বেশ কয়েক দিনের খবরের কাগজ জমানো রয়েছে। কাগজগুলো হাত দিয়ে উল্টে চকিতে একটা কথা আমার মাথায় এল। শান্তিবাবুর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'উনি কি ইংরিজি-বাংলা দু-রকমের কাগজ রাখতেন? এইখানা ছাড়া কিন্তু আর সবই ইংরেজি কাগজ, স্টেটসম্যান পত্রিকা।'

'দ্যাটস দ্য পয়েন্ট।' শান্তিবাবু তারিফ করার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'উনি খুব সম্ভবত ইংরেজি খবরের কাগজই রাখতেন। আনন্দবাজারখানা বাইরের আমদানী। বিমান, তুমি ভাঁড়ার ঘরখানা একটু দেখে এসো তো, সেখানে পুরোন বইপত্র আর খবরের কাগজ রাখা আছে কিনা। যে বাড়িতে মহিলা নেই, সে বাড়িতে মাসকাবারে খবরের কাগজ বেচে দেওয়া রীতি নেই। দেখ, সম্ভবত আছে।'

ডাইনিং স্পেশের পাশে রান্না এবং ভাঁড়ার পাশাপাশি। আলো জ্বেলে বিমান গুপ্ত সেদিকে গিয়েই একটু পরে হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে এলেন।

'দেখলে?' শান্তিবাবু প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ স্যার। আপনার কথাই ঠিক, কোন বাংলা কাগজ এ-বাড়িতে নেই। ভাঁড়ারের তাকের এককোণে ইলাসট্রেটেড উইকলি আর নানারকমের মেডিক্যাল জার্নাল কয়েক থাক সাজানো রয়েছে। সেই সঙ্গে বোধ হয় কয়েক মাসের স্টেটসম্যানের স্তূপ।'

'ভেরি গুড। এবার তাহলে আমি এই বাংলা কাগজটা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলি?'

আমরা দুজনেই সোৎসাহে বললাম, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনা

অনুরোধ করব ভেবেছিলাম। বলুন—'

কাগজটা কোন অফিস কিংবা ডাক্তারের চেম্বার থেকে এখানে এসেছে। সম্ভবত বিকেলে এসেছে। এই কাগজের ওপরে যে চা-পান করা হয়েছে, তা প্রভাতী চা নয়; বিকেলবেলায় এই চা হয়েছে। চায়ের কাপের এবং ডিশের, স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট দুটো ছাপ পড়েছে। ছাপ দুটো বেশ খানিকটা তফাতে। এ থেকে বোঝা যায়, দু-কাপ চা এসেছিল টেবিলে এবং যে কারণেই হোক, এক কাপ চা কিছু সময়ের জন্যে ডিশ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল—যাতে ঠাণ্ডা হয়ে না যায় কিংবা—' সিলিংয়ের কাচের গোল ঢাকা পরানো আলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে ফের বললেন, 'পুজোর এই মুখোমুখি দেওয়ালী পোকার বড় উৎপাত। পাছে যাঁর চা তাঁর অনুপস্থিতিতে কাপে পোকা পড়ে, সেই জন্যে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন। চা-চলকে পড়া ডিশের ওপর থেকে কাপটাকে কাগজের ওপর নামানো হয়েছিল বলে ছাপটা স্পষ্ট। এবং কাপের তলার রিংয়ের ছাপ, তাই আকারে ছোট। অপর ডিশের সামান্য চা লেগেছিল তলায়, তাই বড় বৃত্ত ছাপটা অস্পষ্ট। কাগজ বিছিয়ে দিলে স্পষ্টই বোঝা যাবে লোক দুটো সেণ্টার টেবিলে মুখোমুখি বসেছিলেন। অর্থাৎ একজন বড় লম্বা আসনটায় আর অন্যজন সিঙ্গল সীটে। কিন্তু—কিন্তু—'

কথা থামিয়ে শান্তিবাবু ঘরের চারপাশটা ঘুরে তাকিয়ে কি যেন খুঁজলেন। তারপর টিপয়ে রাখা টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু টেলিফোনে হাত না দিয়ে, এমনকি সেদিকে না তাকিয়ে দেওয়ালের গায়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আমরাও সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দেওয়াল ঘেঁষে যেখানটায় টেলিফোনটা রাখা ছিল, সেখানে ফুট চারেক উঁচুতে দেওয়ালের নীলাভ ডিসটেম্পার কে যেন আঁচড়ে তুলে নিয়েছে। আঁচড়ের দাগটা স্পষ্ট এবং গভীর। আঁচড়ের ব্যাপারটা নিয়েই যে শান্তিবাবু ভাবিত হয়েছেন,—মানে তখনো ভাবছেন, আমরা বুঝতে পারলাম।

একটু পরেই হঠাৎ রুমাল দিয়ে ধরে টেলিফোনটা তুলে নিলেন স্ট্যাণ্ড থেকে, তারপর সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটু দেখে আবার রেখে দিতে দিতে দিতে শুধু বললেন, 'আই সী।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বাইরে চলে গেলেন হঠাৎ। কৌতূহলবশত আমরাও বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে তখন আশপাশের ফ্ল্যাটের জনাকয়েক এসে দাঁড়িয়েছেন, কনস্টেবলরা ভিড় ঠেকাতে ব্যস্ত। সিঁড়ির ছেলেমেয়ের দঙ্গল এক-একবার উঁকি মেরেই পালিয়ে যাচ্ছে বাড়ির অভিভাবকদের তাড়া খেয়ে। সিঁড়ির একপাশে প্যাসেজের ওপর ডাঃ কুশারীর মৃতদেহটা সাদা চাদর টেনে ঢেকে রাখা হয়েছে। শান্তিবাবু এগিয়ে গিয়ে চাদরটা তুলে কুশারীর বাঁ-হাতের কব্জিটা তুলে ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। আমার দৃষ্টিও ততক্ষণে খুলে গিয়েছে। দেখলাম, বাঁ-হাতের তালুর পিছনে —মানে কড়ে আঙুলের তলায় নীলচে রঙ লেগে আছে। ঘড়ির ডায়ালের কাচের কিনারেও ময়লার আকারে সামান্য রং লেগে আছে। দেওয়ালের ডিসটেম্পার তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর মৃতদেহের দু-পায়ের জুতো এবং মোজা খুলে কি যেন দেখলেন। ফটোগ্রাফারকে কানে কানে কি বললেন, পরে আবার ফ্ল্যাটে সেই বসবার ঘরে ফিরে এলেন। এসে ঘরের চারপাশটায় ঘুরপাক খেলেন বার দুই, তারপর দেওয়াল আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আলমারির পাল্লা দুটোয় স্বচ্ছ কাচ বসানো। ভেতরের তাকগুলো দেখা যায়। রাবার ক্লথের ওপরে ধবধবে কাপড় পাতা। তার ওপরে সারি সারি অপারেশনের যন্ত্রপাতি। স্ক্যালপেল, নাইফ, সিজার্স, ক্ল্যাম্প, ফরসেপস, রিট্র্যাকটার আরো কত কি সারি সারি মৃত সৈনিকের মত শুয়ে আছে। একেবারে নিচের তাকটায় কি চোখে পড়তেই তাড়াতাড়ি আলমারির পাল্লা খুলে ফেললেন শান্তি বাবু। রুমাল দিয়ে সাবধানে মাঝবরাবর ধরে একটা রুপকাঠি ফলক নিয়ে আমাদের দেখালেন।

'কি এটা ?'

আমি বললাম, 'খাতায় কষি টানার রুলকাঠ।'

বিমান গুপ্তও আমার কথায় সায় দিয়ে মাথা হেলালেন।

'স্টেইনলেস স্টিলের রুল, সলিড ব্যাপার,' কথাটা বলতে বলতে একহাতে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দু-পাশ পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন আগের কথার জের টেনে। 'সাদা বাংলায় ডাণ্ডা।' নাকের কাছে নিয়ে সেই সলিড ব্যাপারটির ঘ্রাণ নিলেন।

আমি রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'ঘ্রাণেও কিন্তু অর্ধেক খাওয়া হয়, শাস্ত্রে বলেছে। ওটা যদি ডাণ্ডাই হয় আপনার কথামত—'

কৃত্রিম কোপ কটাক্ষ ছুঁড়ে শান্তিবাবু হঠাৎ গুপ্তকে ফলস ধমক দিলেন, ওহে ছোকরা, ডাক্তার কুশারী মাথায় কি তেল মাখতেন বলতে পারো ?

গুপ্ত অমনি 'বলছি স্যার,' বলেই বাথরুমের উদ্দেশে ছুটলেন।

'আর বলেছ !' শান্তিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'আমি বলছি মিলিয়ে নাও গে। মহাভৃঙ্গরাজ, অনেক টাকবাজ পুরুষ যা ব্যবহার করে থাকেন।'

বাথরুম থেকে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসে বিমান গুপ্ত বললেন, 'দু-রকম তেলের শিশি দেখলাম স্যার, বাথরুমে। নারকেল তেল আর মহাভৃঙ্গরাজ।

'ও-কে।' শান্তিবাবু বললেন, 'দেখো, এই ডাণ্ডা দিয়ে ডাক্তার কুশারীকে প্রথমে মাথায় আঘাত করা হয়। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলে—বাই দি বাই, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—ডাক্তার কুশারীকে ঘরের মধ্যে প্রথম আক্রমণ করা হয়। তারপর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে স্ট্যাব করা হয়। আটটা বাজতে দশে প্রথম ওর মাথায় আঘাত করা হয়, তারপর বাইরে টেনে এনে ন' জায়গায় ছুরি দিয়ে আঘাত করতে খুব বেশি হলে দু' মিনিট সময় লেগেছে।

তার মানে তখনও পাড়ার আলোগুলো জ্বলছিল। হত্যাকারী অথবা হত্যাকারীরা ফ্ল্যাটের মধ্যে কিছু টুকিটাকি কাজ সেরেছে তারপরে। এবং দরজায় চাবি দিয়ে সরে পড়েছে নিজের আস্তানায়।'

শান্তিবাবুর একটি অদ্ভুত চার্মিং পার্সোনালিটি আছে, সেটা দীর্ঘ সময় একসঙ্গে থেকে বুঝতে পেরেছি। হত্যাকাণ্ডের মত একটা নৃশংস ব্যাপার এবং তার পুলিশী তদন্তের মত কাটখোট্টা রুটিন ওয়ার্ক এই প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেও ক্লান্তি এবং বিরক্ত বোধ করি নি। এবং এমন জমে গিয়েছিলাম, যেন এক ম্যাজিশিয়ানের সাকরেদী করে চলেছি, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে খেয়ালই করি নি। লালবাজার থেকে লোক এসে পড়তে তবে আমার চমক ভাঙল।

তারা এসে শান্তিবাবুর নির্দেশ মত নানা জায়গা থেকে হাতের ছাপ নিল, ঘরের ভেতরের আরও দু-চারটে ছবি নিল, তারপর ডেডবডি পুলিশ হাসপাতালে চালান দেবার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। বিমান গুপ্ত তাঁর খাতা খুলে রিপোর্ট লিখলেন, আমার জবানবন্দীও তাতে থাকল। অবশ্য শান্তিবাবু, আমার কাহিনী বলায় কিছুটা সাহায্য করলেন। আমি অফিসে ইতিমধ্যেই আর একটা টেলিফোন করে দিয়েছিলাম থানায় গাড়ি পাঠানোর জন্যে। শান্তিবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমান গুপ্তের সঙ্গে পুলিশী-জীপে উঠবার আগে আমি শান্তিবাবুকে আরও গোটা দুই প্রশ্ন করলাম ডাক্তার কুশারীর মার্ডার কেস সম্বন্ধে। শান্তিবাবুর বিবৃতিটা আসলে আমার বুদ্ধিতে খুব স্পষ্ট হয় নি, তাঁর ব্যাখ্যাটার পিছনে কি কি প্রমাণ আছে, অর্থাৎ কি কি পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে তিনি হত্যার নেপথ্য কাহিনীটা গড়ে তুলেছেন, তা না জানা পর্যন্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুটা ধাঁধার মত মনে হচ্ছিল। কয়েকটি প্রমাণ উপকরণ অবশ্য তিনি দেখিয়েছেন হাতে নাতে, কিন্তু তাঁর বাকি অনুমান, বাকি দেখা আমাদের কাছে খোলসা করেন নি।

আমি লক্ষ করতেই বিমান গুপ্তকেও উৎসাহিত দেখাল। বুঝলাম, পুলিশে কাজ করলেও, গুপ্তের মগজেও খানিকটা ধোঁয়া ঢুকেছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝা তার পক্ষে আরও জরুরি প্রয়োজন।

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'আমি জানি ব্যাপারটা ভাল করে ব্যাখ্যা করি নি, অবশ্য করলেও,...আমি তো লেখক নই,আপনাদের মত সুন্দর করে বোঝাতে পারতাম না। প্রথমে কি করে ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল, তা তো বলেছি। আমার তখনই মনে হয়েছিল, হত্যাকাণ্ডটা প্রচলিত ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নাও হতে পারে। হত্যাকারী নিজেকে আড়াল করার জন্যে হয়তো ব্যাপারটা বারোয়ারী হত্যার মতন করে সাজিয়েছে। তবে আমি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেনসিক রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সরকারীভাবে বলতে পারছি না। যাক সেকথা—'

শান্তিবাবু দম নেবার জন্যে একটু থামলেন, থেমে একটা সিগারেট নিজে ধরালেন এবং আমাকে একটা অফার করলেন। আমি নিলাম, উনি হাত বাড়িয়ে আগুন দিলেন ; তারপরে বললেন, আপনারা কেউ খেয়াল করেছিলেন কিনা জানি না, ফ্ল্যাটের দরজায় আমি প্রথম ডাক্তার কুশারীর নেমপ্লেটের পাশে 'ইন' শব্দটা দেখেছিলাম, তারপর পকেটে এবং ঘড়ির তলায় টিকেট দেখে বুঝলাম উনি একা ফেরেন নি, চেম্বার থেকে ফেরার পথে আর কেউ সঙ্গী হয়েছিল। হয়েছিল এমন কেউ, যিনি ওঁর বিশেষ পরিচিত। কারণ একবার গোবাজার থেকে শ্যামবাজার, পরে শ্যামবাজার থেকে সিঁথি, দুবারই কুশারী নিজে তাঁর টিকেট কেটেছেন। এবং তিনি দৈবক্রমে সহযাত্রী হন নি, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বাড়ি পর্যন্ত আসছিলেন। না হলে অমন ভাবে ডাক্তার তাঁর টিকেট নিজের কাছে জমা রাখতেন না। দ্বিতীয়ত নির্ভুল হত্যাকাণ্ডটি দেখেই আমার মনে হয়েছিল হত্যাকারী একজন এবং সে আলোয় হত্যা করেছে এবং হত্যা করার

আগে অজ্ঞান করে নিয়েছিল। ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে আনন্দবাজার কাগজখানা আমার সন্দেহকে সমর্থন করল, দুটি মানুষের চা-পানের চিহ্ন মিলল। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের একটা টুকরো এবং তার তলায় খামের ছেঁড়া কাগজের ফালিটুকু। কুশারীর সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি ধূমপান করতেন না আমি ভাল করেই জানি। তাহলে তাঁর অতিথি সিগারেটটি ধরিয়েছিল এবং সম্পূর্ণ খাবার আগেই আশট্রেতে ফেলে দিয়েছিল। সঙ্গে যে এসেছিল, সে তাহলে তাঁর ভাইপো অন্তত নয়। খামটি খোলার আগে কেউ যে সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে নি, খামের ছেঁড়া কাগজ তলায় থাকায় তা স্পষ্ট। খাম এবং ইনল্যাণ্ডখানা আজই এসেছে এবং বিকেল সাড়ে চারটের ডেলিভারী ছাপ মারা আছে। অতএব অন্তত পাঁচটার আগে চিঠি দুখানা বিলি হয় নি এবং খোলাও হয় নি। অতিথির সঙ্গে চা খেতে বসেছিলেন ডাক্তার, নিজের হাতে চা তৈরি করেও এনেছিলেন তিনি, কিন্তু খাবার আগেই তাঁকে হঠাৎ উঠে যেতে হয়েছিল সোফা থেকে। কোথায় গিয়েছিলেন তিনি, হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হয়েছিল, যার ফলে চায়ের কাপে ডিশ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল? টেলিফোন ধরতে উঠে গিয়েছিলেন পরে বুঝতে পারলাম। টেলিফোনে কথাবার্তা হবার পর তিনি নিজে কোন নম্বরে ডায়াল করছিলেন সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, অতিথির দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে। অতিথি সেই সময়টার সদ্ব্যবহার করেছিলেন ভারী লোহার রুল দিয়ে মাথার পেছন দিকে একটি মোক্ষম ঘা বসিয়ে। কাটা কলাগাছের মত পড়ে গিয়েছিলেন কুশারী, টেলিফোন রিসিভার লেগে দেওয়ালের ডিসটেম্পার আঁচড়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতে বাঁধা ঘড়ি দেওয়ালে প্রচণ্ড চোট পেয়েছিল, ফলে ঘড়ির ব্যালান্স স্প্রীং ভেঙে কাঁটা তিনটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুশারীর হাতঘড়ি অনুযায়ী সময় আটটা বাজতে দশ। আমাদের মাননীয় অতিথি তখন ডাক্তারের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে

সিঁড়ির চত্বরে নিয়ে গিয়ে খতম করেন। তারপর ফিরে এসে চায়ের কাপ দুটো সরান, ধুয়ে মুছে কাবার্ডে রেখে দেন। রুলটাতে হাতের ছাপ মুছে দেওয়াল আলমারির তলায় তাকে ফেলে রাখেন, কিন্তু কয়েকটি চুল এবং চুলের তেল যে তার গায়ে লেগে থাকল, তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেন না। খবরের কাগজটি পর্যন্ত সেণ্টার টেবিলের র‍্যাকে ভরে ফেলেন। উল্টে-পড়া টিপয় এবং টেলিফোন ঠিক করে বসান। কিন্তু নিজের হাতের ভাঙা আংটির একটা টুকরো যে কখন খসে পড়ল খেয়াল করেন নি। আলমারি থেকেই তিনি ছুরিখানা সংগ্রহ করেছিলেন, আবার ধুয়ে-মুছে সেখানা সেখানেই রেখে গিয়েছেন। ডাক্তারী অস্ত্রগুলির দিকে চোখ পড়তেই আমার প্রথমে ছন্দপতনটা চোখে পড়ে। সুবিন্যস্ত ইনস্ট্রুমেণ্টগুলোর মধ্যে একখানা ছুরি নড়া দাঁতটির মত সারির মধ্যে বাঁকা ভাবে যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। ভাল করে নজর করতেই বাঁটের খাঁজে একবিন্দু জল চিকচিক করছে দেখতে পেয়ে গেলাম। ব্যস, সব ব্যাপারখানাই জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল। হত্যাকারী জানতে দিতে চান না, ডাক্তার কুশারী মৃত্যুর আগে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। জানতে দিতে চান না, তাঁর সঙ্গে তখন আরো কেউ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অতি সাবধানীও ব্যস্ততার মুহূর্তে কিছু কিছু ভুল করে থাকে। এই ভুল আকারে ছোট হলেও প্রকারে মারাত্মক। ডাক্তার কুশারী নিজের চেম্বার থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসেন। তেমনি আজও ফিরে আসছিলেন, এসে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, হত্যাকারীর প্রমাণ করার বিষয় ছিল এইটুকুই। নিজের ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে কয়েকজন গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন অস্ত্রাঘাত দেখে তাই প্রমাণ হবে। কিন্তু হত্যাকারী দুটো মারাত্মক ভুল করলেন এইখানে। এক, শেষ বিকেলের ডাকে আসা চিঠি দুটো সরিয়ে ফেলার কথা ভাবতে পারলেন না। দু' নম্বর, ডাক্তার কুশারীর

পায়ে ভুল জুতো পরালেন।'

আমি আর বিমান গুপ্ত দুজনেই একসঙ্গে বিস্ময়োক্তি করলাম, 'ভুল জুতো ?'

'হ্যাঁ, ভুল জুতো এবং মোজা। প্রথম মৃতদেহ দেখতে গিয়েই আমি চমকে উঠেছিলাম, ডাক্তারের পায়ে দু-রকমের শু দেখে। দেখতে হুবহু এক, কিন্তু একটি চামড়ার সোল, অন্যটির রবারের। মোজাও কালো, কিন্তু নক্সা আলাদা। একজন ডাক্তার এতখানি কালার ব্লাইণ্ড নিশ্চয় হবেন না। বিশেষ করে এক-একটা জুতোর কম্ফোর্ট অ্যাকোমোডেশান এক এক রকমের। ব্যবহারের জুতো চোখ বুজে পায়ে গলিয়েও বুঝতে পারা যায়। তখনই আমার মনে খটকা লেগে যায়। তারপর ফ্ল্যাটে ঢুকে, তোমরা লক্ষ্য করেছিলে কিনা জানি না, আমি ওঁর জুতোর শেলফের কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। জুতোর শেলফে জুতো রাখার বদলে, মাটিতে অনেক জোড়া নানা আকৃতির নানা রঙের জুতো এলোমেলো করে রাখা আছে। বুঝলাম, উনি ছিলেন সেই ধরনের মানুষ—যাঁরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকক্ষণ জুতো পরে থাকতে বাধ্য হন। ফলে জুতো-অসহিষ্ণু যাকে বলে। ওঁর অনেক জোড়া জুতো ওঁর জুতোর শখ বা সৌখিনতা প্রকাশ করছে না, উনি জুতো-বিলাসী ছিলেন না, আসলে জুতো পাল্টে পাল্টে উনি মুখ বদলানোর মতই পায়ের স্বাদ বদলাতেন। ঘরে এসেই সবপ্রথমের কাজ ছিল পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। এ ধরনের মানুষ আপনারা সবাই কখনো না কখনো প্রত্যক্ষ করেছেন। যাঁরা সব ব্যাপারে বেজায় গোছালো একমাত্র জুতোর ব্যাপারে ছাড়া। তাই হত্যাকারী পাশাপাশি পড়ে থাকা দু-জোড়া কালো রঙের শু সংগ্রহ করে এনে কুশারীর পায়ে পরিয়েছিলেন, কিন্তু দুটো পাটি যাচিয়ে দেখেন নি। অ্যাক্সিডেণ্ট ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু ভাগ্য যখন বিরূপ হয়, তখন সবই বিপক্ষে যায়। সুতোর জট তখন ফাঁসের রূপ নেয়। এই জুতো

বদলের তলায় আর একটি মোক্ষম সূত্র সেঁটে গেল। কুশারীর পায়ের তলায় ছোট্ট একটুখানি ছাপা কাগজ কখন লেপটে গিয়েছিল। সম্ভবত বাথরুম থেকে ভিজে পায়ে বসবার ঘরে ফিরে আসার সময় খসে পড়া সেই পাঁচ পয়সার টিকেটটার আঠালো দিকটা মাড়িয়েছিলেন কুশারী। ফলে সেঁটে গিয়েছিল টিকেটটা। টিকেটের ওপরে তারিখ এবং সময়ের সীল আছে। সুতরাং সব ব্যাপারগুলো কেমন লেখা নাটকের মতন জমে উঠেছে বুঝতেই পারছেন।'

'বুঝলাম।' আমি সমীহ ভরা গলায় বলি, 'কিন্তু আনন্দবাজার কাগজখানা যে কোন অফিসের টেবিল থেকে এনেছিল, সেটা কি করে জানা গেল?'

'অতি সাধারণ উপায়ে।' শান্তিবাবু ঈষৎ লজ্জিত হাসি হাসলেন যেন, 'খবরের কাগজের পৃষ্ঠার এককোণে রাবার স্ট্যাম্পের বেগুনি রঙের কালি লেগে আছে। স্ট্যাম্পপ্যাডের টিনের বাক্সটা বোধ হয় খোলা অবস্থায় ছিল এবং তার ওপর কাগজ এবং কাগজের ওপর কনুই কিংবা হাতের চাপ পড়েছিল।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য! আপনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি রীতিমত উপন্যাস, মশাই!'

'কিন্তু সেই সঙ্গে কি বাস্তবও নয়?' বিমান গুপ্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালেন।

'একশোবার।' আমি বললাম, 'একটু লিফট দেবেন কি? থানা অবধি আপনার সঙ্গে?'

'একশোবার।' গুপ্ত আমার কথার প্রতিধ্বনি করে হাসলেন।

পরদিনের কাগজেই আমার 'নিহত একজন' নাম দিয়ে ক্রমশ প্রকাশ্য রচনাটির প্রথম কিস্তি বেরিয়ে যাবার পর রীতিমত সাড়া গেল। নিউজ এডিটার আমাকে তাঁর কামরায় ডেকে পিঠ চাপড়ে

বললেন, 'সাবাস বরুণ। তুমি সার্কুলেশানের টাকা ভেঙে দিয়েছ? আজ কাগজ খুব টেনেছে বাজারে। আরো কয়েক হাজার বেশি ইম্প্রেশান দিলে ভাল হয়। বাই-উইকলিতে তোমার স্টোরি রিপ্রিণ্ট হচ্ছে—পরের কিস্তির জন্যে তৈরি হও—'

নিউজ এডিটার ধুরন্ধর মানুষ, এর বেশি আমাকে কিছুই বললেন না। কিন্তু আমার পরিচিত দুজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটারের মুখ থেকে বিস্তৃত বিবরণ পেলাম। আজ সকাল থেকেই নাকি টেলিফোনে কোয়ারি এবং কনগ্রাচুলেশান শুরু হয়ে গেছে। নিজের বাড়িতে বসেই নিউজ এডিটার প্রায় ডজনখানেক ব্রেকফাস্ট কল পেয়েছেন। খবরের কাগজের প্রভাতী প্রতিক্রিয়াকে সব নিউজ এডিটারই আশঙ্কা এবং আগ্রহভরে প্রত্যাশা করে থাকেন। সহকর্মী এবং বন্ধুরা দেখা হতেই হৈ হৈ করে তাঁদের আন্তরিক প্রশংসা জানালেন। এমন জ্যান্ত লেখা, এমন সাসপেন্স নাকি অনেককাল পড়েন নি।

আমি নিজে চিন্তিত হলাম। আমার এক স্বর্গত জার্নালিস্ট গুরুর সাবধান-বাক্য স্মরণ হল: পেন, পয়জন অ্যাণ্ড পেনালটি। খবরের কাগজের কলমের এই দু-মুখী বিপদ। স্লো পয়জনিং এবং সুইফট পয়জনিং-এর কবলে পড়ার আশঙ্কা অনেক সুস্থ ও সবল কলমচারীরও থাকে, তেমনি উল্টো দিকেও একটু বেকায়দা হলেই হেভী পেনালটি। কলমের স্টিল নিবও গুঁড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। পরবর্তী কিস্তির জন্যে তাই আমি এবার দুশ্চিন্তিত হলাম।

গল্পের বাকি কাঁচা মশলার ধান্ধায় আমাকে অগত্যা ব্যস্ত হতেই হল। থানায় টেলিফোন করে জানতে পারলাম, পুলিশ যথারীতি তার রুটিন মাফিক কাজ এগিয়েছে। পুলিশ মোটা রেখায় চলে। ডাক্তার কুশারীর ভাইপো শ্রীমান তরুণকুমারকে শহরের এক হোটেল থেকে মাঝরাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাকা ডাঃ কুশারীর হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে তরুণকুমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত—পুলিশ

এরকম সন্দেহ করছে। তরুণকুমার ডাঃ কুশারীর হত্যার খবর পুলিশের মুখ থেকেই প্রথম শুনছে, এরকম বললেও পুলিশ স্বভাবতই বিশ্বাস করে নি। তাদের ধারণা, হত্যার সন্দেহ থেকে গা বাঁচানোর জন্যেই তরুণকুমার বাইরে রাত কাটাচ্ছিল। কিন্তু সে যাই কেন না হোক, তরুণকুমারকে হোটেলের ঘরে যে অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার জন্যেও অন্তত পুলিশ কেস হবে। তরুণকুমারের কাছে প্রায় হাজারখানেক টাকা পাওয়া গেছে এবং পাওয়া গেছে 'বারো ইয়ারী' নামক নাট্য সংস্থার নায়িকা বুলবুলি সেনকে। শ্রীমতী বুলবুলিকেও পুলিশ হাজতে পুরেছিল, পরে সকালবেলা মুচ্‌লেখার শর্তে ছেড়ে দেয়।

পুলিশ-লক-আপে তরুণকুমারকে পত্রিকার তরফে ইনটারোগেট করতে তক্ষুণি ছুটলাম লালবাজারে। অভাবিত ভাবে সেখানে দেখা হয়ে গেল শান্তিবাবুর সঙ্গে। আমাকে দেখেই একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে সাহিত্যিক। আমাদের বলায় আর আপনাদের লেখায় এইখানেই তফাৎ। লেখাটা সেন্সেশনাল হয়েছে মশাই—'

আমি লজ্জিত হেসে বললাম, 'আপনার জামাকাপড় কাচিয়ে দিয়ে আসব, দু-একদিন হয়তো—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে শান্তিবাবু বললেন, 'ওসব কাপড়চোপড় এখন রাখুন, মশাই। পরের কিস্তিটার কথা ভাবুন। মাল-মশলা কিছু জুটল? তরুণ-প্রতিভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল?'

আমি মাথা নাড়তেই বললেন, 'বাদ দিন তাহলে। ওখানে কিছু নেই। চলুন, যাবেন একটা ইণ্টারেস্টিং জায়গায়?'

আমি আগেই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে পরে জানতে চাইলাম, 'কোথায়?

'বারো ইয়ারের ইয়ারণী, ইরোইন সন্দর্শনে।'

বুঝলাম বুলবুলি সেনের কথা বলছেন শান্তাপ্রসাদ। বললাম,

পুলিশ তো তাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো আমরা তাকে একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি না। আমি যাচ্ছি, আপনি যদি যাবেন, চলুন।'

পথে যেতে যেতে আমি বললাম, 'আপনি কাল থানার ও-সি'র সামনে হত্যার যে ব্যাখা দিলেন, কই, পুলিশ তো আপনার কথা কানে নিল না! আপনি নিজেও তো পুলিশেরই লোক!'

শান্তিবাবু হেসে বললেন, 'পুলিশ আমার অনুমান সিদ্ধান্ত কানে নেয় নি, ঠিক না। নিয়েছে। খতিয়ে দেখছে, হাতে-কলমে প্রমাণ মিলিয়ে দেখছে। কিন্তু বাইরের দিকে, পুলিশী অনুশাসনের যান্ত্রিক একটা দিক আছে। তার একটা কঠোর কঠিন ক্রুড মেথড আছে। সেই মেথডিক্যাল ওয়ার্ক তাকে করতেই হয়। সমস্ত স্টেজগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, ফলে দেশের সাধারণ লোক ভাবে পুলিশ হৃদয়হীন তো বটেই, মস্তিষ্কহীনও সেই সঙ্গে। সে কাকে ধরতে কাকে ধরে, কাকে ছুঁতে কাকে ছোঁয়। বাই দি বাই—' পকেট থেকে মুখরোচক চুরুটের খাপ বের করে একটা চলবে কিনা ভঙ্গিতে ভুরু নাচালেন। আমি ওঁর হাত থেকে একটি চুরুট নিলাম। চুরুটের খাপ পকেটে রেখে দিয়ে শান্তিবাবু নিজের চুরুটটিকে প্রথমে ছুরুস্ত করে নিয়ে মুখস্থ করতে করতে বললেন, 'পোস্টমর্টেম আর ফরেনসিক রিপোর্ট যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে আমাদের কালকের অনুমান সত্যি। এই স্টিলের ডাণ্ডা দিয়েই ডাক্তারকে প্রথম কাবু করা হয়, তারপর নাটি ভাইটাল পয়েন্টে সার্জনস নাইফ দিয়েই স্ট্যাব করা হয়। জামাকাপড়ের ওপর থেকেও তারা নির্ভুলভাবে টার্গেট হিট করেছিল। তবে প্রথম স্ট্যাবিং একেবারে হার্টে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। আঘাতগুলো শায়িত এবং অনড় অবস্থায় করা হয়েছিল। মৃত্যুর সময়টা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে যে কোন সময়ে। মৃত্যুর ঠিক আগেই তিনি চা-পান করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, স্টম্যাক স্টাডি করে।

টেলিফোন রিসিভারে আর দরজার হাণ্ডলে একই হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে, যে-ছাপ ডাক্তার কুশারী কিংবা তরুণ কুশারীর নয়।'

'আচ্ছা শান্তিবাবু, এই হত্যা যদি রাজনৈতিক নয়, তাহলে এর পেছনের উদ্দেশ্যটা কি বলতে পারেন? কাল বিকেলের ইনল্যাণ্ডখানা তো লাল কালিতে লেখা নকশাল অ্যাকশান স্কোয়াডের শাসানি চিঠি ছিল শুনলাম। আপনি আমাকে কাল কিন্তু বলেন নি।'

চুপ করে চুরুটের নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শান্তিবাবু বললেন, 'বলি নি তার কারণ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওর সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।'

'আপনি কিন্তু আবার ধোঁয়া ছড়াচ্ছেন।'

'না, না, ধোঁয়া তো কিছু নয়। আমি 'সরাসরি সম্পর্ক নেই' বলে এই বোঝাতে চাইছি, যে বা যারা ওই চিঠিতে ডাক্তার কুশারীর মুণ্ডু নেবে বলে শাসিয়েছে, তাঁরা কক্ষণো কাল ওঁর গায়ে হাত দেয় নি। তবে ওই চিঠি যে হত্যাকারীকে হঠাৎ উৎসাহিত করে নি, এ-কথা হলফ করে বলা শক্ত। কারণ দেখা যাচ্ছে, চিঠিতে তিনি আগন্তুক অর্থাৎ হত্যাকারীর সামনেই খুলে পড়েছেন।'

'এই হত্যার তাহলে উদ্দেশ্য?'

'উদ্দেশ্য?' শান্তিবাবু হাসলেন, 'খুনের ওইটিই তো চাবিকাঠি। মোটিভ। ওটা হাতে পেলে তো হত্যাকারীকেও প্রায় হাতে পাওয়া গেল। উঁহু মশাই, উদ্দেশ্য এখনই বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থ অথবা ঈর্ষা…আর হ্যাঁ, একটা কথা বলা যায় বোধ হয়, এই হত্যাকাণ্ডটি রমণীঘটিতও হতে পারে।'

'মানে?'

'মানে নারী এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত থাকতে পারে। আপনি অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেটের টুকরোটা ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন কি? জানি, তেমন করে লক্ষ্য করেন

নি। করলে একটা রেড সিগন্যাল দেখতে পেতেন

'রেড সিগন্যাল।' আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি।

'হ্যাঁ, রেড তো বটেই, সিগন্যালও বৈকি। সিগারেটের গোড়ায় লিপস্টিকের দাগ। আমি প্রথমে পান ভেবেছিলাম, কিন্তু আর একটি শৃঙ্গার চিহ্ন—আই মীন রঙীন টিপ বুকপকেটে, চোখে পড়ায় (সরি টু আটার সাচ ওয়ার্ড) পরে মত পরিবর্তন করি। ফরেনসিক আরো পরে আমাকে কনফার্মড করে।'

ডাক্তার কুশারী সম্বন্ধে তাহলে—'

'হ্যাঁ, তার জীবন শিশুনাট্য ছিল না। তিনি স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ছিলেন, একথা ভাবার কারণ নেই। তাঁর ফ্ল্যাটে অনেক সময়ই নানাবিধ মহিলারা আনাগোনা করতেন, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানা গেছে। তরুণকুমার কিন্তু আমাকে মুগ্ধ করেছে, মশাই। ছেলেটির সম্বন্ধে খুড়োর মুখে এবং লোকমুখে যেসব বিশ্লেষণ শুনেছিলাম, তা ঠিক নয়। খুড়োর সম্পর্কে কিন্তু সে একটিও বিরূপ মন্তব্য করে নি, এমন কি ডাক্তারের এই জীবনের সম্বন্ধে একটি অক্ষরও উচ্চারণ করে নি।'

'ডাক্তার কুশারীর উত্তরাধিকারী বলতে তো ওই একজনই? প্রপার্টি বলতে যা কিছু মৃত্যুর পর তরুণকুমারই তাহলে পাচ্ছে?'

চুরুটের ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে জুলজুল করে তাকালেন শান্তিবাবু: 'বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। শুধু লাভ-ক্ষতিয়ান দিয়ে সব বিচার চলে না, প্রমাণ চাই। অ্যালিবি জিনিসটা উড়িয়ে দেবার নয়। খুনের সময় তরুণকুমার স্টেজে, পুরোদস্তুর অভিনয় চলেছে। এই নাটকে নায়ক স্বয়ং তরুণ, নায়িকা বুলবুল। সপ্তাহে তিনদিন অভিনয়, নাম করেছে বইটি।'

আর বেশি কথা হল না। হরীতকী বাগান লেন যেখানে একটা মোচড় খেয়ে অন্য রাস্তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সেইখানে ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে শান্তিবাবু

চোখের ইশারায় একটি দোতলা বাড়ির একটি বিশেষ জানলা দেখালেন। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটি মেয়েলি হাত জানলার পর্দা টেনে দিচ্ছে। হাতের মালিকাকে দেখতে পেলাম না, তবে সে যে তরুণী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

হয়তো জানলা থেকেই লক্ষ্য করেছিল, না করার কারণ নেই, হরীতকী বাগান লেনের এই টাই-নটের মধ্যে ট্যাক্সি কমই ঢোকে, ঢুকলেও বিকেল ঘেঁষা শেষ দুপুরে, এখন প্রায় ঘুঘু ডাকা নির্জনতা। সারা দুপুর ক্রিকেট-পেটা ছেলেগুলোও এই সময় ঘরে ঢোকে। চৌবাচ্চায় কলের জলের শব্দ ছাড়া ইস্কুল-কলেজ ছুটির দুপুরে, এই শেষ প্রহরে অন্য শব্দ নেই। তাই ট্যাক্সির শব্দ, এবং পরিশেষে সিঁড়িতে জুতোর মসমস ধ্বনি বুলবুলি সেনকে কৌতূহলে আকৃষ্ট করেছিল। দরজার পর্দা সামান্য সরিয়ে অর্ধাঙ্গিনী হয়ে দাঁড়ালে। তার পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চি দুরন্ত ফিগারের দিকে তাকিয়ে আমি থ হয়ে গেলাম। খবরের কাগজে মঞ্চকথা বিভাগে যে ছবি দেখেছি শ্রীমতীর তার সঙ্গে এর দিনে-রাতের ফারাক। গানের কথাগুলোর লিখিত চেহারার সঙ্গে সুরে-তালে-কণ্ঠে বেজে ওঠা রূপের যে তফাৎ।

সেই মঞ্চসফল রূপশ্রী তখন দ্রুত সমাপ্তির পথে, আবৃত অনাবৃত দেহে তখনো কিছু কিছু ফিনিশিং টাচ বাকি। শরীরে একটা বাটিক প্রিণ্ট ফার্স্ট রাউণ্ডে জড়ানো, খোঁচখাঁজ এখনো দ্রুত হস্তক্ষেপের অপেক্ষায়। মাথায় চুলের তাল যেন দোমেটে অবস্থায়, মুখের ফাউণ্ডেশনে এখনো কি যেন, না, ধরেছি, চোখের কাজ বাকি। আইলাইনার তার রুট ঠিক করে নি এখনো। ভ্রূ তৈরি, ঠোঁটে পলাশ কলির মত রং ধরেছে, কিন্তু জামা এখনো বাছাই করা হয় নি, আঁচলে গা ঢাকা দেওয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বুলবুলি জানালো, 'কোত্থেকে আসছেন?'

হাড়ের ছড়িটার মাথায় ঢাউস ঢাউস পাথুরে আংটিবহুল হাতের

মুঠোটি বিশেষ দ্রষ্টব্যের মত সামনে বাড়িয়ে রেখে শান্তিবাবু অম্লান বদনে বললেন, 'কোন্নগর থেকে, কিন্তু ইয়ে···সেকথা কোন পয়েন্ট নয়···আমরা এসেছি আপনার সঙ্গে—'

'বুঝেছি। পাশের ঘরে বসুন, আমি আসছি—'

'আপনিই তাহলে?' শান্তিবাবু মফঃস্বলী পয়সাওয়ালা প্রৌঢ়ের মত বিস্ময়ে মুখব্যাদন করলেন।

অদ্ভুত সুরেলা গলায় হেসে উঠল বুলবুলি, 'কেন, পছন্দ হল না?'

বিষম খাওয়ার মত গলায় হাসি এবং কাশি মিলিয়ে শান্তিবাবু বললেন, 'না, না, হতেই হবে।'

পাশের দরজার পর্দা সরিয়ে আমরা একটি অপরিসর স্বল্পা-লোকিত বৈঠকখানায় ঢুকে একটি সস্তা সোফাসেটের ওপর বসলাম। আমাকে চোখ টিপে শান্তিবাবু মশার মত গলায় কানে কানে বললেন, 'গ্রীনরুম বিউটি কেমন লাগল?'

আমি লজ্জা পেলাম। বুলবুলির দিকে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, হয়তো সেইটে লক্ষ্য করেই কথাটা বলা হল। আমি শুধু অপ্রস্তুত হাসি হাসলাম!

একটু পরেই বুলবুলি এল, বুলবুলি পাখির মতই রঙীন এবং স্মার্ট চেহারায়। হাতে দু পেয়ালা চা। আমাদের দুজনের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলুন কী ব্যাপার।'

'তার আগে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি একজন নাটক লেখক—নাম বরুণ চন্দ। আর আমি কোন্নগর নাট্যপরিষদের সেক্রেটারী। আমরা এসেছিলাম আপনার সঙ্গে কোন এগ্রিমেণ্ট করা যায় কিনা ···কিন্তু আপনি বোধ হয় এক্ষুণি বেরোচ্ছিলেন—'

'না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, একটু পরেই না হয় বেরোব, কিন্তু—'

'আজ্ঞে?'

'বারো-ইয়ার্য়ীর নাটক ছাড়া তো অন্য কোথাও আমার অভিনয় করার স্বাধীনতা নেই।'

'আপনাদের পরিচালকের পারমিশন যদি আমরা যোগাড় করি—মানে আমাদের তো একটা দিনের ব্যাপার—আপনাকে অবশ্য যথাযোগ্য সম্মানদক্ষিণাই দেব। আসলে কি জানেন, হিরোইন আমাদের ঠিকই ছিল, কিন্তু গত রাতে হঠাই তুমহলায় আপনার অভিনয় দেখে আমাদের দুজনেরই তাক লেগে গেছে একেবারে—বিশেষ করে প্রথম দুটো সীনে—'

কথাটা শেষ না করে গদগদ চোখে শান্তিবাবু তাকিয়ে রইলেন বুলবুলির দিকে। অকপট একটা গ্রাম্য ভঙ্গি ফুটিয়ে। কিন্তু আমার মনে হল শ্রীমতী যেন হঠাৎ নড়ে বসল, তার চোখের অ্যাপারচার ছোট হয়ে কিছু বিদ্ধ করবে চেষ্টা করল এমন মনে হল। মুহূর্ত কয়েকের অস্বস্তি ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে কেমন শিথিল গলায় সে কথা বলল, 'বিশেষ করে প্রথম দুটো সীনে—'

কথাটা যেন প্রশ্নও নয়, বিস্ময়ও নয়, বুঝি শান্তিবাবুর উচ্চারিত কথাটিরই ঈষৎ স্খলিত পুনরুক্তি। শান্তিবাবুও সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত গলায় মাফ চাইলেন, 'অবশ্যি, বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি—আপনার পুরো অভিনয় দেখার সৌভাগ্য কাল হয় নি—আমার হঠাৎ শরীরটা অসুস্থ হওয়ায়—বোঝেনই তো বয়স হয়েছে—ইস, ওকি, আপনার হাতে কি হল?'

বুলবুলি চমকে নিজের হাতের স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো আঙুলটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, 'ও কিছু না, কাল আঙুলটা একটু কেটে গিয়েছিল—'

শান্তিবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'না, না, আমি—' তারপর হাত বাড়িয়ে বুলবুলির বাঁ হাতের কাছটায় একটা আঙুল ছুঁইয়ে আমাদের দুজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আমি এই ফোলাটার কথা, আসলে—' হাসলেন একটু সরল বোকা-বোকা গলায়ঃ

'আঙুলের স্টিকিংটা আমি লক্ষ্যই করি নি, এমন ভাবে লাগিয়েছেন আমি ভেবেছিলাম শাঁখের আংটি হবে।

বুলবুলির মুখে দু'তিন রকমের রঙ বদল হল, ভেতরে ভেতরে সে কেমন একটা অস্বস্তিতে ভুগছে বুঝতে পারা গেল।

সে ফ্যাকাশে হেসে বলল, ওঃ, এটা ইঞ্জেশানের দাগ, একটু আগে—'

শান্তিবাবু বেজায় ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন, 'আপনার শরীর খারাপ? অসুস্থ? ইস, আমরা তাহলে···নিশ্চয় ডাক্তারবাড়ি বেরোচ্ছিলেন, এঃ, আসুন বরুণবাবুমশাই, ভদ্রমহিলাকে—

ব্যস্তবাগীশের মত উঠতে গিয়ে চায়ের কাপ-ডিশ সেন্টার টেবিলের ওপর উল্টে পড়তে পড়তে যদি বা বেঁচে গেল, কিন্তু টেবিলের কিনারে রাখা শান্তিবাবুর সোনার সিগারেট কেস আর রুমালটা ধাক্কা লেগে বুলবুলি সেনের পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। বুলবুলি নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে আবার যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, 'আঃ, আপনি বড্ড বেশি ব্যস্ত হন, বসুন, ও কিছু না। আমার শরীর ভালই আছে—সামান্য একটা ইঞ্জেকশান, আমি নিজেই নিয়েছি একটু আগে—আপনারা ব্যস্ত হবেন না।'

'ইঞ্জেকশান আপনি নিজে হাতে নিয়েছেন!' হাঁ করে বিশ্বের অষ্টম বিস্ময় দেখছেন এমন মুখভাব করে বললেন, 'আপনি শুধু একজন ব্রাইট স্টারই নন, বিদুষী মহিলাও, চিকিৎসা শাস্ত্রেও আপনার ব্যুৎপত্তি—সত্যি, যত দেখছি আপনাকে—' হাতজোড় করে গুণমুগ্ধ ভক্তের মত এই প্রায়-বৃদ্ধ ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। 'আপনার সত্যিকারের অ্যাপ্রিসিয়েশান এখনো হয় নি—মিস সেন, আপনি স্টেজ থেকে বেরিয়ে আসুন—ফিল্মে জয়েন করুন, আপনার মত প্রতিভা—'

বুলবুলি স্বচ্ছন্দ হাসল এতক্ষণে, 'অত প্রশংসা আমাদের পাওনা নেই কিন্তু···তাছাড়া আপনার মত প্রবীণ লোকের মুখ থেকে

শুনলে লজ্জাই পাই—তাছাড়া প্রতিভা-টতিভা কিছু নয়—পেটের দায়ে একসময় নার্সিং শিখেছিলাম—ইঞ্জেকশান দিয়েই হাতেখড়ি হয়েছিল—'

একটু পরে হরীতকী বাগান লেনের সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শান্তিবাবু আবার মশার মত সরু গলায় বললেন, 'ছুঁচ দিয়ে শুরু, ফাল দিয়ে শেষ। হাতেখড়ি দিয়ে শুরু হয়েছিল, হাতেকড়ি পরিয়ে তোমায় বরণ করে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হবে—বিলম্ব বেশি নেই।'

আমি নিজের কানকে যেন বিশ্বাসই করতে পারলাম না।

গল্পটা শেষ করার দায়িত্ব লেখক হিসেবে আমার, তাই ওই হরীতকী বাগানের এপিসোডের পরেও আরও কয়েক ছত্র যোগ করতেই হল।

বুলবুলি সেনের আসল নাম বন্দনা সেন। বছরখানেক আগে, তখনো সে নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্টাফ নার্স, এসেছিল কুশারীর নার্সিং হোমে রোগিণী হিসেবে। এই নার্সিং হোমের একটা গোপন সুনাম ছিল। তাই বন্দনা অ্যাবর্সন করাতে ওইখানেই এসেছিল। কিন্তু কুশারীর হাত থেকে ফিরে যেতে আর পারে নি। চেহারায় বেঁটেখাটো রোগাপটকা মানুষ হলে কি হবে, ডাক্তার স্বভাবে ছিলেন বঁড়শির মতই, মজবুত রকমে বাঁকা এবং তীক্ষ্ণ। ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হতে হল তাকে। সেই থেকে ফিজিক্যাল এক্সপ্লয়টেশান, এবং নিয়মিত যাতায়াত। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়েছিল বন্দনা, নাম পাল্টিয়ে বুলবুলি হয়েছিল, এবং পেশাদারী মঞ্চে নেমে নামও করেছিল।

দিন চলছিল এইভাবে, কিন্তু মনে সুখ ছিল না বুলবুলির। অপমানের জ্বালা এবং ঘৃণা জিঘাংসার বাষ্পে রূপ নিত মনের মধ্যে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে দানা বাঁধতো না। এমন সময় হঠাৎ বারো ইয়ারী দলের সঙ্গে তার কনট্রাক্ট হয় এবং সুদর্শন শিল্পী তরুণ কুশারীর

সঙ্গে প্রণয়ের পর্ব শুরু হয়ে যায়। গোল বাধলো এইখান থেকেই। বুলবুলির সঙ্গে গুপ্তপ্রণয় কথা জানতে পেরে গেলেন ডাক্তার, রীতিমত শাসিয়ে দিলেন এবং অবিলম্বে বারো ইয়ারীর কনট্রাক্ট নাকচ করতে নির্দেশ দিলেন।

ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল বুলবুলি। জীবনে অনেক ঠেকে ঠকে ঘা খেয়ে শক্ত হয়ে ওঠা মেয়ে সে। বুঝেছিল ডাক্তার বেঁচে থাকতে তার আর নিস্তার নেই। অথচ মনেপ্রাণে সে তখন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছিল, এবং সে স্বপ্ন ডাক্তারের ভাইপোকে নিয়েই। এই রকম মানসিক অবস্থায় সেদিন সিঁথির ফ্ল্যাটে এসেছিল সে, অবশ্য তখনো হত্যার কোন পরিকল্পনা তার মাথায় ছিল না। মাথায় এল, ডাক্তারের সন্ত পাওয়া চিঠিখানা দেখে। সেই চিঠিতে হত্যার ভয় দেখানো হয়েছিল এবং ডাক্তার রীতিমত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বুলবুলির পরামর্শও চেয়েছিলেন। সিগারেট টানতে টানতে বুলবুলি চিন্তা করছিল, তবে সে চিন্তা ডাক্তারের বাঁচার উপায় খুঁজতে নয়! মৃত্যুটাকে কিভাবে বারোয়ারী রূপ দেওয়া যায় তারই দ্রুত খসড়া তৈরি করছিল সে মনে মনে।

তারপর বুলবুলির পরামর্শ মত লালবাজারে টেলিফোন করার পর যখন বরানগর থানার নম্বর ডায়াল করতে পিছু ফিরে ঝুঁকে-ছিলেন ডাক্তার কুশারী, ঠিক তখনই স্টিলের ডাণ্ডার প্রচণ্ড আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলে বুলবুলি। মাত্র তেতাল্লিশ কেজি ওজনের দেহটাকে ফ্ল্যাটের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে বুলবুলির মত বলিষ্ঠদেহ মেয়ের খুব অসুবিধে হয় নি। পরবর্তী কার্যক্রম আপনারা আগেই শুনেছেন। শুধু ক্লু সম্বন্ধে একটু বলা দরকার।

শান্তিবাবু প্রথম ক্লু পেয়েছিলেন ডাক্তারের বুক পকেটে। আলিঙ্গন কালে খসে পড়া কপালের টিপ। দ্বিতীয় ক্লু শাঁখের আংটি কোন পুরুষের আঙুলের নয় বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তৃতীয় সঙ্কেত লিপস্টিক আঁকা সিগারেট-টুকরো। চতুর্থ পাওয়া

বুলবুলির অ্যালিবির বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক সূত্র। হত্যাকালে তিনি স্টেজে অভিনয় চালাচ্ছিলেন একথা সত্যি নয়, এক্সট্রা অভিনেত্রী সে সময় প্রক্সি দিচ্ছিল। থার্ড অ্যাক্টে অবশ্য বুলবুলি স্টেজে নেমেছিল। মেয়েরা সত্যিই বড় অ্যাকট্রেস। কোল্ড ব্লাডের ক্রীচার তারা, স্বভাবতই নার্ভ শক্ত হয়। ডাক্তারের হত্যার কথা ভাইপোকে পর্যন্ত সে ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় নি। কিন্তু শান্তিবাবুর নাতনী দৈবক্রমে সে-রাতে ওই থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। মজা করে সে নায়িকা বদলের গোঁজামিলের কাহিনী বলছিল, শান্তিবাবু শুনতে পেয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করেন। থিয়েটার হল থেকে ফটোগ্রাফ নিয়ে তিনি নার্সিং হোমের কেরানীর কাছে খোঁজ করেন। ফলে নীলরতনের চাকরির ইতিহাস ইস্তক বেরিয়ে পড়ে।

অনুমানগুলোকে জুড়ে একটা সম্পূর্ণ কেসহিস্ট্রী তখন স্বভাবতই তৈরি হয়ে যায়। আমার গল্প এবং নটেগাছও এইখানেই খতম।

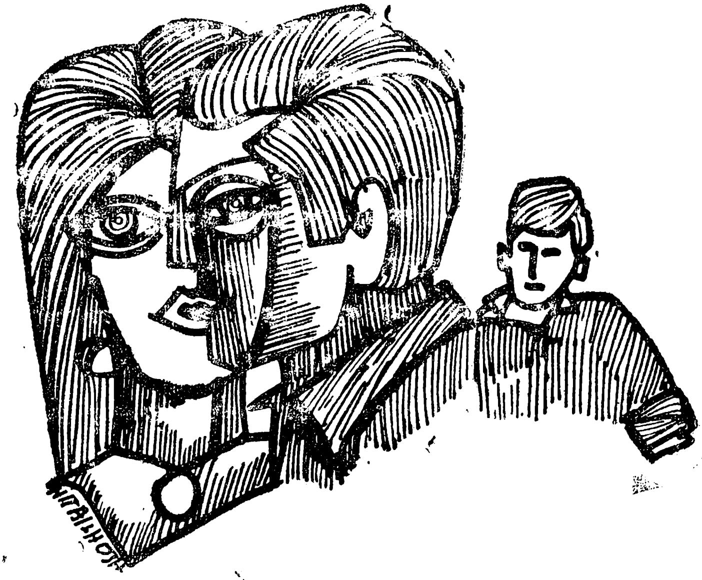

দ্বিচারিণী

অমল রায়

কুমার ঘরে প্রবেশ করল।

ফায়ারপ্লেসের সামনে চেয়ারে বসে উল বুনছে দীপা, সে স্বামীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একঝলক নীরব হাসি ছড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

অস্ফুট শব্দ করে কুমার বলল, বাইরে কি ঠাণ্ডা, হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

দীপা বলল, আগুনের কাছে এসে বসো, ভাল লাগবে।

ফায়ারপ্লেসে গনগন করছে আগুন। ড্রয়িংরুমটা বেশ গরম হয়ে আছে।

তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।—একটু পরে দীপা বলল।

কুমার চেয়ারে হেলান দিয়ে ম্লান হাসল। বলল, সত্যিই বড় ক্লান্ত আমি।

সময়টা জানুয়ারি মাস। দার্জিলিং শহরে এ সময়ে যেমন শীত পড়ে, এবারেও তেমনি পড়েছে। তবু মনে হচ্ছে এবার যেন প্রকোপ একটু বেশি। শীত মানুষকে এবার বেশি কাঁপাচ্ছে। এই হাড়-কাঁপানো শীতের মাঝে কাজ মিটিয়ে কুমার বাইরে থেকে ফিরল।

কুমারকে সুদর্শন বলা চলে। স্বাস্থ্যবান। প্রায় ছ' ফুটের মত লম্বা। দার্জিলিং শহরের সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। হাতযশ এবং সুনাম—দুটোই আছে।

ওভারকোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল কুমার। তারপর ফায়ারপ্লেসের কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে হাত-পা গরম করতে করতে বলল, মিস্টার সোনিয়া এখনো আসেন নি তাহলে?

না।—দীপা হেসে বলল, দেখো হয়তো ভুলে বসে আছেন। যা ভুলো মন!

না, ভুলবেন না।—কুমার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করতে করতে বলল, পাঁচটা নাগাদ মিস্টার সোনিয়ার বাংলোয় আমি গিয়েছিলাম।

দেখা হলো?

হলো। এক কাপ চাও খেলাম। দেখলাম মিস্টার সোনিয়া সুটকেশ গোছাচ্ছেন, কোথায় যেন যাবেন বলছিলেন।

কোথায়?

কুমার চোখ রাখল দীপার চোখে। আলতো করে ঘাড় নেড়ে বলল, জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বললেন না।

দীপা ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, ঠিকই আসবেন, কি বল?

আই থিঙ্ক সো। আসা তো উচিত।

দীপা কিছু বলল না। সে উল বোনায় মন দিল।

সিগারেট ধরালো কুমার। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সামান্য সময় দীপার উল বোনা দেখল। হাই তুলল।

রাত আটটা নাগাদ জগৎ সোনিয়ার আসবার কথা। আজ কুমার আর দীপার বিবাহ-বার্ষিকী। বিয়েটা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল।

দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারার মানুষ জগৎ সোনিয়া বয়সে কুমারের সমানই হবে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। চোখে সব সময় নীল চশমা পরে থাকে। দিলদরিয়া আর সদাহাস্যময় পুরুষ। এক মিনিটের আলাপে পরকে কিভাবে আপন করে নিতে হয় তা জগৎ ভাল করেই জানে।

দার্জিলিং শহরের চৌরাস্তায় একটা বড় ওষুধের দোকান আছে জগতের। সোনিয়া মেডিক্যাল স্টোর্স, অনেকের নজরে পড়েছে হয়তো। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রায় জনাদশেক কর্মচারি খাটে। মাঝে মাঝে জগৎ নিজেও কাউন্টারে বসে। ধনী মানুষ জগৎ সোনিয়া এত সাধারণ জীবন যাপন করে যে ভাবলে অবাক লাগে। কোনদিন তার স্বভাবে উন্নাসিকতা কেউ দেখে নি।

জগতের সঙ্গে কুমার আর দীপার প্রথম আলাপ হয়েছিল একটা পার্টিতে। কে যে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আজ আর মনে নেই। সেই আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। জগৎ মাঝে মাঝে আসে কুমার আর দীপার কাছে, কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা-হৈচৈ করে আবার চলে যায়। কুমারের মনে হয়, জগৎ একটা রহস্যময় মানুষ। বিচিত্র স্বভাবের। বড় নিঃসঙ্গ। অথচ বিয়ে করে সংসার পাততে চায় না। এই পাহাড়ী শহরে বসবাস করতে করতে পাঞ্জাবী ছেলে জগৎ বাঙালী বনে গেছে।

একদিন কুমার বলেছিল, এবার একটা বিয়ে করুন মিস্টার সোনিয়া।

জগৎ হেসে বলেছিল, আমার মত সাধারণ মানুষকে কোন মেয়ে বিয়ে করবে বলুন ?

যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি।—কুমার বলেছিল, মেয়ের কি অভাব ?

বউ কিন্তু মিসেস মজুমদারের মত সুন্দরী হওয়া চাই।

বেশ তো, তাই হবে।

মিটিমিটি হেসেছিল জগৎ, কোন কথা বলে নি।

হাসছেন যে ?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল জগৎ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না ডাক্তার মজুমদার, আমি বিয়ে করব না, এ জন্মটা এভাবেই কেটে যাক।

নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ?

আছে বৈকি।

কারণটা জানতে পারি কি ?

আজ থাক, আর একদিন শুনবেন।

সেদিন মনে হয়েছিল জগতের বুকে জমাট বেঁধে আছে এমন এক দুঃখ যার পাষাণভার সে সরিয়েও ফেলতে পারছে না, ভুলতেও পারছে না। জগৎ হৈচৈ করে নিজের অতীত ভুলে থাকে মাত্র। দীপাকে নিজের সন্দেহের কথা বলেছিল কুমার। কোন ব্যর্থপ্রেম কি পুড়িয়ে মারছে জগতের হৃদয় ? সে বলেছিল, আমার ধারণা, জগতের জীবনে ব্যর্থপ্রেম জনিত কোন দুর্ঘটনা লুকিয়ে আছে।

দীপা সবিস্ময়ে বলেছিল, তোমার এ ধারণা হলো কি করে ?

জগতের কণ্ঠে হতাশার সুর শুনে।—কুমার বলল, হয়তো কোন পাঞ্জাবী ললনা এর জন্যে দায়ী।

জগৎ নিজেও তো দায়ী হতে পারে ?

মনে হয় না। ওঁর মত অমন সাদাসিধে মানুষ—

দীপা হেসেছিল। কি এক দুঃখবোধ ছিল সেই হাসিতে। হয়তো

সেই অদেখা আর অজানা নারীর জন্যে দুঃখিত হতে চেয়েছিল, হোক না সেই নারী অপরিচিতা। কিন্তু পুরুষ হয়ে পুরুষের দুঃখ বুঝতে চেয়েছিল কুমার। সেদিন সন্ধ্যার অবসর তারা অতিবাহিত করেছিল জগতের মত একজন রহস্যময় চরিত্রের অজানা অতীতের সম্ভাব্যতা নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে। জগৎ সোনিয়া তাদের কাছে রহস্য ঘেরা পুরুষই রয়ে গেছে।

আজ দীপা-কুমারের বিবাহ-বার্ষিকী। এর আগের তিনটি বার্ষিকী তারা বেশ ধুমধামের সঙ্গে পালন করেছিল, কিন্তু এবারের অনুষ্ঠান তারা অতি সাধারণভাবে পালন করবে ঠিক করেছে। মাত্র দুটি মানুষকে তারা নিমন্ত্রণ করেছে। একজন সোনিয়া আর দ্বিতীয়জন বেসরকারী গোয়েন্দা সুনন্দ রায়। সুনন্দ কুমারের কলেজ-জীবনের বন্ধু। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে আবার দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছে এই শৈল শহরে।

দীপা সুন্দরী এবং লাবণ্যময়ী। দেহের গঠন সুন্দর। প্রথম দর্শনে তাকে অবাঙালী বলেই ভ্রম হয়। জন্ম থেকে দিল্লীতে বসবাসের জন্যেই বোধ হয় অবাঙালী ছাপ পড়েছে চেহারায়। কথাবার্তা, লেখাপড়া, পার্টি, গান-বাজনা, চাল-চলন কোন দিক থেকেই তার এতটুকু খুঁত নেই। দার্জিলিং শহরের প্রাণস্পন্দন বললেও দীপা সম্পর্কে অত্যুক্তি করা হবে না। এক কথায় সে একজন কালচার্ড মহিলা। স্ত্রী হিসেবে একেবারে আদর্শ। সবাই না হলেও অনেকে তাদের দাম্পত্য প্রেমে রোমাঞ্চিত হয়; কেউ বা তাদের কপোত-কপোতীর সঙ্গে তুলনা করে।

ফায়ারপ্লেসের আগুন কমে এসেছে। দীপা নিজের কোল থেকে উল-কাঁটা সরিয়ে রেখে আগুনে কিছু কাঠ ফেলে দিল, ভাল করে খুঁচিয়ে দিল যাতে আগুন আবার ধরে উঠতে পারে।

এবার এ শহরে ঠাণ্ডা একটু বেশিই পড়েছে। হাত-পা জমে

আসতে চাইছে। বরফ সাধারণত দার্জিলিং শহরে পড়ে না, কিন্তু এবারের আবহাওয়ার রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে পড়লেও পড়তে পারে। এখনো অনেকগুলো দিন কাটাতে হবে শীতের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে। দেওয়াল-ঘড়িতে রাত সাতটা বাজার সময় সঙ্কেত হল।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার রায় কখন আসবেন ?

কুমার মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর সে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। দেরি হওয়ার তো কথা নয়।

ওঁর হাতে এখন কোন কেস নেই তো ?

না, সুনন্দ এখন বেকার। বলছিল দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাবে।

শীতের হাত থেকে রেহাই পেতে ?

তাছাড়া আর কী। সুবিধে থাকলে, আর কোন বাইণ্ডিং না থাকলে শীতের মধ্যে কে এখানে থাকতে চায়।

দীপা বিড়বিড় বলল, ওঁরা এসে পড়লে ভাল হত। কেমন যেন একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সারাদিন বাড়িতে বসে আছি তো।

খুব বোর ফিল করছো তাহলে ?—কুমার মৃদু হাসলো।

খুব।

বেশ, যতক্ষণ না এসে পড়ছে, আমি তোমায় একটা গল্প শোনাই।

গল্প ?

হ্যাঁ, গল্প। ইউ উইল গেট মাচ ইন্টারেস্টেড।

কাহিনীটা কি ধরনের বলবে ?

একটা প্রেম-কাহিনী।

কষ্ট-কল্পিত প্রেম-কাহিনী শোনাবে ?

কতকটা তাই। একজন দ্বিচারিণী নারীর পরিণতির কথা।

গল্পটা কি দুঃখের ?

বলা বাহুল্য।

তাহলে নাহয় থাক।—দীপা উল-বলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আমাদের এই শুভ দিনে কোন দুঃখের কাহিনী নাই বা শোনালে।

কুমার হাসল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বনানীর জীবনেও দিনটা এমনি শুভ ছিল, দীপা, শুধু ঝড়ের মত কি যেন ঘটে গেল।

দীপা জিজ্ঞেস করল, বনানী কে ?

আমার গল্পের নায়িকা।

বেশ, এবার বল কি ঘটে গেল ?

পরে বলছি।—কুমার বলল, আগে তোমায় বলে নিই বনানী কে, কে সুবীর আর অলোকই বা কে। সুবীরের স্ত্রীর নাম বনানী, আর অলোক হলো বনানীর প্রেমিক। এই তিনজনকে কেন্দ্র করে প্রেমের ত্রিকোণ ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। এই অলোকের আর একটা পরিচয় আছে, সে সুবীরের বাল্যবন্ধু। কাহিনী ছোট, কিন্তু পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর।

দীপা উল বোনা থামিয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার সে মুখ নামিয়ে বলল, বলো শুনি। ওঁরা এসে পড়বার আগে শেষ করতে হবে কিন্তু।

কুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গলা থেকে টাইটা ঢিলে করতে করতে বলল, এক কাপ কফি হলে ভাল হত, দীপা। উর্মিকে বলে এসো না।

বেশ, বলে আসছি।—দীপা বলল, তুমি গুছিয়ে বসো।

উর্মির উদ্দেশে দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চুল্লীর আগুনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কুমারের মনে পড়ল, কল-ব্যাগটা সে সঙ্গে করে বাড়ি আনে নি, কোথাও ফেলে এসেছে। কিন্তু সঠিক ভাবে মনে পড়ল না কোথায় ফেলে এসেছে। তার চেম্বার

থেকে জগতের বাড়ি যাওয়ার পথে পেম্বা লামার বাড়ি গিয়েছিল। ভদ্রলোক হার্টের অসুখে ভুগছেন। তারপর সেখান থেকে জগতের বাড়ি হয়ে ম্যালে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কুমারের সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা করছিল, মাথার মধ্যে দপদপ করছিল। তাই এই ঠাণ্ডার মধ্যেও ম্যালে কিছুক্ষণের জন্যে বসেছিল। তবে কি কল-ব্যাগটা জগৎ সোনিয়ার বাড়ি কিম্বা ম্যালের বেঞ্চে ফেলে এল? কিছুই মনে পড়ছে না, মনে করতে পারছে না। এই মুহূর্তে নিজেকে আর একবার ক্লান্ত মনে হল। টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের দিকে একবার তাকাল, অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়ল। উঃ, আজ রাতে যেন কোন কল না আসে। মনে মনে কামনা করল কুমার। এই শরীর-মন নিয়ে আর দৌড়োদৌড়ি করতে পারবে না। আর একটা সিগারেট ধরাল সে। আয়নায় নিজেকে দেখে একটু অবাক হল। মাথার চুল অবিন্যস্ত হয়ে গেছে, চোখে-মুখে কি এক যন্ত্রণার ছাপ। সে অবিন্যস্ত চুল ঠিক করল আয়নার প্রতিবিম্ব দেখে, রুমালে মুখ মুছে নিজের চেহারাটা স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করল।

চুল্লীর সামনে চেয়ার সেমিসার্কেলে সাজিয়ে রেখেছে দীপা। মেণ্টালের ওপর তাদের যুগল ফটো রাখা। ফ্রেমে রক্তগোলাপের মালা পরানো হয়েছে। একপাশে ধূপদানীতে ধূপ পুড়ছে। পোড়া ধূপের গন্ধ ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রতি বৎসর এই দিনে দীপা এমনি করে ফটোটা রক্তগোলাপ দিয়ে সাজায়, ধূপ জ্বালায়। কুমারের ভাল লাগে, মনটা যেন ভরে যায়। কিন্তু আজ ভাল লাগছে না, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে রইল ফটোর দিকে। এই যুগল ফটো বিয়ের ঠিক পরেই তোলা হয়েছিল। আজও প্রথম দিনের মতই উজ্জ্বল আর সুন্দর রয়েছে।

দীপা ফিরে এল। কুমারকে এক মুহূর্ত দেখল। পাশে এসে বলল, অত নিবিষ্ট মনে কি দেখছ?

অ্যাঁ!—কুমার চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দীপাকে দেখল।

কি অত ভাবছ ফটোর দিকে তাকিয়ে ?

আমাদের গ্রুপ ফটোটা দেখছি।

নতুন দেখছ নাকি ?—দীপা হাসল।

না, তা নয়।—কুমার থেমে থেমে বলল, আমার পাশে তোমাকে খুব অচেনা লাগছে।

তার মানে ?

পাঁচ বছর আগের তুমি আর পাঁচ বছর পরের তুমি কি এক ? আমার পাশে তুমি কত অপরিচিত।

কি যে অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছো।—দীপার কণ্ঠে বিরক্তি, তোমার কি হয়েছে বল তো ?

কুমার হাসবার চেষ্টা করে বলল, তুমিই বল না, আমার কি হয়েছে, কি হতে পারে ?

জানি না বাপু, মাঝে মাঝে তুমি এমন হেঁয়ালি কর।

কুমার নিঃশব্দে হাসল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব আর একবার দেখল।

উর্মি ঘরে এল। দু' হাতে ধরা ট্রেতে দু' কাপ ধুমায়িত কফি।

পাহাড়ী যুবতী সে। বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। পাহাড়ী সৌন্দর্য তার ভুটিয়া দেহের কানায় কানায়। এখন তার পরনে একটা ছাপা শাড়ি আর লাল উলের ফুলহাতা সোয়েটার।

দীপা বলল, টেরিলের ওপর রাখো।

উর্মি ছোট টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

মাঝে মাঝে দীপার মনে হয় উর্মি বড় বেশি নির্লিপ্ত। এই বয়সে একজন যুবতী মেয়ের শরীরে যে চঞ্চলতা থাকা উচিত তা তার নেই। সে যেন বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে যেতে চায় না।

কুমার কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আঃ।

দীপাও কফিতে চুমুক দিল। বলল, বেডরুমের টেলিফোনে

মিস্টার রায়ের একটা কল এসেছিল।

কি বলল সুনন্দ?—কুমার জানতে চাইল।

বললেন একটা খুনের তদন্তে তাঁকে যেতে হচ্ছে, আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।

কি ঝামেলা! কে আবার খুন হল?

তা কিছু বললেন না।

খুনটা কোথায় হয়েছে বলল কিছু?

না।

জিজ্ঞাসা করো নি নিশ্চয়?

প্রয়োজন কি বল?

এই শীতের মধ্যে কে খুন করে আনন্দ পেলো—

আনন্দ পাওয়ার লোকের অভাব আছে নাকি এ শহরে?

কুমার কফিতে চুমুক দিল, কিছু বলল না।

দীপা পরিত্যক্ত চেয়ারে বসল। উল-কাঁটা তুলে নিল কোলের ওপর, দ্রুত হাত চালিয়ে বুনতে লাগল।

চোখ বুজে কুমার বুক ভরে হাওয়া গ্রহণ করল। চোখ দুটো জ্বালা করছে। সারা শরীরে কি এক অস্বস্তি।

দীপা বলল, গল্পটা বলবে না?

অ্যাঁ?

গল্পটা বল—

বলব।—কুমার বলল, তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি।

প্রশ্ন করো।

কারো দ্বিচারিণী স্ত্রী সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

দীপার উল বোনা থেমে গেল। স্বামীর দিকে তাকাল। তার চোখের পাতা যেন কাঁপল। সে বিড়বিড় করে বলল, আমার কোন বক্তব্য নেই।

মন্তব্য ?

তাও নেই। হেঁয়ালী না করে গল্পটা বল—বনানীর গল্প।

গল্পটা শুধু বনানীর নয়, ওদের তিনজনের। একটি নারীকে নিয়ে দুটি পুরুষের গল্প।

বনানীর প্রথম প্রেমিক অলোক। তাদের প্রথম পরিচয় হয় কলেজ-জীবনে। একই কলেজে একসঙ্গে পড়ত। লেখাপড়া শেষ হওয়ার আগেই তারা স্বপ্ন দেখত একটা ছোট সংসারের, যে সংসারে থাকবে শুধু বনানী, অলোক আর তাদের অনাগত অতিথি। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে তারা কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াল। বনানীর বাবা দুজনের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে ছিল অনেক গোঁড়ামি, সেসব কাটিয়ে তাঁর পক্ষে বিয়েতে রাজী হওয়াও সম্ভব ছিল না। অলোককে একদিন তিনি চরম অপমান করে বসলেন। কিন্তু অপমানিত অলোক এমন কিছু করে বসল না যাতে বনানীকে অসুবিধেয় পড়তে হয়। সে নীরবে অপমান সহ্য করে নিল।

বনানী প্রেমিককে বলল, চল, আমরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি অলোক।

অলোক অসম্মতি জানিয়ে বলল, না।

এ ছাড়া আমাদের মিলনের অন্য কোন পথ নেই।

এভাবে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে না বনানী।

তোমাকে পেলেই আমি সুখী হবো।

না।

আমাকে পর করে দেবে তুমি ?

এরপর অলোক কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেল। কেউ তার কোন পাত্তা করতে পারল না। শুধু গৃহত্যাগ নয়, দেশত্যাগীও হল অলোক। মাস ছয়েক পড়ে বনানীর বিয়ে হয়ে গেল সুবীরের সঙ্গে। সে স্বামীর ঘরে গেল। স্মৃতির যে পাতায় অলোকের

ছবি আঁকা ছিল, সেই পাতায় দিনের এবং রাতের ব্যস্ততার পলেস্তারা পড়তে পড়তে একদিন হারিয়ে গেল। বনানীর জীবনে অলোক মৃত মানুষে পরিণত হল। যাহোক, প্রথম ভালোবাসা হারাবার শোক ভুলে গিয়েছিল বনানী, স্বামীকে নিয়ে তিনটে বৎসর বেশ ভালই ছিল, কিন্তু একদিন রাহু তাকে গ্রাস করল।

বনানীর সঙ্গে অলোকের আবার দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। প্রাক্তন প্রেমিককে একই শহরে খুব কাছাকাছি দেখে শুধু বিস্মিত নয়, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল সে। অলোকের চেহারা অনেক বদলে গেছে, মুখের আদল গেছে পালটে। নিজের পদবী বদলে ফেলেছে আর পোশাকে দেখা দিয়েছে চাকচিক্য। তবু বনানীর এতটুকু কষ্ট হয় নি তার প্রথম জীবনের নায়ককে চিনতে।

তুমি!—বনানী অস্ফুট কণ্ঠে বলল।

বনানীকে দেখে অবাক হল না অলোক। সে শুধু বলল, খুব অবাক হচ্ছো মনে হচ্ছে?

এখানে কদ্দিন আছো?

বাড়ি থেকে পালাবার পর থেকেই।

বিয়ে করো নি?

না।

কার ওপর তোমার অভিমান?

নিজের ওপর বলতে পারো। অন্যের ওপর অভিমান করতে পারি এমন মানুষ আমার জীবনে নেই, বনানী।

বনানী মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কাঁদলো।

একসময় অলোক জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা তোমাকে সুখী করতে পেরেছেন, বনানী?

না।—বনানী মাথা নাড়ল।

কেন?

প্রথম প্রেম ব্যর্থ হলে কোন নারীই সুখী হয় না।

কিন্তু তোমাকে দেখে তো অসুখী মনে হচ্ছে না ?

মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ কি ওপর থেকে দেখা যায় ?

তার পর থেকে বনানী সর্বনাশা পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। যে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল তার জীবন থেকে, তাকে আর হারাতে চাইল না। অলোকের একখানা হাত চেপে ধরে সে বলল, কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাংলোয় এসো।

অলোক হেসে জিজ্ঞাসা করল, কেন, তোমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ?

না, সেজন্যে নয়।—বনানী বলল, আমার স্বামী কালকের রাতটা বাইরে কাটাবেন।

অর্থাৎ তুমি লুকোচুরি খেলতে চাইছো ?

ঠিক তা নয়।

তবে ঠিক কি ?

আমি যে তোমাকে আজও আগের মত ভালবাসি, সেই প্রমাণ দেবো

আমায় লোভ দেখাচ্ছো ?

না। তবে না এলে ভাববো তুমি কোন কালেই আমাকে ভালোবাসো নি।

যাব। বনানীর হাতটা আলতো করে চেপে ধরে অলোক বলল, নিশ্চয়ই যাব।

আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

বাড়ির অন্যান্য মানুষগুলো যদি জানতে পারে ?

পেলে পাবে।

কিন্তু বনানী, আমার জন্যে তোমার কোন ক্ষতি হোক আমি চাই না।

অনেক ভালো হয়েছে, আমার আর ভালো চাই না।

কুমারের মনে হল দীপা শুনছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারে

হেলান দিয়ে কেমন স্থির হয়ে আছে। উল-কাঁটা পড়ে আছে কোলের ওপর। চোখ দুটো বোজা।

তুমি কি শুনছো না দীপা?—কুমার জিজ্ঞাসা করল।

শুনছি তো!—দীপা নড়েচড়ে উঠে বলল, তুমি বল।

তোমার ঘুম পাচ্ছে কি?

না।

চুল্লীর আগুনের আভা পড়েছে দীপার সারা শরীরে। এখন আগুনের দিকেই তার চোখ স্থির। হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা।

অলোক কথা রেখেছিল। সেই রাতটা তারা একসঙ্গে কাটিয়েছিল। অনেকদিন পরে বনানী পেয়েছিল তার প্রথম ভালোবাসাকে। সারারাত তারা এক অজানা নেশার মধ্যে বুঁদ হয়ে ছিল। অলোকের আত্মা এক সংস্কার বর্জিত উল্লাসে মেতে উঠেছিল। তারপর একসময় রাত ফুরিয়ে ভোরের আলো আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলোর পেছন দিয়ে অলোক নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল।

সেইদিন থেকে একজন দ্বিচারিণী নারীর জন্ম হলো, আর সেই নারী বনানী মজুমদার। যে জীবনকে পেছনে ফেলে স্বামীর হাত ধরে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই জীবনটা আবার এসে দাঁড়াল তার সামনে। সমাজের কাছে, সংস্কারের কাছে এবং নিজের আত্মার কাছে বনানী অপরাধী হয়ে পড়ল।

অলোক এক নতুন নেশায় মেতে উঠল। সুবীরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে প্রায়ই আসত বনানীর কাছে। রাত কাটিয়ে কাক ডাকার আগেই চলে যেত। একটা বৎসর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চললো লুকোচুরি। কিন্তু বনানী জানতো না যে সত্য কখনো গোপন থাকে না। ছাই-চাপা আগুনের মত তার প্রকাশ একদিন ঘটবেই।

দীপা অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, বনানীর স্বামী জেনেছিল?

কুমার বলল, অলোক প্রথম ধরা পড়ল বনানীর আয়ার কাছে।

এইসময়ে উর্মি প্রবেশ করল। জানালো, ফোন এসেছে।

কুমার বিরক্ত হয়ে বলল, আবার কে ফোন করল ?

হয়তো মিস্টার সোনিয়া।—দীপা বলল।

কোন রোগীর বাড়ি থেকেও তো করতে পারে।

তা পারে।

কুমার ফোন ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপা তাকাল উর্মির দিকে। সহসা সে বিরক্ত বোধ করল। এই মেয়েটাকে দিয়ে আর কাজ চলবে না। ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য লোক রাখতে হবে। এমন বোকার মত ভাব করে তাকিয়ে থাকে যে মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়।

এমন বোকার মত তাকিয়ে আছো কেন ?—দীপার কণ্ঠ থেকে রাগ ঝরে পড়ল, কিছু বলতে চাও ?

ইতস্তত করে উর্মি বললে, আপনি অনুমতি দিলে—

নিশ্চয়ই নাইট শোতে সিনেমা যেতে চাও ?

হ্যাঁ।

দীপার ধারণা উর্মি নাইট শোতে সিনেমা কোনদিনই যায় না, সিনেমা যাওয়ার নাম করে কোন পুরুষের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে, তারপর গভীর রাতে বাড়ি ফেরে মনে ফুর্তি আর আমেজ নিয়ে। দীপা কোনদিন যা করে নি আজ তাই করল। সে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, এখানে থাকতে গেলে ভদ্রভাবে থাকতে হবে। তুমি কি মনে করো আমি কিছু বুঝি না ?

উর্মি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখের পাতা পড়ছে না। মুখ পাথরের মত নির্বিকার।

শোন উর্মি!—দীপা বলল, এভাবে এখানে চাকরি করা চলবে না।

এবারেও উর্মি চুপ করে রইল।

তোমার এই অস্থির ভাব আমার মোটেই পছন্দ নয়।

সহসা এক কাণ্ড করে বসল উর্মি। সে মুচকি হাসল, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

দীপার মনটা জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে উঠতে, কিন্তু চেঁচালো না। গুম হয়ে বসে রইল।

যত দিন যাচ্ছে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে উর্মি। দীপাকে গ্রাহ্য করে না। চোখে-মুখে সর্বদা অবজ্ঞার ভাব জড়িয়ে থাকে। এর জন্যে দায়ী কুমার। দীপা লক্ষ্য করেছে, কুমার আজকাল উর্মিকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কুমার ঘরে ফিরে আসতেই দীপা রাগে ফেটে পড়ল। সে চেঁচিয়ে বলল, শোন, উর্মিকে আমি রাখব না।

কেন, কি হল ?—কুমার জানতে চাইল।

ও আমাকে মানতেই চায় না।

কিন্তু মেয়েটি খুব বিশ্বাসী।

আমি ওকে বিশ্বাস করি না।

অবিশ্বাস করার মত কাজ করেছে কি ?

করেছে, একশোবার করেছে।—দীপা উচ্চ কণ্ঠে বলল, ওকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

বেশ, যা ভাল বুঝবে করবে, তবে কিছু করবার আগে একবার ভাল করে ভেবে দেখো।

রাগে ফুলতে লাগল দীপা। একজন আয়ার এত স্পর্ধা! সে রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, এর মধ্যে ভাববার কি আছে ?

কুমার উত্তেজিত হল না। সে ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মিস্টার সোনিয়া ফোন করছিলেন।

দীপা চমকে উঠে কুমারের মুখের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। নিজেকে সামান্য সামলে নিয়ে বলল, আসতে দেরি হবে বুঝি ?

কুমার মুখ থেকে একগাল ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে ফিক করে হেসে

বলল, হ্যাঁ।

তা হাসছো কেন?—দীপা কণ্ঠে উষ্মা নিয়ে বলল, উর্মি আমায় অপমান করলে তোমার মজা লাগে বুঝি?

আঃ, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না।

ব্যাপারটা সামান্য বলছ?

নিশ্চয়ই। উর্মিকে আমি বলে দেবো।—কুমার মুখে হাসি বজায় রেখে বলল, জগতের একটা কাণ্ড তোমাকে শোনাতে পারি।

দীপা চমকে উঠল। তার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, কি কাণ্ড?

জগত ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে।

দীপা চুপ করে রইল।

ধরম সিংয়ের মেয়ে শেলীকে তো চেনো, তাই না?

হ্যাঁ।

সেই শেলীকে বিয়ে করতে চলেছে জগৎ। আজ শেলীর বার্থ-ডে পার্টিতে তাদের এনগেজমেণ্টের কথা ঘোষণা করেছে।

আমি বিশ্বাস করি না।—দীপার কণ্ঠস্বর সামান্য তীক্ষ্ণ শোনাল।

কেন বিশ্বাস করতে পারছ না, দীপা?

বিশ্বাস করবার মত নয়, তাই।—দীপার হাতের কাঁটা ছুটো একটু দ্রুত চলতে লাগল, মিস্টার সোনিয়ার পাশে শেলীকে ভাবাই যায় না। বিয়ে করলেই তো হল না।

কুমার হাসল। জানুর ওপর জানু তুলে বসল। হাতের সিগারেট চুল্লীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, বাদ দাও মিস্টার সোনিয়ার কথা। ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না।

উল বোনা থামিয়ে দীপা কুমারের দিকে তাকাল। কুমারের হাসির প্রত্যুত্তরে সে কিন্তু হাসল না। সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, তুমি মাথা না ঘামালেও আমি ঘামাব।

কেন?

ও আমাদের ফ্যামিলি-ফ্রেণ্ড।

তাহলেও ব্যাপারটা ওর ব্যক্তিগত।

তুমি মেনে নিতে পারছো—বিশ্বাস করছো?

তা ঠিক, বিশ্বাস করবার মত নয়।—প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশে কুমার বলল, আমাদের গল্প কোথায় এসে থেমে গেছিল যেন?

দীপা বলল, বনানীর আয়া অলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করল।

আবিষ্কার করলেও চুপ করে ছিল সুবীর কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারল না। অলোক আর বনানীর গোপন চক্রান্তের কথাও জানতে পারল সে। দিন চারেক পরে সুবীর আর বনানীর বিবাহ-বার্ষিকীর দিন গভীর রাতে অলোক এসে দাঁড়াবে তাদের বাংলোর সামনে। বনানী একটা সুটকেসে যাবতীয় টাকা-পয়সা আর জুয়েলারী নিয়ে স্বামী আর সংসার পিছনে ফেলে চলে যাবে অলোকের কাছে। তারপর দুজনে মিলে—

কি—দুজনে মিলে কি?—দীপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

নতুন জীবনের সন্ধানে যাবে।—কুমার মুচকি হাসল।

সুবীর নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করল?

না করলে জানবে কি করে? যা জানবার আয়ার কাছেই জানতে পেরেছিল।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতো।

তা পারতো, কিন্তু বনানী যদি অস্বীকার করতো?

অস্বীকার নাও করতে পারতো।

করতো দীপা, করতো। নিজের পাপ স্বীকার করবার ক্ষমতা বনানীর ছিল না।

তারপর কি হল?

সেই রাতে অলোক কিন্তু বনানীকে নিতে এল না।

সেকি, কেন?

তুমি অনুমান কর, দীপা।

অলোক পিছিয়ে গেল বুঝি? অলোক কাপুরুষ—

না।

তবে?

অলোক আসবে কি করে, তাকে যে—

কি?

থাক, দীপা—

না, তুমি বল।

কুমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ছু' ঠোঁটের মাঝে গুঁজলো। তারপর আগুন ধরাতে ধরাতে আড়চোখে দীপাকে দেখল। দীপা অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন আর উল বুনছে না। চেয়ারের একটা হাতল শক্ত করে চেপে ধরে আছে। সুন্দর মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কড়িকাঠের দিকে তাকাল।

দীপা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চুপ করে আছো কেন—কথা বল।

আবার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কুমার বলল, কি আশ্চর্য, একটা গল্প শুনে তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়বে জানলে গল্পটা আমি বলতাম না।

আঃ, গল্পটা শেষ কর।—দীপা নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল।

দীপা, কুমার থেমে থেমে বলল, অলোকের পক্ষে আসা সম্ভব ছিল না, কারণ সে খুন হয়েছিল।

ছু'হাতে মুখ ঢেকে দীপা ককিয়ে উঠল। একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে। সে হাঁপাতে লাগল।

কুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনাবশ্যক ভাবে কার্পেটের ওপর পায়চারি করতে লাগল। সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, সেদিন সুবীর সন্ধ্যার দিকে অলোকের বাংলোয় গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। অনেক তর্কাতর্কি আর কথা-

কাটাকাটির পর হঠাৎ সুবীর আক্রমণ করল অলোককে।

দীপা চেঁচিয়ে উঠে বলল, সুবীর বুঝি খুন করল অলোককে ?

হ্যাঁ। এছাড়া অন্য কোন উপায় তার সামনে খোলা ছিল না।

চোখ বুজলো দীপা। ডুবন্ত মানুষের মত হাত তুলে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু হাতের কাছে পেল না। কোল থেকে উল-কাঁটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

কুমার পাথরের মত ভারী গলায় বলল, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো, দীপা ?

দীপার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপল, সে কোন কথা বলতে পারল না।

আদর্শবান পুরুষ অলোক প্রথম যৌবনে ভুল করেছিল বনানীকে নিয়ে পালিয়ে না গিয়ে। সে ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করতে চাইল না। সে ঠিক করে ফেলল বনানীকে নিয়ে গিয়ে নতুন করে জীবন গড়ে তুলবে। সন্ধ্যার দিকে সুবীর অনেক করে অলোককে বুঝিয়েও বোঝাতে পারে নি। মানুষটাকে যেন ভীমরতিতে পেয়েছিল। নিরুপায় সুবীরের মধ্যে ঘুমন্ত শয়তানটা যেন চোখ মেলে তাকিয়ে উঠে বসেছিল। সে দু' হাত বাড়িয়ে অলোকের কণ্ঠনালী চেপে ধরে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলেছিল। বারকয়েক ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল সে। খুন হল অলোক।

কুমার এসে দাঁড়াল দীপার পেছনে। সে স্ত্রীর নরম আর ফর্সা ঘাড়ে হাত রাখল। চুলে ঢাকা ঘাড়ের মধ্যে কুমারে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল নড়েচড়ে বেড়াতে লাগল। তারপর সেই আঙুলগুলো ধীরে ধীরে এসে পৌঁছলো দীপার কণ্ঠে। সে মৃদু চাপ দিল।

দীপা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, কি করছো তুমি ?

কুমার দাঁত বের করে হেসে বললে, বুঝতে পারছো না ?

অস্ফুট কণ্ঠে দীপা বলল, বিশ্বাস কর, আমার কোন দোষ নেই। জগৎ আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলল যে আমার সামনে আর

কোন উপায় রইল না—

পুরুষ মানুষ ঘিয়ের মত, আগুনে পড়লেই সে গলতে থাকে। জগতের দোষ কি বল ?

আঃ, গলা থেকে হাত সরাও, লাগছে—সরাও হাত—

কুমার হেসে উঠল। সে ফিসফিস করে বলল, জগতের অতৃপ্ত আত্মা যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে দীপা, তুমি যাবে না ?

না—না—!—দীপা চেয়ার ছেড়ে ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

কুমার বাঁ হাতখানাও দীপার গলায় রেখে চেপে ধরে তাকে উঠতে দিল না। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তা কি করে হয়। ইউ গুড গো—

না, না, আমায় ছাড়ো।

যেতে তোমাকে হবেই।—কুমার হিংস্র কণ্ঠে বলল, তোমার-আমার দাম্পত্য জীবন ঘিরে জগতের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াবে তা আমি হতে দেবো না।

দু'হাতে দীপার কণ্ঠনালী আঁকড়ে ধরল কুমার। কয়েক মুহূর্ত ভুলে গেল বুক ভরে হাওয়া নিতে, মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

দীপার চোখ দুটো ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল। দেহটা ছটফট করতে লাগল ছাড়া পাওয়ার আশায়। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে তার দেহ এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

পাহাড়ী শীতের মধ্যেও কুমারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। রুমালে ঘাম মুছলো, বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করে চেয়ারে বসল, একটা সিগারেট ধরাল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ক'টা বাজলো বুঝতে পারল না সে। ইচ্ছেও হল না চোখ তুলে দেওয়ালের দিকে তাকাতে বা কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে সময় দেখতে।

জগৎ সোনিয়া আর আসবে না এই বাংলোয়। নারীদেহের

লোভে লোকটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। রমণীর দেহের আকর্ষণ আর ভালোবাসা কি এক? না, মাথা নাড়ল কুমার, কখনোই নয়। এই সত্য কথাটা দীপা বুঝতে পারছিল না। দীপাকে সে সব দিয়েছিল, তবু কেন জগৎ সোনিয়ার ওপর তার এত আকর্ষণ? কি এমন গুণ দেখেছিল তার মধ্যে?

কুমার চোখ বুজলো, চোখ দুটো জ্বালা করছে, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। বড় যন্ত্রণা।

ঘরে প্রবেশ করল সুনন্দ, তার হাতে একটা ডাক্তারী কল-ব্যাগ।

এসো সুনন্দ, বসো।—কুমার অভ্যর্থনা জানাল।

সুনন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি বসতে আসি নি, কুমার।

জানি তুমি কেন এসেছ। তবু বলছি, তুমি বসো।

টেবিলের ওপর কল-ব্যাগটা রাখল সুনন্দ। বলল, মিস্টার সোনিয়ার ঘরে পাওয়া গেছে।

ভুলে ফেলে এসেছি।

তোমার কোটের বোতাম দুটোও সঙ্গে করে এনেছি।

সুনন্দর হাতে ধরা বোতাম দুটোর দিকে তাকাল কুমার, তারপর চোখ ফেরালো নিজের কোটের হাতায়। বাঁ হাতার দুটো বোতাম নেই। সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পেলে বোতাম দুটো?

মিস্টার সোনিয়ার ডান হাতের মুঠোয়।

বেচারা মরবার আগে এমন ভাবে খামচে ধরেছিল কোটের হাতাটা।—হাসবার চেষ্টা করে কুমার বলল, আসলে কণ্ঠনালী থেকে আমার হাত দুটো আলগা করতে চেয়েছিল।

কুমার!

বসো, সুনন্দ।—কুমার বলল, দীপা বেঁচে থাকলে সে-ই তোমায় অভ্যর্থনা জানাতো, বসতে বলতো—

নিস্পন্দ দীপার দিকে একবার তাকাল সুনন্দ, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কুমার, তুমি—

কুমার হাসল। কান্না-জড়ানো হাসি। বলল, হ্যাঁ, আমি ওকেও খুন করেছি।

আঃ, কুমার—!

আমি যে ওকে ভালবাসতাম সুনন্দ!

তোমার হাত কাঁপল না?

না।—কুমার নিজের চুল দু' হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

সুনন্দ তাকিয়ে আছে কুমারের দিকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে।

কুমারের চোখ দুটোও চকচক করছে। সে কান্না-জড়ানো কণ্ঠে বলল, দ্বিচারিণী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা যায় না, সুনন্দ। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সুনন্দ। রাত দশটা বাজে।

ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে এসেছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে উর্মি।

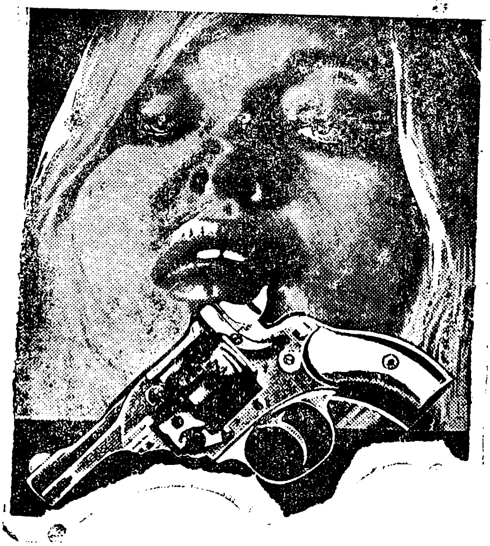

সাপের ছোবল

অমিত চট্টোপাধ্যায়

তখনও আলো ফোটে নি।

ভোরের বাতাস নাকি শীতল হয়। কিন্তু দত্তারামকে দেখে তা মনে হচ্ছিল না। কপাল বেয়ে অজস্র ঘাম তার নাকের ডগায়, ঠোঁটের ওপর এসে পড়ছিল—যেন ঢালু পথ বেয়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে।

তাড়া-খাওয়া খরগোসের মতই ছুটতে ছুটতে এসে সে নিজের বাসায় ঢুকল। দোতলায় তার ঘর। ভেতরে ঢুকে সে দরজায় খিল লাগাল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল রাস্তার দিকের জানলাটার পাশে।

না, পুলিশকে এখনও দেখা যাচ্ছে না।

তবু বিশ্বাস নেই। শিকারী কুকুরের মতই ওদের তীব্র ঘ্রাণশক্তি।

যদি রেখা থানায় খবর দিয়ে থাকে···

দেয় নি এতক্ষণ? নাইট ডিউটি সেরে বাসায় ফিরেই যখন রেবাকে ওই অবস্থায় ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখবে···

জানলা গোড়া থেকে ফিরে এল দত্তারাম। রেবার মৃতদেহের ছবিটাই ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। রোগা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটা গোড়া-কাটা লতার মতই কেমন যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে গেল।

বাঁ-দিকের ভুরুর ঠিক ওপরেই গুলিটা গভীর গর্ত করে দিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল ভলকে ভলকে রক্ত। আর্তনাদ করবারও অবসর পায় নি বেচারা।

না, দত্তারামেরও বরাত ভাল। ঠিক সেই সময়েই মাল-বোঝাই একখানা ভারী লরী রাস্তা কাঁপিয়ে যাচ্ছিল। নইলে গুলির শব্দটা আশপাশের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই শুনতে পেতো।

তাই বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। নিরাপদও নয় দত্তারাম। সে যে রেবার ঘরে ছিল, রেখাই তার সাক্ষী। তাছাড়া ও-ঘরে ঘণ্টা কয়েক কাটানোর অজস্র নজীর রেখেই এসেছে সে।

রেবাকে কিন্তু সে হত্যা করতে সত্যিই চায় নি। যদি সে দত্তারামের কাছ থেকে টাকাগুলো সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা না করত। নগদ বত্রিশ হাজার টাকা।

জামার ভেতর পকেটে হাত ভরে দত্তারাম নোটের বাণ্ডিলটা টেনে বার করল। একশো টাকার নোট। বহু কষ্টের উপার্জিত ধন। কিছু সে রেবাকে দিতেই গেছল। কিন্তু ভুল করল মেয়েটা বেশি দাবী করতে গিয়েই। সবটাই গ্রাস করতে চেয়েছিল। নইলে তাকে বিয়ে করতে হবে।

বিয়ে!

হেসে উঠল দত্তারাম। গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে।

চেহারাটা তার সত্যিই সুন্দর। যে কোন মেয়েই মুগ্ধ হতে পারে। রেখাও হয়তো হয়েছিল। কিন্তু…

সচেতন হয়ে উঠল দত্তারাম। চেহারা নিয়ে বিলাস করবার সময় নেই তার। সুন্দরকে করে তুলতে হবে কুৎসিত। তার জন্যে অনেক দিন ধরেই তো প্রস্তুতি করে রেখেছে সে।

ড্রয়ার থেকে ক্রেপ হেয়ার, কাঁচি আর আঠার শিশিটা টেনে বার করল সে।

আধ ঘণ্টা পরে নোংরা পাজামা আর জহর কোট পরা একজন লোক দত্তারামের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়া গোঁফ, গালে দাড়ি, কানের পাশে সুপুষ্ট জুলপি। অত্যধিক পরিশ্রমেই সে বোধ করি সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে।

ভোরের আলো তখন পুব আকাশকে ফিকে করে তুলেছে। শহরে জাগরণের সূচনা।

সামনের দরজা পরিহার করে লোকটা বাড়ির পেছন দিকের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

খিড়কীর দরজা খুলে সে অপরিসর গলিটায় এসে পড়ল। সেটাই পাক খেতে খেতে গিয়ে একেবারে দমদম স্টেশনের কাছে গিয়ে পড়েছে।

বাঁধ বেয়ে সে রেল লাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। দূরে স্টেশন। আলোগুলো তখনো নেভে নি। একটা এঞ্জিন ওপাশের লাইন দিয়ে চলে গেল ইয়ার্ডের দিকে। হয়তো কোন মালগাড়িকে টেনে নিয়ে যেতে হবে সুদূর গন্তব্যস্থানে।

তাকেও যেতে হবে সুদূরে—কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান না থাকলেও।

চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে, দত্তারাম কোমরে বাঁধা গেঁজেটা টিপে টিপে দেখে নিল। না, নোটগুলো ঠিকই আছে। রক্তাক্ত নোট। হোক, তবু অন্য নোটের মতই

বাজারে সচল।

স্টেশনটাকে এড়িয়ে গিয়ে সে রেল লাইন ধরে হাঁটতে লাগল। ভরসা হল না দমদম থেকে ট্রেনে চাপতে। পুলিশের নজর রাখা খুবই স্বাভাবিক।

বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর···

বেলা বাড়তে থাকে। রোদের তেজ প্রখর হতে প্রখরতর হয়। তবু হাঁটা বন্ধ করল না দত্তারাম।

তৃষ্ণায় গলাটা কাঠ হয়ে উঠল। নাড়িগুলো পাক দিতে লাগল ক্ষুধায়।

অগত্যা রেল লাইন ছেড়ে তাকে নেমে আসতে হল। সোদপুর স্টেশন পেছনে ফেলে উঠল এসে এক নোংরা খাবারের দোকানে। কোন বড় দোকানে যেতে তার সাহস হল না।

শুকনো কচুরি আর জিলিপি দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল। চা খেলো ভাঁড় তিনেক। উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করল অন্যান্য খরিদ্দারের কথাবার্তা। না, রেবার বীভৎস হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কেউই আলোচনা করছে না।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত হল দত্তারাম। আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল।

ধীরে ধীরে ক্লান্তি অপনোদন হল। আবার উঠে পড়ল সে। যতটা সম্ভব লোকালয় এড়িয়ে এক সময় এসে পড়ল গঙ্গার ধারে।

পাশেই কোন এক দেবতার মন্দির। জানবার এতটুকু আগ্রহ ছিল না দত্তারামের। অবহেলিত দেবতাও বোধ করি মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন।

থাকুন। জায়গাটা নিরিবিলি—এটাই তার সান্ত্বনা। একটা গাছের ছায়ায় হাতে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল।

গঙ্গার ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়ে আসছে, সেটা ঠিক শীতল নয়, তবু ঘুমে দত্তারামের চোখ ভোরে এল। কিন্তু ঘুমোতে সাহস হয় না।

সঙ্গে অনেকগুলো টাকা। ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারে, কিন্তু চোরের চোখে ধুলো দেবে কিসে ?

জোর করে নিজেকে টেনে তুলল দত্তারাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পারঘাটায় এসে হাজির হল।

খেয়া নৌকোখানা যাত্রী বোঝাই হয়ে ওপারে যাবার উদ্যোগ করছিল। ঘাটে পয়সা দিয়ে দত্তারাম তাড়াতাড়ি গিয়ে চেপে বসল।

কেউ কেউ একটু সরে বসল। কেউ কেউ তাকালও তার দিকে। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহের কুটিলতা না দেখে অনেকখানি আরাম বোধ করল সে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'মিলে কাজ করো নাকি কর্তা ?'

আরও নিশ্চিন্ত বোধ করল দত্তারাম। এরা তাহলে তাকে চিনতে পারে নি ছদ্মবেশী বলে। ঘাড় নেড়ে সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সিগরেট কোম্পানী! ন্যাশনাল টোব্যাকো...' তারপরই গুনগুন করে হাল্কা সুরের একখানা গান ধরে দিল সে।

রিষড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমগামী একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চেপে বসল সে। বসল বললে হয়তো ভুল বলা হবে। দাঁড়িয়ে রইল এককোণে।

গরমে প্রাণটা হাঁসফাঁস করতে লাগল। পা দুটো হয়ে উঠল আড়ষ্ট। যদি কোথাও এতটুকু বসবার জায়গা পেতো...

উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে সামনের বেঞ্চে বসা একদল অল্পবয়সী যাত্রীর আলোচনা কানে যেতেই, 'দিনকাল যা পড়েছে, বৌকে রেখে আপিসে যাওয়াই মুস্কিল। এসে দেখব হয়তো গুলি খেয়ে অক্কা পেয়েছে।'

'আমি তো ম্যানেজারকে স্রেফ বলে দিয়েছি নাইট ডিউটির মধ্যে আমি নেই, তাতে চাকরি থাক আর যাক।'

'উত্তরপাড়া আর সে উত্তরপাড়া নেই, দাদা। চারদিকে যেরকম

কল-কারখানা হচ্ছে আর বাইরে থেকে লোক আসছে…'

দত্তারাম যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচল। ওরা তাহলে রেবার খুন নিয়ে আলোচনা করছে না। উত্তরপাড়ার কে এক নারী হত হয়েছে, তার জন্যে দত্তারামের এতটুকুও মাথাব্যথা নেই।

বর্ধমান পার হয়ে গেল…পানাগড়…অণ্ডাল…

টিকিট দত্তারামের শেষ স্টেশনের। কিন্তু সে জানে মাঝপথে যে কোন স্টেশনে নেমে পড়তে পারে। তার আগে শুধু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে নিতে হবে কোথায় গেলে নিরাপদে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

আসানসোলে এসে একটু বসবার জায়গা পেলো দত্তারাম। তখন বেশ রাত হয়েছে। নতুন করেই যেন ক্ষুধায় পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।

পুরি-মেঠাইওলাকে ডেকে সামান্য কিছু কিনে নিল সে। তবে প্রবৃত্তি হয় না মুখে দিতে। কোমরে হাজার হাজার টাকা। ইচ্ছা হল তার থেকেই কিছু ভেঙে রেস্তোরাঁয় গিয়ে পেট পুরে কিছু খেয়ে আসে। কিন্তু ভরসায় কুলোল না। তার পোশাক-আশাক সাজ-সজ্জার সঙ্গে সেটা নেহাৎ বেমানান হবে। সকলের নজর পড়বে তার ওপর।

অগত্যা লাল লাল পুরিগুলো কালো কালো মেঠাই সহযোগে সে চিবোতে লাগল। পানিপাঁড়েকে ডেকে আঁজলা পেতে জল খেলো।

তৃপ্তির শ্বাস একটা বেরিয়ে এল। বুঝল দত্তারাম ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণাটা কিছু কম পায় নি।

গাড়ি ছেড়ে দিল। চোখে আবার নেমে এল ঘুমের ভার।

অকস্মাৎ বহুকণ্ঠের কলরব, হাঁক ডাক শুনে ঘুমের চটকাটা ভেঙে গেল তার। ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমেছে। জোরাল আলোয় নামটা পড়ল দত্তারাম: ঝাঁঝা।

বহু বৎসর আগে একবারই এসেছিল সে এখানে। বিস্মরণের ধুলোয় স্মৃতির পাতা মলিন। তবু জায়গাটার কিছু কিছু আজও মনে আছে।

তাড়াতাড়ি কামরা থেকে নেমে পড়ল দত্তারাম। রেল সীমানার শেষে যে পাহাড়ী নদীটিকে বালির আস্তরণ বুকে নিয়ে পড়ে থাকতে দেখত, তার ওপারে কোথাও আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে।

স্টলটা পার হয়ে যাবার সময় তার নজরে পড়ল সদ্য-আসা খবরের কাগজগুলোর ওপর। 'মেল' গাড়ির পিঠে চেপেই হয়তো এসেছে ওগুলো।

একখানা বাংলা দৈনিক কিনে নিল দত্তারাম এবং সামনের পাতাটা মেলে ধরতেই ভীষণভাবে চমকে উঠল। দু' কলম জুড়ে বড় বড় হরফে লেখা :

পলাতক হত্যাকারী

দত্তারাম

তার নিচেই বহুদিন আগেকার তোলা ছবি একটা।

কে জানে হয়তো রেবার বা তার বাসার ঘর থেকে ফটোখানা হস্তগত করেছে।

খবর পড়ে দত্তারাম বুঝল তার অনুমানই ঠিক। রেখা নাইট ডিউটি সেরে এসে বান্ধবীর মৃতদেহ দেখতে পায় এবং পুলিশে খবর দেয়। তাদের ধারণা শহরের কোথাও হত্যাকারী আত্মগোপন করে আছে এবং আশা করছে অনতিবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

নিজের ছদ্মবেশ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হবার জন্যে দত্তারাম গিয়ে চায়ের স্টলটায় বসল। জনকয়েক অল্পবয়স্ক তরুণ চা খেতে খেতে হত্যাকাণ্ড নিয়েই উষ্ণকণ্ঠে আলোচনা করছিল।

হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে একজন মন্তব্য করল, 'ও আইন-আদালত, বিচার-টিচার বুঝি না লাল্টু। খুনেটাকে ধরতে পারলে আমেরিকানদের মতন একেবারে লিঞ্চ করা উচিত।'

লালটু ছবিখানার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ব্যাটা দত্তারামের আবার ডগলাসি কায়দায় গোঁফের বাহার দেখেছিস ? দেখলেই মনে হয় যে ব্যাটা আস্ত নারী-খাদক।

দত্তারামের হাতে-ধরা পেয়ালাটা কেঁপে উঠল। কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে বলবার চেষ্টা করল, খুনীটা শহরে তো নাও থাকতে পারে—'

লালটু ফিরে তাকাল তার দিকে। কাঁধ দুলিয়ে মন্তব্য করল, 'সেটা কি পুলিশেও না বোঝে রে, ওরা চলে ডাইনে তো বলে বাঁয়ে যাচ্ছি। কে জানে হয়তো জি-টি রোডের মোড়ে মোড়ে প্রত্যেক স্টেশনে এতক্ষণ সাদা পোশাকে লোক বসে গেছে।'

দত্তারামের গলার ভেতর একটা ডেলা যেন ঠেলে উঠে দম বন্ধ করে আনল। আর বসে থাকতে সাহস হল না তার। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্টেশন থেকে। নিজেকে সন্দেহাতীত প্রতিপন্ন করবার জন্যে চটুল সুরে গান ধরল—

সামকো তারা মেরা পিয়ারা...

নদী পার হয়ে উঁচু-নিচু পথটা ধরল সে। কোন্ সুদূর অতীতে এই পথ ধরেই মাঝে মাঝে বেড়াতে আসত সে। কাদের জমি গোলাপ ফুলের চাষ ছিল এদিকটায়। সেসব পার হয়ে এগিয়েই চলল। পথটা ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে এল শালবনের মাঝে। আবার একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী।

পায়ে জুতো ছিল বলেই হয়তো টের পেলো না বালি ক্রমে তাততে শুরু করেছে। খেয়ালও করল না কোন দিকে চলেছে সে। দূরে দূরে সাঁওতালদের দু-একটা গ্রাম। পাহাড়ী নদী...শালবন...

সে শালবন শেষ হলে ধূ ধূ প্রান্তর। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। অতঃপর সন্ধ্যার মুখে দত্তারাম আশ্রয় নিল এক দেহাতী লোকের কুঁড়েতে। সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে পেলো খানকয়েক রুটি আর ভেণ্ডির তরকারী একটা।

এমনি করে পুরো তিনটে দিন-রাত কাটিয়ে দিল দত্তারাম। যত ভেতরে যায়, ততই নিজেকে নিশ্চিন্ত বোধ করে সে। এ তল্লাটের লোক বাংলা দেশের কাগজ পড়ে না। ছবিও দেখে নি তার। রেবা নামের কে এক নার্স দত্তারামের পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়েছে—সে খবরও রাখে না।

তবু দূরে—সভ্য জগৎ থেকে আরো দূরে যেতে চায় সে।

ক্লান্ত পা দুটো বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে একটু আগেই। এবার একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার এবং সেটার খোঁজ করতে গিয়ে অতি অকস্মাৎ আবিষ্কার করল অতি নগণ্য একটা স্টেশনে এসে হাজির হয়েছে সে।

ছোট এক শাখা লাইন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল গয়া থেকে পাটনা গেছে। রাতের শেষ গাড়িটা আসতে আর বিলম্ব নেই।

তাড়াতাড়ি পাটনার একখানা টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মেরই এককোণে দাঁড়িয়ে রইল দত্তারাম। যাত্রীর সংখ্যা বিরল। একজন বিহারী পুলিশ টহল দিতে দিতে তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল হিন্দিতে, 'কোথায় যাবেন ?'

'পাটনা।'

'আসছেন কোথা থেকে ?'

এক মুহূর্ত ভাবতে হল দত্তারামকে। যে দেহাতী গাঁয়ে দুপুরের খাওয়াটা সেরেছে, সেইটেরই নাম করে দিল। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন ?'

জবাব দিল পুলিশটি, 'কিছুদিন ধরে গাড়িতে খুব চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। তাই কড়া নজর রাখবার হুকুম হয়েছে আমাদের ওপর।'

দত্তারামের বুকটা একবার কেঁপে উঠল। সেটা গোপন করতেই একটা সস্তা দামের সিগারেট পুলিশটির হাতে গুঁজে দিয়ে খোসগল্প জুড়ে দিল সে।

কিন্তু বিপদটা এল অতর্কিত ভাবে।

ট্রেন আসতে অপেক্ষাকৃত নির্জন একখানা কামরায় চেপে বসল সে। কোণের দিকে বেঞ্চের ওপর একজন যাত্রী শুয়েছিল। তারই ওপাশে গিয়ে বসল দত্তারাম।

ছেড়ে দিল ট্রেন। শেষ আলোকবিন্দুও মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। দুপাশে কি আছে, অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না দত্তারাম। শুধু লৌহবর্ত্মের ওপর চাকার আওয়াজ। জায়গাটা বোধ হয় ঢালু, তাই বড় বেশি দুলতে লাগল কামরাখানা।

দত্তারামের চোখ দুটো বুজে এল। অকস্মাৎ আলোর তীব্র রশ্মি একটা মুখের ওপর এসে পড়তেই ঘুমের চটকাটা ভেঙে গেল তার। চোখ মেলতেই দেখল জ্বলন্ত টর্চ হাতে সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার। চোখ দুটোয় তাঁর জান্তব উল্লাসের দৃষ্টি। চাপা গলায় গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'দত্তারাম—তুমি দত্তারাম। দাড়ি-গোঁফের ঝোড়া পরেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো নি তুমি।' কথার সঙ্গে সঙ্গে দত্তারামের জামার কলারটা চেপে ধরবার জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি।

মুহূর্তের জন্যে দত্তারাম যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরক্ষণে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটাই বড় হয়ে উঠল তার। পুলিশ অফিসারটির হাত তাকে স্পর্শ করার আগেই মেঝের ওপর সটান গড়িয়ে পড়ল সে এবং শুয়ে শুয়েই পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ঘোড়া টিপল।

আর্তনাদ করে উঠলেন পুলিশ অফিসারটি। নিজের পিস্তল বার করবার আর অবসর পেলেন না। ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে, মাতালের মত টলতে টলতে গিয়ে তিনি চেনটা টেনে দিলেন। অন্য দু-একজন যাত্রী যারা ছিল, তারা তখন শশকের মত মুখ লুকোতেই ব্যস্ত।

কমে এল গাড়ির গতি। এখনই থেমে পড়বে। কিন্তু তার আগেই দত্তারাম অপর দরজা খুলে চলন্ত অবস্থাতেই ঝাঁপ দিল।

থেমে গেল গাড়ি। অন্যান্য কামরা থেকে ছোটখাটো একটি পুলিশবাহিনী ছুটে চলে এল। তারপর শুরু হল হৈচৈ চিৎকার। বারকয়েক বন্দুকও গর্জন করে উঠল।

দত্তারাম তখন প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর বেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে। নাক দিয়ে তার রক্ত ঝরছে। হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু এসব দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই তার। বাঁচতে হবে। অসহায়ের মত পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে সে রাজী নয়।

দিনের আলো ফুটলে দত্তারাম দেখল এক বালুচর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু বালি আর বালি। হয়তো কোনকালে এক স্রোতস্বিনী বয়ে যেত এখান দিয়ে। এখন সেটা রূপান্তরিত হয়েছে মরুভূমিতে।

বেলা যত বাড়তে থাকে, দত্তারামের গলাটা ততই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বালিতে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ তার মুখে আগুন ধরায়। চোখ মেলে তাকাতে গেলে মনে হয় বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

তৃষ্ণা···তৃষ্ণা···তৃষ্ণা···

এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে দত্তারাম তখন কোমরে বাঁধা নোটের তাড়াটা যে কোন লোকের হাতে তুলে দিতেও প্রস্তুত। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে অনর্থক চাটবার চেষ্টা করতে করতে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'এ কিংডম ফর এ হর্স'···গোটা রাজ্যের বিনিময়ে যিনি একটা ঘোড়া চেয়েছিলেন, তাঁর অবস্থাটা হয়তো দত্তারামের মতই শোচনীয় হয়েছিল।

হাওয়া উঠল। তপ্ত বালিগুলো তীরের মতই এসে বিঁধতে লাগল গায়ে। চোখ খোলবার উপায় নেই।

অন্ধের মতই টলতে টলতে এগিয়ে চলল দত্তারাম। মাথার ওপর পাক খেতে খেতে একটা শকুন বারকয়েক ডেকে উঠল।

ভয়ে কেঁপে উঠল সে। শবভোজী পাখিটার মতলব বুঝতে তার বাকি থাকে না। অশক্ত দেহে যে মুহূর্তে সে বালির ওপর লুটিয়ে

পড়বে, সেই মুহূর্তে শূন্য থেকে নেমে আসবে শকুনটা। দীর্ঘ চঞ্চু দিয়ে তার দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাবে।

আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে দত্তারাম একবার চারদিকে ফিরে তাকাল যদি কোথাও লোকালয় দেখা যায়। কিন্তু না, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু বালির সমুদ্র। নিঃসঙ্গতা যে এমন ভয়াবহ সে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

দ্রুততর পা চালাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বালির স্তূপ খলখল করে হেসে যেন তার পা দুটো আরও টেনে ধরতে লাগল। সেটা বুঝেই শকুনটা আরও নিচে নেমে এসে তার মাথার ওপর পাক খেতে লাগল।

মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারাল দত্তারাম। চোখের সামনে দেখা দিতে লাগল মরুদ্যান। টলটলে জলেভরা সুবিপুল হ্রদ। ছায়া সুনিবিড় তালগাছের কুঞ্জবন। হাতছানি দিয়ে সেগুলো যেন তাকে ডাকতে লাগল।

পাগলের মতই দত্তারাম ছুটতে লাগল। তাকে বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। বালির সমুদ্র শেষে দেখা দিল বনরাজির শ্যামলিমা। আর ঠিক সেখানেই আবির্ভূত হল বাংলো ধরনের ছোটখাটো একটা বাড়ি।

মরীচিকা বলে প্রথমটা ভুল করল দত্তারাম। করাটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু ফটকের গোড়ায় হেলান দিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, সে প্রহেলিকা নয়। বরং বনদেবী বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়।

অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল দত্তারাম। হয়তো পড়েই যেত সে, কিন্তু তার আগেই ছুটে এসে ভারতী তাকে ধরে ফেলল। আগন্তুকের শোচনীয় অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল বলেই, গভীর মমতায় তাকে ধরে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে

থেমে গেল গাড়ি। অন্যান্য কামরা থেকে ছোটখাটো একটি পুলিশবাহিনী ছুটে চলে এল। তারপর শুরু হল হৈচৈ চিৎকার। বারকয়েক বন্দুকও গর্জন করে উঠল।

দত্তারাম তখন প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর বেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে। নাক দিয়ে তার রক্ত ঝরছে। হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু এসব দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই তার। বাঁচতে হবে। অসহায়ের মত পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে সে রাজী নয়।

দিনের আলো ফুটলে দত্তারাম দেখল এক বালুচর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু বালি আর বালি। হয়তো কোনকালে এক স্রোতস্বিনী বয়ে যেত এখান দিয়ে। এখন সেটা রূপান্তরিত হয়েছে মরুভূমিতে।

বেলা যত বাড়তে থাকে, দত্তারামের গলাটা ততই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বালিতে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ তার মুখে আগুন ধরায়। চোখ মেলে তাকাতে গেলে মনে হয় বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে।

তৃষ্ণা…তৃষ্ণা…তৃষ্ণা…

এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে দত্তারাম তখন কোমরে বাঁধা নোটের তাড়াটা যে কোন লোকের হাতে তুলে দিতেও প্রস্তুত। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে অনর্থক চাটবার চেষ্টা করতে করতে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'এ কিংডম ফর এ হর্স'…গোটা রাজ্যের বিনিময়ে যিনি একটা ঘোড়া চেয়েছিলেন, তাঁর অবস্থাটা হয়তো দত্তারামের মতই শোচনীয় হয়েছিল।

হাওয়া উঠল। তপ্ত বালিগুলো তীরের মতই এসে বিঁধতে লাগল গায়ে। চোখ খোলবার উপায় নেই।

অন্ধের মতই টলতে টলতে এগিয়ে চলল দত্তারাম। মাথার ওপর পাক খেতে খেতে একটা শকুন বারকয়েক ডেকে উঠল।

ভয়ে কেঁপে উঠল সে। শবভোজী পাখিটার মতলব বুঝতে তার বাকি থাকে না। অশক্ত দেহে যে মুহূর্তে সে বালির ওপর লুটিয়ে

পড়বে, সেই মুহূর্তে শূন্য থেকে নেমে আসবে শকুনটা। দীর্ঘ চঞ্চু দিয়ে তার দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাবে।

আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে দত্তারাম একবার চারদিকে ফিরে তাকাল যদি কোথাও লোকালয় দেখা যায়। কিন্তু না, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু বালির সমুদ্র। নিঃসঙ্গতা যে এমন ভয়াবহ সে তা কল্পনাও করতে পারে নি।

দ্রুততর পা চালাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু বালির স্তূপ খলখল করে হেসে যেন তার পা দুটো আরও টেনে ধরতে লাগল। সেটা বুঝেই শকুনটা আরও নিচে নেমে এসে তার মাথার ওপর পাক খেতে লাগল।

মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারাল দত্তারাম। চোখের সামনে দেখা দিতে লাগল মরুদ্যান। টলটলে জলেভরা সুবিপুল হ্রদ। ছায়া সুনিবিড় তালগাছের কুঞ্জবন। হাতছানি দিয়ে সেগুলো যেন তাকে ডাকতে লাগল।

পাগলের মতই দত্তারাম ছুটতে লাগল। তাকে বাঁচতে হবে—যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ল। বালির সমুদ্র শেষে দেখা দিল বনরাজির শ্যামলিমা। আর ঠিক সেখানেই আবির্ভূত হল বাংলো ধরনের ছোটখাটো একটা বাড়ি।

মরীচিকা বলে প্রথমটা ভুল করল দত্তারাম। করাটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু ফটকের গোড়ায় হেলান দিয়ে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল, সে প্রহেলিকা নয়। বরং বনদেবী বললেই হয়তো ঠিক বলা হয়।

অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল দত্তারাম। হয়তো পড়েই যেত সে, কিন্তু তার আগেই ছুটে এসে ভারতী তাকে ধরে ফেলল। আগন্তুকের শোচনীয় অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল বলেই, গভীর মমতায় তাকে ধরে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে

নিয়ে এল। শুইয়ে দিল একখানা ঘরে। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'দাদু! শীগগির এস।'

দত্তারাম তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

সে জ্ঞান ফিরল তার পরদিন সকালে।

মাথার দিকের জানলা দিয়ে এক ঝলক সূর্যের আলো মেঝেয় এসে পড়েছে। তাকাতে গিয়েও দত্তারাম আবার চোখ বুজে ফেলল। সত্যিই সে কারও বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে, এটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

কতক্ষণ পর ধীরে ধীরে খাটিয়ার ওপর উঠে বসল সে। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। পরনে তারই শতচ্ছিন্ন পোশাক। কোমরে হাত দিয়ে অনুভব করল নোটেভরা গেঁজেটা যথাস্থানে আছে কিনা। তারপর শিশুর মতই স্খলিত পায়ে মেঝেয় নেমে এল। কিন্তু মাথাটা টলে গেল। কোনরকমে দেওয়ালটা ধরে ফেলল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের পর্দা সরিয়ে ভারতীর ঠাকুর্দা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আরে, আস্তে, আস্তে ভাই। ধাক্কাটা আগে সামলে নাও একটু।'

দত্তারাম চমকে ফিরে তাকাল। দেখল এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। বয়স হয়েছে প্রচুর। কিন্তু সে তুলনায় শরীরের বাঁধন তাঁর অনেক শক্ত। ঠোঁটে লম্বা এক বিড়ি। দেখলে বাঙালী কি অবাঙালী হঠাৎ বোঝা যায় না।

দত্তারাম ফিরে খাটিয়ায় এসে বসে পড়ল। হাতখানা স্বতঃই জামার ভেতর পকেটে ঢুকে গেল। না, পিস্তলটা খোয়া যায় নি।

এক লোটা দুধ নিয়ে ভারতী ঘরে ঢুকল। বলল, 'নিন, গরম দুধটা খেয়ে নিন আগে।'

দত্তারাম নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে এঁদের তরফ থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা আছে কিনা। না, দেহাতী এক

ভদ্রলোক, চাষবাসই যার উপজীবিকা।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সে দুধে চুমুক দিল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোত্থেকে আসছ?'

এর জন্যে দত্তারাম যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বুনে চলল এক মিথ্যা কাহিনী। মনিবের সঙ্গে সে এ তল্লাটে এসেছিল খনির সন্ধানে। তারপর পথ হারিয়ে ফেলে। গিয়ে পড়ে মরুভূমির মত এক বালির চড়ায়।

ভদ্রলোক এবং তাঁর নাতনী বিনা প্রশ্নে মেনে নিলেন তার কাহিনী। নতুন লোকের পক্ষে এরকম ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

দুপুরে খেতে বসে ভদ্রলোক একসময় বললেন, 'পাটনা এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল হে। মাসে একবার করে মালপত্তর নিয়ে সেখানে যেতে হয়।'

দত্তারাম কোনরকম ঔৎসুক্য বোধ করে না। বেখাপ্পাভাবে এ প্রসঙ্গের অবতারণা কেন, সেটাও আন্দাজ করতে পারে না। ভারতী গুনগুন করতে করতে ঘোরাফেরা করছে।

বৃদ্ধ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ব্যাপারটা হচ্ছে···জানো ভায়া···অবশ্য তোমার দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কোন ইঙ্গিত করছি না··· মানে, নাতনীর সঙ্গে কাল রাত্তিরে আমার কথা হচ্ছিল, বুঝলে না ···তুমি আসবার পরেই···' থেমে পড়ে তিনি দাড়ি চুলকোতে লাগলেন।

'যা বলতে চান, বলুন না।' মুখ ফিরিয়ে দত্তারাম বলল।

ভারতী দাঁড়িয়ে পড়ে, আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল।

বাড়ির সামনে দিনের আলোয় ঝলমল করছে শস্যভরা ক্ষেত। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'সোনা ফলেছে হে। কাটতে হবে, ঘরে তুলতে হবে, শহরে নিয়ে গিয়ে বেচতে হবে। তবে তো সারা বছরের খোরাক।'

অন্যমনস্কের মত একটা সিগারেট ধরিয়ে দত্তারাম ফিরে তাকাতেই দেখল, ভারতী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে তার করুণ মিনতি।

বৃদ্ধ আবার শুরু করলেন, 'ভরসার মধ্যে তো ওই নাতনি। ও আর কতটা সাহায্য করতে পারবে? এ তল্লাটে আবার জনমজুর পাওয়াও দুস্কর। তাই ভারতীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল...'

আবার থামলেন তিনি। খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন।

দত্তারাম কোন কথা বলল না।

ভারতী ঘরে এসে ঢুকল। দাঁড়াল একেবারে দত্তারামের পাশটিতে। মিষ্টি গলায় অনুরোধ করল, 'আপত্তি করবেন না দয়া করে। আমি কাল দাদুকে বলছিলুম, ভগবানই আপনাকে দয়া করে পাঠিয়েছেন। সেই থেকে কত আশা করে যে আছি।'

দত্তারামের বুকটা দুপদুপ করতে লাগল। এই সুন্দরী তরুণী সে থাকবে বলে আশা করে আছে। ইচ্ছে হলেও বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

চোখ নামিয়ে নিল সে। জনমজুর সেজে তাকে থাকতে হবে এখানে, কোমরে যার বাঁধা হাজার হাজার টাকা। প্রস্তাবটা হাস্যকর। তবু ভাববারও অনেক দিক আছে বৈকি। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে লোকজনের যাতায়াত কম। খবরের কাগজ আসে না। নিকটতম শহর তিরিশ মাইল। তাও মাসে একবার সেখানকার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন। নিশ্চিন্তে কিছুকাল কাটাবার পক্ষে অপূর্ব সুযোগ।

চোখ তুলে দত্তারাম ভারতীকে বলল, 'আপনি যদি এভাবে বলেন, তাহলে বাধ্য হয়েই আমায় থাকতে হবে।'

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমরা কিন্তু মাইনে বেশি দিতে পারব না ভাই।'

ভারতীর চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি। সেটা লক্ষ্য করল বলেই উদারতায় একেবারে উপচে উঠল দত্তারাম, 'মাইনের জন্যে কিছু ভাববেন না, দাদু। আমি থাকলে আপনাদের যদি উপকার হয়, তাহলেই যথেষ্ট।'

খুশি মুখে ভারতী বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হলে দত্তারাম নিজের ঘরে ফিরে এল। একটু গড়িয়ে নেওয়াটা শরীরের পক্ষে দরকার। খাটিয়ায় গিয়ে বসল সে এবং বসেই ভীষণভাবে চমকে উঠল তাকের ওপর একটা ট্রানজিস্টর রেডিও বসানো দেখে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে লক্ষ্য করে নি দত্তারাম।

তাহলে কি এরা—ঠাকুর্দা আর নাতনি, তার পরিচয় জানেন, চাকরি দিয়ে তাকে এখানে ধরে রাখার চেষ্টাটা কি আটকে ফেলার মতলব? ত্রিশ মাইল দূরের শহরে ইত্যবসরে কি খবর পাঠিয়েছেন বুড়ো শয়তান?

এক গ্লাস জল হাতে ভারতী ঘরে ঢুকতেই সে হিংস্র কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, 'আপনাদের যে রেডিও আছে, আগে আমায় বলেন নি কেন?'

থতমত খেয়ে যায় ভারতী। বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে বলে, 'কেন, না বলার অপরাধ কি হল?'

'হয় নি? রেডিও—রেডিও আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। সময় নেই অসময় নেই, কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর…'

এবার হেসে ফেলল ভারতী। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভয় নেই… ওটার ব্যাটারি খতম হয়ে গেছে। চলে না। এক মাস এখানে থাকলেই বুঝবেন বাইরের দুনিয়া থেকে কেমন নির্বাসন হয়েছে।'

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল দত্তারাম। জলের গ্লাসটা তার হাত থেকে নিয়ে অনুতপ্ত সুরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, বহিন।'

পরদিন সকাল থেকেই সে বৃদ্ধ কেশবলালের সঙ্গে মাঠে যেতে

শুরু করল। অনভ্যস্ত হাতে কাস্তে ধরে দেখত বৃদ্ধের কুশলী হাতে শস্যগুলো কেমন ধারালো অস্ত্রের মুখে আত্মসমর্পণ করছে। সেও চেষ্টা করত কেশবলালকে অনুসরণ করতে। হাতের চেটো জ্বলতে থাকত ; নিশ্বাস পড়ত ঘন ঘন।

তবু ভাল লাগত দত্তারামের। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিত সহজভাবে। মাটির সংস্পর্শে দেহে যেন শিহরণ জাগত। তাছাড়া অনেকখানি যেন শিহরণ বোধ করত।

সেদিনও সন্ধ্যের সময় ক্ষেত থেকে ফিরে সবেমাত্র সে কুয়োর ধারে গেছে হাত-মুখ ধুতে, এই সময় পশ্চিম দিক থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ভেসে এল।

সচকিত হয়ে উঠল দত্তারাম। আড়ালে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই দেখল, জনচারেক সশস্ত্র পুলিশ আসছে কেশবলালের বাড়ির দিকে।

এবার যে লীলা-খেলা সাঙ্গ হতে চলেছে এটুকু বুঝতে দত্তারামের বাকি রইল না।

কেশবলাল বাড়িতে নেই, আছে ভারতী একা।

অজ্ঞাতসারেই দত্তারাম পিস্তলটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে উঠল, 'না মেরে ধরা দেব না।'

ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল একজন পুলিশ অফিসার। পাহারায় রইল তিনজন সশস্ত্র পুলিশ। চারজন শত্রু অথচ গুলি দুটোর বেশি নেই। হোক, তবু ঘোড়ায় আঙুল ছুঁইয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল দত্তারাম।

সময় যেন আর কাটে না। প্রতিটি উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত চুমুকে চুমুকে পান করতে থাকে তার জীবনী শক্তি।

নিশ্চিত মৃত্যু এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

আড়ষ্ট হাত দুটো দত্তারামের ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে থাকায় চোয়াল ধরে গেল। যা ঘটবার ঘটে যাক, আর

এ উৎকণ্ঠা সে সইতে পারে না।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ভারতী কি যে বললে পুলিশ অফিসারটিকে. ফিরে গিয়ে সে ঘোড়ায় চেপে বসল। তারপর দলবল সমেত রওনা হল পুবদিকে।

সুদূর পথের বাঁকে তারা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দত্তারাম লুকিয়ে রইল। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গোপন স্থান থেকে। দেহে তখন তার আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। শুধু মনটা সক্রিয়।

ভারতী তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে—ওরকম কুৎসিত কল্পনা করতে পেরেছিল বলে নিজেকে সে ধিক্কার দিল। নারীর চোখের ভাষা পড়তে কি তার এতখানি ভুল হল? সেই সকরুণ আবেদন···ব্যাকুল মিনতি! ভারতী যে তাকে ভালবেসেছে, নিজের পাশে ধরে রাখতে চায়, এটা তো দিনের আলোর মতই তার কাছে প্রত্যক্ষ।

সন্ধ্যা উৎরে যাবার পর কেশবলাল ফিরলেন। দত্তারাম ততক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

ভারতী খেতে দিল দুজনকে। ঠাকুর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শহর থেকে মহেশ্বরীলাল দারোগা এসেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, এদিকে কোন খুনী আসামীকে পালিয়ে আসতে দেখেছি কিনা।'

কেঁপে উঠল দত্তারাম। চোখ তুলে ভারতীর দিকে তাকাল, কিন্তু সে তখন ঠাকুর্দার দিকে ফিরে দুধ ঢালছে গ্লাসে।

কেশবলাল হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমাদের এই পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে কোন খুনী লুকোতে আসবে না, দিদি।'

'তা বটে।'

তবু ভারতী একবারও দত্তারামের দিকে তাকাল না। নাই তাকাক, পরদিন থেকে সে যেন নবজীবন লাভ করল। খাটবার

ক্ষমতা দ্বিগুণ গেল বেড়ে। ফাঁসির দড়িটা গলা স্পর্শ করেও যদি আবার অদৃশ্য হাতের টানে গুটিয়ে যায়, তাহলে যে কোন লোকেরই মনের অবস্থা বুঝি তার মতই হয়।

দিনের পর দিন কাটে।

এক মাসের মেয়াদ দত্তারামের শেষ হয়ে এল। তারপরই মুক্তি নেবে সে এঁদের কাছ থেকে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে সেদিন কেশবলাল বললেন, কাল সকালে আমরা শহরে রওনা হব ভায়া।'

আনন্দে দত্তারামের বুকটা ঢুপ ঢুপ করে উঠল।

শেষ রাত থেকেই শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। বাড়ির সামনে টাঙ্গা তৈরি হয়ে এসে দাঁড়িয়েই ছিল। ভারতীর সঙ্গে কেশবলাল বসলেন সামনে গিয়ে। দত্তারাম উঠল পেছনে। নিজের মনে হাসল সে। টাঙ্গা চলতে শুরু করলে বিদায় মেগে নিল এক মাসের আশ্রয়স্থলের কাছ থেকে।

পাহাড়ী পথ ছেড়ে গাড়ি নেমে এল আবার বালির চরে। তাত ফুটল গায়ে ফোস্কা পড়ার মতই। কিন্তু আজ আর দত্তারামের অসহ্য মনে হল না।

অবশেষে বালির সমুদ্র শেষে দেখা গেল রেলের বাঁধ। সূর্যের আলোয় লাইন দুটো যেন জ্বলছিল।

দত্তারামের দেহের রক্তও যেন সেই সঙ্গে ফুটতে লাগল। কেশবলালের পিঠে একখানা হাত রেখে সে বলল, 'সামনেই যে স্টেশন পাবেন, আমায় নামিয়ে দেবেন দাদু। আমি শহরে যাব না

কেশবলাল মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তা কি করে হবে হে? তোমায় যে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। টাকা তুলে তোমার মাইনেটা দিতে হবে তো।'

হেসে উঠল দত্তারাম। বলল, 'ওটা দিয়ে ভারতী দিদিকে বরং একটা শাড়ি কিনে দেবেন। মোটমাট সামনের স্টেশনেই নামিয়ে

দেবেন আমায়।'

পথের বাঁক ঘুরতেই সামনে ছোট স্টেশনটা দেখা গেল।

'বেঁধে, বেঁধে দাত্বু।' বলে উঠে দাঁড়াল দত্তারাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতী তার পাশে রাখা ব্যাগটা খুলতে খুলতে হুকুমের স্বরে বলল, 'স্টেশনে তোমার নামা চলবে না! বসো চুপ করে।'

দত্তারাম বিদ্রুপে মুখ বিকৃত করে তার দিকে সবেগে ফিরে তাকাল, আর তাকিয়েই তার মুখে-চোখে বিদ্রুপের বদলে দেখা দিল আতঙ্কের ছবি।

ভারতীর হাতে পিস্তল—তার পকেটে যেমন আছে, ঠিক সেই গোত্রেরই।

কেশবলাল ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকিয়ে নিরীহের ভঙ্গিতে বললেন, 'নাতনির হুকুম মানাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে হে ভায়া। দেখছ না, এই বুড়ো বয়সেই আমি মেনে চলছি।'

দত্তারামের দৃষ্টি দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল।

সেটা লক্ষ্য করে কেশবলাল আবার বললেন, 'পিস্তলটা যে খেলনার নয়, ভাই। আমি ব্যবহার করতুম। তারপর নাতনির হাতে তুলে দিই। কে জানত, ও এমন রায়বাঘিনী হবে?'

'রায়বাঘিনী, না কালসাপিনী?'

নিজের পিস্তলটা বার করবার জন্যে দত্তারাম চট করে হাতখানা পকেটে ভরাতেই, ভারতী হিসহিস করে উঠল, 'ও চেষ্টা করো না! কারণ খুনীদের গুলি করে মারতে আমার বিবেকে একটুও বাধবে না।'

খুনী! হাতটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল দত্তারামের।

ভারতী আবার হুকুম করল, 'হাতটা বার করে নাও, নইলে মহেশ্বরীলাল দারোগাকে কথা দিয়েছি এই বলে যে মৃত অবস্থাতেও তোমায় নিয়ে যেতে হবে।'

দত্তারামের বুকটা কেঁপে উঠল। হাতখানা তার প্রায় অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল পকেট থেকে। রক্তহীন মুখে সে গর্জন করে উঠল, দারোগাকে তুমি কথা দিয়েছিলে ?'

ভারতী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সেদিন যখন আমাদের বাড়ি এক পলাতক খুনীর সন্ধানে এসেছিলেন। সে খুনী যে তুমি, আমি প্রথম দিনই সেটা বুঝেছিলুম। কারণ রেডিওতে তোমার সব কীর্তি শুনতে বাকি ছিল না আমার। আর চিনেছিলুম বলেই রেডিওটা খারাপ করে রেখেছিলুম, যাতে না তোমার সন্দেহ হয়। সেদিনই তোমায় মহেশ্বরীলাল দারোগার হাতে তুলে দিতুম, কিন্তু...'

বাকিটা সে আর শেষ করল না।

দাঁতে দাঁত ঘষে দত্তারাম বিড়বিড় করে উঠল, 'ছোবলটা ঠিক বুকের মাঝখানেই দেবে বলে। কালসাপিনী!'

হেসে উঠলেন কেশবলাল।

গাড়ি এগিয়ে চলল শহরের থানার উদ্দেশে।

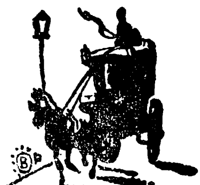

মোহিনী

অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম পর্ব

মনের ডাক্তারি করে বেশ দু-পয়সা করেছি আমি। কিন্তু যে কাহিনী আপনাদের বলতে যাচ্ছি, তা ডাক্তারি কাহিনী নয়—গোয়েন্দা কাহিনী। আমিই এ কাহিনীর গোয়েন্দা।

জানুয়ারির শেষের দিকে পুরী গেছিলাম। একা। আমার তিন কুলে কেউ নেই। বিয়ে-থাও করি নি। বন্ধুবান্ধব সব বউ নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া, বিয়ের পরেই পুরুষগুলো সব কিরকম হয়ে যায়। খুব তেজী মেয়েদেরও দেখেছি, মাথায় সিঁদুর দিতে না দিতেই পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সোয়ামীর পেছন পেছন ঘোরে। আবার বোহেমিয়ান পুরুষগুলোও লক্ষ্মীসোনা হয়ে যায় যেন বিয়ের পরেই—বউয়ের আঁচল ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ভাবছেন বিয়ে-থা না করার ফলে মনের জ্বালায় এই ধরনের কথাবার্তা ছাড়ছি। নিজেই একজন মনের রুগী হয়ে গেছি। কিন্তু ভুলে যাবেন না, রোজ এত রকমের রুগী ঘাঁটবার সুযোগ হয় বলেই বিয়ের বকলস-পরানো স্ত্রী-পুরুষদের দেখবার দুর্ভাগ্য আমার সবচেয়ে বেশি।

যাক, গোড়াতেই পাঠক-পাঠিকাদের চটিয়ে দিলে আমার এই কাহিনী অপঠিত থেকে যেতে পারে। তবে খোঁচা খেয়ে যাঁরা চটেছেন, তাঁরা যদি শেষ পর্যন্ত পড়েন, আমাকে খোঁচা মারার সুযোগ পাবেন।

অলমিতি।

হ্যাঁ, পুরীতেই এই কাহিনীর শুরু। জানুয়ারির শেষ থেকে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারির গোড়ার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছিল শ্বাসরোধী, ঘাত-

প্রতিঘাতময়, রহস্যাকীর্ণ, চক্রান্ত-চঞ্চল লোমহর্ষক সেই কাহিনীর প্রথম পর্ব।

ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ আমি, ক্রুর কুটিল জীবনের সঙ্গে পরিচয় কম—ভয়ঙ্কর জীবনাবর্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল সেই প্রথম। তার পর থেকেই জীবনের মোড় ফিরে গেল আমার। এক অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে শুরু করলাম আর এক অধ্যায়।

যেহেতু আমি হৈ-হট্টগোল পছন্দ করি না, নির্জনতাকে পছন্দ করি মনপ্রাণ দিয়ে, তাই পুরী গিয়ে কোন হোটেলে উঠি নি—এমনকি সবচাইতে খানদানী এবং বিচ্ছিন্ন হোটেলটিকেও সযত্নে পরিহার করেছি—উঠেছি স্বর্গদ্বারের ওপারে নির্জন সৈকতের একটি বহুতল বাংলোয়।

বাড়িটা রোমাঞ্চকর। সামনের দিকটার অর্ধেক বালিতে ঢেকে গেছে। জানলার গোবরাট পর্যন্ত বালি ঠেলে উঠেছে। চারদিক ঘেরা পাঁচিল টপকে বালি ঢুকে পড়েছে ভেতরকার উঠোনেও। এককালে ছোট্ট বাগান ছিল সেখানে—এখন তা বালিতে আবৃত। পেছনকার দরজাটা পর্যন্ত পুরোপুরি ঢেকে গেছে বালিতে। ফলে, বাড়িতে পাঁচিল থাকা আর না থাকা একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বর্গদ্বারের শ্মশানের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ যে রাস্তাটি অগুনতি হলিডে-হোমের মাঝখান দিয়ে এসে সমুদ্রের পাশ বরাবর দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত, যে রাস্তার দুপাশে এবং পুরীর শেষ প্রান্তে হিপিরা ভাঙাচোরা এক-একটি ঘর নিয়ে রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে নিমগ্ন, সেই রাস্তা থেকে যে-কেউ এসে বালির পাহাড় টপকে ঢুকে পড়তে পারে আমার নিভৃত নিকেতনে।

সেজন্যে আমার প্রাণে কোন শঙ্কা ছিল না। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। স্বর্গদ্বারেই সারা গায়ে উল্কি আঁকা এক হিপিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার সারা গায়ে এসব কি এঁকেছো? এক হাতের কমণ্ডলু এবং আরেক হাতের ত্রিশূল শূন্যে তুলে নীলচক্ষু

শ্বেতকায়টি অট্টহেসে বলেছিল, নাথিং টু টেক ফ্রম মী। আমারও সেই একই কথা। কিছুই নেবার নেই যার কাছ থেকে, নিভৃত নিকেতনে একাকী থাকতে তার ভয় কিসের? বরং আছে শান্তি, অনাবিল শান্তি; শহর থেকে, লোকালয় থেকে, স্নানার্থীদের উদ্দামতা থেকে, সমুদ্র দর্শনার্থীদের লঘু চাপল্য থেকে দূরে অনেক দূরে সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে ক'টা দিন নিজের মনের মধ্যে ডুবে যাওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় প্রশান্তি—তা কি কাউকে বলে বোঝানো যায়? সেটা উপলব্ধির বিষয়। হিপিরা বোধ হয় এই শান্তির সন্ধানেই পুরীর প্রান্তদেশে এই অঞ্চলটিতে দরজা আর জানলা বিহীন জীর্ণ ইষ্টকালয়-গুলিতে দলে দলে বাসা নিয়েছে। এখানে বসেই তারা সোজা সামনে চেয়ে থাকে—রৌপ্যকিরীট সুশোভিত বিশাল তরঙ্গভঙ্গ দর্শন করে—আর বুঝি সোজা অস্ট্রেলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ার মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে আসা সমুদ্র-সমীরণকে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করে।

রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থাই রাখি নি আমার বালিতে পোঁতা নিরালা গৃহটিতে। হোটেল থেকে টিফিন কেরিয়ারে খাবার দিয়ে যেত। খুব ক্ষিদে পেলে নিজে গিয়ে খেয়ে আসতাম। বাকি সময়টা সমুদ্রের ধারে একা একা পায়চারি করতাম। কখনো বই পড়তাম। কখনো বালির ওপরে বসে জেলেদের মাছ ধরা দেখতাম। কখনো স্নানের পোশাক পরে কিছুক্ষণ নোনা জলে শরীর ভিজিয়ে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম।

আমার এই নির্জন সমুদ্র অবগাহনের সাক্ষী ছিল মাত্র একজন। প্রায়-বৃদ্ধ এক শ্বেতকায় হাফ প্যাণ্ট পরে খালি গায়ে সকাল সন্ধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত সমুদ্রের ধারে। প্রথমে ভেবেছিলাম পাগল। কিন্তু কাছ থেকে তার ঘোলাটে চোখ আর ঠোঁটের কোণে সদাজাগ্রত মৃদু হাসির মধ্যে দেখেছিলাম প্রজ্ঞার লক্ষণ। মুখের মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ। কিন্তু বুঝি নি কেন মানুষটা দিনের পর দিন এভাবে

দাঁড়িয়ে থাকে সমুদ্রের ধারে। সোজা চেয়ে থাকে সামনে—যেন দূরবিস্তৃত চাহনি দিয়ে দেখতে পায় সুমাত্রা জাকার্তা পেরিয়ে অনেক দূরের অস্ট্রেলিয়াকে।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার নিবাস কোথায় জানতে পারি?

স্বপ্নালু চাহনি আমার দিকে ফিরিয়ে দীর্ঘকায় অর্ধনগ্ন মানুষটা মৃদু হাসি দিয়ে আমাকে আপ্যায়ণ করেছিল। বলেছিল, ওই ওখানে।

কোথায়?

অস্ট্রেলিয়ায়।

এখানে কতদিন আছেন?

অনেক দিন।

কতদিন থাকবেন?

জানি না।

কোথায় উঠেছেন?

মৃদু হাসি বিস্তৃত হল—জবাব এল না। নিবাস গোপনকারী ব্যক্তিটিকে আর প্রশ্ন করি নি আমি।

দিন তিনেক পরে অস্ট্রেলিয়ার সুনীল-চক্ষু মানুষটির এই-ভাবে স্বপ্নমদির চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যতিক্রম ঘটল। প্রতিটি অপরাহ্নে যে মানুষটা সুর্যাস্তের রাঙা আলো সর্বাঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার আগমনে অশরীরীর মতই মিলিয়ে যেত অন্ধকারে, তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে তাকে দেখতে পেলাম না বিশেষ সেই স্থানটিতে। তার পরিবর্তে দেখলাম একটি নতুন মানুষকে। একটি মেয়েকে।

শুভ্রতার ওপর মেয়েটির অপরিসীম প্রীতি লক্ষ্য করেই থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। শুভ্র ব্লাউজ, শুভ্র শাড়ি শুভ্রতর হয়ে উঠেছে শ্যামল গাত্রবর্ণের পটভূমিকায়। একমাথা ঘন ঝোঁকড়া চুল টেনে বাঁধা শক্ত কবরীতে। টানা টানা ভুরুর নিচে কৃষ্ণকায় চক্ষু দুটি বড়

বেশি ম্লান এবং বিষাদ-স্নিগ্ধ বলে মনে হল। বয়স তিরিশের মধ্যে। সুন্দরী সে নয়, কিন্তু তার আত্মনিমগ্ন রূপটি আমাকে বড় বেশি আকর্ষণ করেছিল। বালির ওপর বসে দুই উত্তোলিত হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে নির্নিমেষে চেয়েছিল সগর্জন জলরাশির দিকে। হাওয়ায় উড়ছিল সাদা শাড়ির আঁচল। আর পাশের অসংখ্য বালুকা-বিবর থেকে লাল কাঁকড়াগুলি পর্যন্ত নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে যেন অবাক হয়ে দেখছিল শিলামূর্তির মত নিথর দেহিনীকে।

কে এই অপরূপা ?

সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা নামল। দূরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চাহনি মেলে রইলাম তার পানে। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিকে দু' চোখ দিয়ে লেহন করা যে অন্যায় এবং শালীনতা বহির্ভূত, তা জেনেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না, সরে যেতে পারলাম না। আদিম সমুদ্রের সৈকতে মানুষ মাত্রেই কি আদিমতার আস্বাদ পায় এইভাবে ?

চতুর্থ দিন প্রত্যূষে গর্জমান সমুদ্রের ধারে এসে দেখলাম একই ভাবে হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপ করে বসে রয়েছে মেয়েটি। সূর্যের তাপ অসহ্য না হওয়া পর্যন্ত বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে চলে গেল পেছনের রাস্তাটির দিকে। বিশাল একটা বালুকা-গহ্বরের পাশ দিয়ে প্রবেশ করল একটি জীর্ণ ইষ্টকালয়ে।

অপরাহ্নেও তাকে দেখলাম একাকিনী। বুঝলাম, আমার মতই নিঃসঙ্গ সে। বিচিত্র নিঃসন্দেহে। পুরুষ মানুষও পুরীর প্রান্তে একাকী থাকতে ভয় পায়—বিশেষ করে হিপিরা যেখানে আস্তানা নিয়েছে। এ মেয়েটি একাকিনী কোন সাহসে সেখানে থাকে ?

কে এই রহস্যময়ী ?

পঞ্চম দিনও ভোরের আলোয় শ্যামলিনীকে দেখলাম নীরবে নিশ্চুপে বসে থাকতে সাগরপারে। কনফার্মড ব্যাচেলর বলতে যা বোঝায়, আমি কিন্তু তাই বলেই নিজেকে ভাবতাম। যৌবনের প্রথমে

আইবুড়োমন্দির নামক একটি ক্লাবের সেক্রেটারীও ছিলাম দীর্ঘকাল। দেউলটি দেউলে হয়ে গেছে সদস্যরা ধর্মত্যাগ করায়। এক আমি ছিলাম স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের উপকূলে রজতশুভ্র বসন পরিহিতা লাবণ্যময়ীকে দেখে কেন এত উত্তেজিত এবং কৌতূহলী হলাম, তা বিধাতাই কেবল জানেন।

পঞ্চম দিনের উষার শুভলগ্নে তাই আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম জীবন্ত প্রহেলিকার পাশটিতে।

মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। ক্ষণেক চেয়ে রইল মুখের দিকে। কি যেন অন্বেষণ করল আমার চোখের মধ্যে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চাইল সমুদ্রের পানে।

আমি বললাম, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম।

মেয়েটি আবার মুখ তুলে চাইল। এবার সামান্য হাসল। বিষাদ-সিন্ধু যেন উথলে উঠল সেই হাসির মধ্যে।

বললাম, ক'দিন ধরেই দেখছি, আপনি একা আসেন। সঙ্গী কেউ নেই, আমিও একা আসি, তাই ভাবলাম আলাপ করে নিই। রাগ করছেন না তো?

মুখ টিপে সেই রকমই নিতল হেসে মেয়েটি বললে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে, না, না, রাগ কবব কেন। বসুন আপনি।

স্বচ্ছন্দ আহ্বান। এত আশা করি নি। বসলাম রহস্যময়ীর পাশে। আত্মপরিচয় দিলাম। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঙ্কেতে দেখিয়ে দিলাম কোথায় আমার নিবাস।

মেয়েটি তখন পরিচয় দিলে নিজের। প্রথম আলাপেই এতখানি কথা সে বলবে, ভাবতেও পারি নি। মেয়েটির নাম মালিনী। মালিনী পোদ্দার। এক সুবর্ণবনিক ধনকুবেরকে বিয়ে করেছিল। বোম্বাইতে সোনার গয়নার বিজনেস ছিল ভদ্রলোকের। নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি মারা গেলে ব্যবসা বেচে দিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়

মালিনী। ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা টাকার সুদে এইভাবেই চলে যাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন। নির্জনতা ভালবাসে বলেই উঠেছে পুরীর প্রান্তে ওই বাড়িটিতে। ভাড়াও কম। রেঁধে-বেড়ে নেয় নিজেই। মাসখানেক থাকবে।

অভিভূত হলাম মালিনীর চাপা বেদনার বহিঃপ্রকাশে। আবার বিকেলে দেখা হবে বললাম। বেলা হয়ে যাচ্ছিল বলে উঠে পড়লাম। স্বর্গদ্বারের হোটেলের দিকে আসবার সময় পেছন থেকে হনহন করে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার নাগাল ধরে ফেললেন। পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বার করে দেখালেন আমাকে। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসার।

বিস্মিত হলাম। পুলিশ আমার কাছে কেন?

ভদ্রলোকের বয়স মাঝারি। একমাথা কাঁচাপাকা চুল বেশ তেল-চুকচুকে। পানের রস ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়াচ্ছে। শুকনো খটখটে শ্যামকান্তি। পরনে জীনসের প্যান্ট আর নামাবলী প্রিন্ট বুশশার্ট। মূর্তিমান অপসংস্কৃতি।

বললেন, আমার নাম জগন্নাথ দাস। আপনার নামটা জানতে পারি?

বিপুল গুহ, ডাক্তার। সাইকিয়াট্রিস্ট। কলকাতায় প্র্যাকটিশ করি।

বই-প্যাটার্নের পানের ডিবে বেরোল প্যান্টের পকেট থেকে। একখিলি পান আমাকেও অফার করা হল। প্রত্যাখ্যান করলাম সবিনয়ে। জগন্নাথ দাস পানটা গালে ঠুসে পিচ সামলাতে সামলাতে ঊর্ধ্বমুখে বললেন, সমাজ-কল্যাণটাও আমাদের দেখতে হয়, তাই আপনাকে দাঁড় করালাম।

ভুরু কুঁচকে বললাম, স্পষ্ট করে বললে ভাল হয়।

পুরী বেড়াতে এসেছেন তো? বাজে ঝামেলায় জড়াবেন না।

মানে?

মালিনী পোদ্দারের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না।

কেন?

ওর ওপর আমাদের নজর আছে বলে।

কণ্ঠস্বরকে আর মোলায়েম রাখতে পারলাম না। রূঢ় স্বরেই বলে ফেললাম, কারণটা জানতে পারি?

মেয়েটা ভাল নয়!

ধন্যবাদ। আমার ভাল আমি নিজে বুঝি!

মেলামেশা তাহলে চালিয়ে যাবেন?

এক কথা আমি দুবার বলি না!

ঝামেলা ডেকে আনছেন কিন্তু।—পচ করে খানিকটা পিচ ফেললেন জগন্নাথ দাস।

বিষদৃষ্টি হেনে পা চালালাম হোটেল অভিমুখে।

কোন কোন ঘটনা বড় দ্রুত ঘটে যায় মানুষের জীবনে—রেস হর্সের মত বায়ুবেগে ধেয়ে যায় লক্ষ্য অভিমুখে—ছকে বাঁধা মন্থর জীবন-কাব্যে এ এক আশ্চর্য দ্রুত ছন্দ। আমার জীবনে মালিনীও নিয়ে এল সেই দ্রুতি, সেই পবনগতি। জীবনে রোম্যান্স কাকে বলে কখনো অনুভব করি নি। বিধবা মালিনী তার বিষাদ-করুণ নয়ন দিয়ে সেই হৃৎপিণ্ড উত্তাল করা রোম্যান্সের স্বাদ এনে দিল আমার জীবনে। সহসা—নিতান্তই সহসা উপলব্ধি করলাম এতগুলি বছর নিঃসঙ্গ কাটিয়েছি জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ পাই নি বলে। মালিনীই সেই সঙ্গিনী—সহধর্মিণী হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা নিয়ে এই আদিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে সে এসেছে আমার সামনে, এ মিলন বিচ্ছেদের মধ্যে শেষ হতে দেব না আমি—কখনোই না।

ফটো তোলার হবি ছিল। সৈকত সুন্দরীর ছবি তুললাম। সেই ছবির এক কপি রাখলাম পকেটে, আর এক কপি রাখলাম আমার

ঘরে খাটের পাশে টেবিলের ওপর। ভালবাসা কাকে বলে, সেই প্রথম সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। একটি আশ্চর্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি অণু পরমাণুকে উদ্বেলিত করে তুলল। এ আকাঙ্ক্ষা মালিনীকে দেখার, তাকে পাশে নিয়ে বসে থাকার, তার সঙ্গে বিভিন্ন আলাপে নিমগ্ন হয়ে থাকার।

মালিনীর আর আমার নিভৃত নিকেতন দুটির মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়। দুজনে দুজনের বাড়ি যাতায়াতও চালিয়ে গেলাম। এইভাবেই গেল আরও সাতটা দিন। কিন্তু এই সাতদিনের প্রতি দিন রাতের প্রতিটি মুহূর্তে অশান্ত অন্তরে উপলব্ধি করলাম আরও একটি হৃদয়-মোচড়ানো সত্য: আমি মালিনীকে চাইলেও মালিনী যেন আমাকে চায় না। মেলামেশার মধ্যেও একটা অদৃশ্য প্রাচীর ধরে রাখতে চায়, আমার আর তার মধ্যে। ফলে, মনের কথা মন খুলে বলতে পারলাম না। মালিনী রয়ে গেল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এ কি তার সুগভীর বেদনাবোধের জন্যেই? এর পরেই একদিন হোটেলে খেতে গিয়ে টেলিফোন পেলাম পুলিশ দপ্তর থেকে।

ডাক্তার নাকি?

চেনেন আমাকে? বললাম অবাক হয়ে।

হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি বিপ্লব বসু।

বিপ্লব! স্মৃতির পাতা উল্টে গেলাম। দ্রুত। বিপ্লব বসু—নাটক পাগল বিপ্লব বসু?

আরে হ্যাঁ। এখন জীবন নাটক নিয়ে ব্যস্ত। পুলিশের কাজ তো।

বিপ্লব বসু আমার বাল্যবন্ধু। এক পাড়ার ছেলে। সুরী লেনে কম কাণ্ড করি নি দুজনে। আইবুড়োমন্দিরের সদস্য ছিল। নাটক করতে পারলে আর কিছু চাইত না। বিপ্লব আই-পি-এস হয়েছে জানতাম। কিন্তু পুরীতে পোস্টিং হয়েছে জানতাম না।

বিপ্লব, আমার ঠিকানা পেলি কোত্থেকে?

জগন্নাথ দাসের কাছ থেকে।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সেই লোকটা ?

ঢুঁদে অফিসার রে। তোর ভালও করতে পারে, খারাপও করতে পারে।

জানি। ভাল করতে একবার এসেছিল। তুই কি করতে চাস ?

একই উদ্দেশ্য। মালিনীর ছায়া আর মাড়াস নি।

কেন মাড়াবো না ?

মেয়েটা ভাল নয় বলে।

আর কিছু বলার আছে ?

বোম্বাইয়ের ফিল্ম লাইনে এক্সট্রা ছিল এই মালিনী। নাচতে পারে ভালই—নাচাতেও পারে। অভিনয়টাও ভাল জানে। তার চাইতেও বড় গুণটা কি জানিস ?

তাড়াতাড়ি বল।

মালিনী ব্ল্যাকমেলার।

ওয়াণ্ডারফুল ! আর কিছু ?

মালিনীর স্বামী শেষ পর্যন্ত—

থামলি কেন ? শেষ কর।

সুইসাইড করে বেঁচেছে।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

গুম হয়ে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ নিজের টেবিলে ফিরে এসে। আমি যে এখানে খেতে এসেছি, তা নিশ্চয় জগন্নাথ দাসই জানিয়েছে বিপ্লবকে। কোথায় সে ?

মুখ তুললাম ভাতের থালার ওপর থেকে। প্রতিটি টেবিলে দৃষ্টি বুলিয়ে গেলাম। ফরেন ট্যুরিস্টের ভিড়ই বেশি। দিব্বি ভাত ডাল মাছ চচ্চড়ি খাচ্ছে হাত দিয়ে মেখে মেখে। এককোণে বসে পান

চিবোচ্ছেন জগন্নাথ দাস।

দেখেই মাথার রক্ত চড়ে গেল আমার। ঠিক তখনই যেন হঠাৎই আমার ওপর চোখ পড়ল জগন্নাথ দাসের। দুই চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে লাফ দিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে। হন্তদন্ত হয়ে এসে ধপাস করে বসে পড়ল আমার টেবিলের সামনে।

বললে, আপনক টিকিয়ে কাম থিলা।

শক্ত গলায় বললাম, মানে?

এই দেখুন! আপনি তো আবার ওড়িয়া জানেন না। বললাম আপনার সঙ্গে একটু কাজ ছিল।

কাজের কথা তো হয়েই গেল টেলিফোনে।

একগাল হেসে জগন্নাথ দাস বললেন, বস ফোন করেছিলেন বুঝি?

চোয়ালের হাড় শক্ত করে জগন্নাথ দাসের গোমস্তা টাইপের মুখখানা ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললাম, আপনার বস্‌কে একটা কথা বলে দেবেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার বাল্যবন্ধু যখন—

বলে দেবেন, বলে একটু থামলাম। তারপর—মালিনী পোদ্দারকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

চোয়াল ঝুলে পড়ল জগন্নাথ দাসের। পান-জর্দা-কলঙ্কিত দাঁতগুলো দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠল আমার। উঠে পড়লাম টেবিল ছেড়ে।

মালিনী বাড়িতেই ছিল। খাটে বসে ইয়া মোটা একটা বই পড়ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই উপুড় করে রাখল বইটা। দেখলাম, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—বসুমতীর বই।

বললাম, কিছু মনে করবেন না, খাটেই বসছি।

পা গুটিয়ে নিয়ে মালিনী বলল, বসুন না।

আমি বললাম, আমার বয়স এখন চল্লিশ। আপনার?

অবাক হয়ে মালিনী বললে, আটাশ।

বারো বছরের বড় আপনার চেয়ে। খুব বেমানান হবে না।

স্থির চোখে চেয়ে রইল মালিনী।

আমি বললাম, আমাদের এই বয়সে ন্যাকামি মানায় না। জিভের জড়তাও আমাদের থাকে না। তাই সোজাসুজি বলছি। আমাকে বিয়ে করবেন?

মুখটা কিরকম হয়ে গেল মালিনীর।

আমি বললাম, কলকাতায় আমার পশার ভাল, ব্যাঙ্কে দু'লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট আছে, মুচিপাড়ায় একটা বাড়ি আছে, আর গ্যারাজে একটা অ্যামবাসাডার আছে। পাত্র হিসেবে আমি কি খুব খারাপ?

মালিনী চোখ নামিয়ে নিল। ভারি ভাল লাগল ওর লজ্জাকরুণ মুখখানি। আমি বললাম, আমি মনের ডাক্তার। মানুষের মনের খবর টেনে বার করি। পারি নি কেবল আপনার ক্ষেত্রে। তাই সারেণ্ডার করছি। রাজী কিনা বলুন।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল মালিনী। মুখ টিপে হেসে বললে, মুখে না বললে বুঝতে পারেন না?

দু'হাতে মালিনীর দু'হাত তুলে নিয়ে একটু চাপা গলায় বললাম, এই আমাদের পাকা দেখা।—খাট থেকে নেমে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম, এখন কি জানতে পারি ব্যাঙ্কে কত টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখেছেন?

আমার দিকেই চেয়েছিল মালিনী। চোখে চোখ রেখে বললে, আপনাকে বলা যায়, কারণ আমার টাকার খবর না নিয়েই পাকা দেখা সেরে নিলেন। সামান্যই টাকা আছে ব্যাঙ্কে।

কত?

সাড়ে চার লাখ।

দশ পার্সেণ্ট সুদ ধরলে বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার। মাসে তিন

হাজার সাতশো পঞ্চাশ। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই টাকায়। তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন, নিশ্চয় টাকার লোভে নয়?

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ম্যালিনী বললে, সমুদ্রে ডুব দিয়ে আসুন, মাথা ঠাণ্ডা হবে।

হনহন করে সমুদ্রের ধার দিয়েই হেঁটে চললাম বি-এন-আর হোটেলের দিকে। বিপ্লব বসু পয়লা নম্বরের ইডিয়ট। বৃথাই আই-পি-এস হয়েছে। মালিনী সম্বন্ধে এত বড় ভুল করল কি করে? মালিনী ব্ল্যাকমেলার? মালিনী নর্তকী? মালিনী অভিনেত্রী?

বিপ্লবের কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি জানতে হবে, মালিনীর পেছনে চর মোতায়েন করেছে কেন। অপরাধটা কী? স্বামীর সুইসাইড? না, ব্লাকমেলিং? মালিনীকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আমারই—আমি তার হবু বর।

এই চিন্তা নিয়ে এমন তন্ময় হয়ে ছিলাম যে লক্ষ্য ভেদ করার সময়ে অর্জুনের মতই চোখে পড়ছিল না ডাইনের সমুদ্র আর বাঁয়ের জটলা। হাসি-হুল্লোড় সমুদ্রের গর্জন। ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ—কিছুই সাড়া জাগাচ্ছিল না মস্তিষ্কে। ভালবাসা কাকে বলে কোনদিন বুঝি নি। ভাবতাম এটা একটা ব্যায়রাম। মনের বিকার। সেই ভালবাসাই সেই মুহূর্তে যে প্রচণ্ড আবেগ আর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল আমার মধ্যে, বোধ হয় শাজাহানও সেরকমটি কখনো টের পান নি।

তাই আমার পেছনে এক যুবতী দৌড়চ্ছে আর আমার নাম ধরে ডাকছে অনেকক্ষণ ধরে, খেয়ালই করি নি। খেয়াল হল যখন পেছন থেকে এসে সে খপ করে আমার বাহু চেপে ধরে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, বলি কোন জগতে আছেন?

ভীষণ চমকে উঠলাম। আমার মুখোমুখি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে অস্বাভাবিক ঢাঙা মিশকালো রঙের একটি মেয়ে। পাঞ্জাবী

মেয়েদের মধ্যে এহেন দৈর্ঘ লক্ষ্য করা যায়—গড়ন পেটনও চমৎকার। যেন কালো পাথর খোদাই করা একটি মূর্তি—কোনারকের সূর্য মন্দিরের গা থেকে প্রাণ পেয়ে সড়াৎ করে নেমে এসেছে। টাইট ব্লু-জীনস আর ঢিলেহাতা ডীপ রেড শার্ট পরা মেয়েটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মদিরতা মাখানো। সাক্ষাৎ ব্ল্যাক বিউটি।

কালো মুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক মেরে সে বললে, চিনতে অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল বৈকি। তারপর বললাম, সুরমা যে! কর্তা কোথায়?

ওই তো।—পেছন দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে সুরমা, ওই তো, দ্যাখো, দ্যাখো, তোমার বাসুদাকে ভূতে পেয়েছে মনে হচ্ছে।

সুরমা আর গোবিন্দর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল বড় বিচিত্র ভাবে। আমি বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর মেম্বার। একদিন একটা বইয়ের পুস্তনিতে দেখলাম মেয়েলী হাতে লেখা একটা টেলিফোন নাম্বার। তলায় লেখা 'ডায়াল ফর ফ্রেণ্ডশিপ'।

বইয়ের মার্জিনে বা পুস্তনিতে বিজ্ঞে জাহির করা বা পৃষ্ঠার কোণ মোড়া আমি ত্বু'চক্ষে দেখতে পারি না। মেয়েটিকে তাই শিক্ষা দেওয়ার বড় ইচ্ছে হয়েছিল। ডায়াল করেছিলাম নাম্বারটি, কানেকশানও পেয়েছিলাম তক্ষুণি, কিন্তু ক্যালকাটা টেলিফোনস-এর অসাধারণ এফিসিয়েন্সির ফলে ক্রশ কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের সরস কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই নি বলে চুপ করে ছিলাম। রিসিভার নামিয়ে রাখতেও ইচ্ছে যায় নি। দু-মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলাম, পুরুষ কণ্ঠের অধিকারী কোন এক শুভলগ্নে আমারই মত বইয়ে টেলিফোন নাম্বার এবং বন্ধুত্বের আহ্বান পেয়ে 'ডায়াল ফর ফ্রেণ্ডশিপ' করেছিল। তারপর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। মন দেওয়া নেওয়াও হয়ে গেছে।

এখন বাকি কেবল মালাবদল। তারও আর বেশি দেরি নেই।

গলা খাঁকারি দিয়ে অবশেষে বলেছিলাম, সুখী হও।

কে ?—চমকে উঠেছিল নারীকণ্ঠের অধিকারিণী।

এ ফ্রেণ্ড।—বলেছিলাম আমি। বইয়ের টেলিফোন নাম্বার পেয়ে ধমক টমক দেওয়ার জন্যে ফোন করেছিলাম।

লাইব্রেরীর কেউ নাকি ? শঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল মেয়েটি।

না। মনের ডাক্তার। বাসুদেব সাহা।

বইখানা আপনার কাছে এখনও আছে ?

আছে।

দয়া করে নাম্বারটা কেটে দেবেন ?

আর দরকার নেই বলে ?

না। কত খুঁজছি, কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না বইখানা। কেটে দেবেন ? প্লীজ।

দেবো—কিন্তু একটা শর্তে।

কি শর্ত বলুন ?

তোমাদের দুজনকেই আমার চেম্বারে আসতে হবে। আশির্বাদ করব।

ঠিকানা দিন।

ঠিকানা দিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে চেম্বারে এসেছিল সুরমা আর গোবিন্দ। দুজনেই তালঢ্যাঙা। দুজনেই কালো। সুরমা ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুলে পড়ত দিল্লিতে। কলকাতায় এসে পড়ছে যাদবপুরে। গোবিন্দ সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বেরিয়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ে ফরেন পাবলিশার্স সিণ্ডিকেটের মার্কেটিং ম্যানেজার। সুরমার বয়স বাইশ, গোবিন্দর আটাশ। সুরমার জীবন বড় অদ্ভুত। বাবা ছিলেন পাইলট, মা এয়ার হোস্টেস। প্লেন ক্র্যাশ হওয়ায় একদিনেই বাবা মা স্বর্গারোহন করেন। বাবার বন্ধু এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের কাছে বারো বছর বয়স থেকে মানুষ হতে

থাকে সুরমা। শিক্ষাদীক্ষা তিনিই দিয়েছেন। সিডনি ইণ্ডাস্ট্রীজের দিল্লি ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার ছিলেন কর্নেল ম্যালকট। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। সুরমা গোবিন্দর শুভ-পরিণয়ে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

সেই সুরমাই খুশি-উচ্ছল চোখে দাঁড়িয়ে আমার সামনে। বিয়ের জল পড়ায় শরীরের রেখাগুলো মোটেই ভোঁতা হয় নি।

বললাম, ডাকো গোবিন্দকে।

পেছন ফিরে হাত নেড়ে ডাকল সুরমা। দীর্ঘদেহী গোবিন্দ প্যান্টের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। টল, স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম। যেন কালো ইস্পাতের বাঁকা তলোয়ার।

কাছে আসতেই বললাম, ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালিয়ে যাচ্ছো মনে হচ্ছে?

মুখ টিপে হাসল গোবিন্দ। সুরমা কলকলিয়ে বললে, বুড়ো বিয়ে করলেই হত।

কি হত? বাচ্চা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।—চোখ মুখ ঘুরিয়ে নিলাজ কণ্ঠে বললে সুরমা, ছোঁড়াগুলো বড্ড হিসেবী।

গোবিন্দ এবার আর হাসল না।

দুজনে দুটি চরিত্র। সুরমার ভেতরে গভীরতা কম, উচ্ছলতা বেশি। যা মুখে আসে, তাই বলে ফেলে। তলিয়ে ভাবে না। গোবিন্দ বিপরীত প্রকৃতির মানুষ। হিসেবী কথাবার্তা, উচ্ছলতার চাইতে গভীরতা বেশি।

দেখছি, বিয়ের তিন বছর পরেও একটুও পাল্টায় নি দুজন। গোবিন্দ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যেই যেন বললে, আসুন আমাদের আস্তানায়।

সেটা কোথায়?

পান্থনিবাসের পেছনে।

বিপ্লবকে একহাত নেওয়া মুলতুবি রাখলাম। বললাম, চলো।

পাশাপাশি তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সুরমা বললে, আচ্ছা বাসুদা, মানুষ খুন করবার ইচ্ছেটা কি একটা মানসিক রোগ?

এ আবার কি প্রশ্ন? বললাম আমি।

সুরমার স্বভাবই এই রকম। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায়—আগের কথা খেয়ালও থাকে না।

বলুন না, মানসিক বিকৃতি থেকেই কি খুন করার স্পৃহা জাগে?

সেটা নির্ভর করছে অনেক ফ্যাক্টরের ওপর। কেন, তোমার কাউকে খুন করার ইচ্ছে হচ্ছে? লঘুভাবেই বললাম কথাটা।

দমকা হাসিতে শতধা চূর্ণ হয়ে সুরমা বললে, হচ্ছে বৈকি।

কাকে? আমাকে কি?

না, না। আপনি তো নিরামিষ।

তবে কাকে সুরমা?

গোবিন্দকে। পুরুষ মানুষ হবে বেপরোয়া—লক্ষ্মীছাড়া। বড্ড নিয়ম আর শাসনের মধ্যে চলে—তাই ইচ্ছে করে—

সুরমা! এই প্রথম ভুরু কুঁচকে কণ্ঠস্বর কঠিন করল গোবিন্দ।

ব্যাপার কি? ওদের সম্পর্কে এই তিন বছরেই ফাটল ধরেছে নাকি? সুরমা এত লঘুমতি এবং চপল চঞ্চল—কোন কথায় কার আঘাত লাগে, তাও বুঝতে পারে না।

সুরমার মন ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে। হৈ হৈ করে বলে উঠল, দ্যাখো, দ্যাখো, বাচ্চাটার কাণ্ড দ্যাখো!

ফুটফুটে একটি ইউরোপীয় বাচ্চা বালির ওপর শুয়ে সমস্ত দেহটা বালি দিয়ে ঢাকছে—মুখখানা কেবল বেরিয়ে রয়েছে বালির বাইরে। পাশেই বসে হাসছে তার বাবা আর মা।

গোবিন্দ হেঁট হয়ে বাচ্চাটার দু-গাল টিপে দিয়ে বললে, নটি বয়!

পান্থনিবাসের পেছনে সাজানো গোছানো চমৎকার হলিডে হোমে আস্তানা নিয়েছে সুরমা আর গোবিন্দ। চব্বিশ ঘণ্টার ঝি-চাকর ছাড়াও আছে টেলিফোন এবং গ্যারেজে গাড়ি। হলিডে হোম নামেই—আসলে একটা অফিস। এখান থেকেই কলিঙ্গ মার্কেটিং পরিচালনা করে গোবিন্দ।

কফি আর কাজু বাদাম নিয়ে বসেছি আমরা তিনজনে, এমন সময়ে একটা সাইকেল রিক্সা এসে থামল বাড়ির সামনে। নামল এক বৃদ্ধা। পরনে কালাপেড়ে শাড়ি। গায়ের রঙ খুব ফর্সা। প্রতিমার মত বড় বড় চোখ। এককালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন নিশ্চয়। বনেদিয়ানার ছাপ চোখে মুখে চলনে বলনে।

গোবিন্দ উঠে পড়ল—পিসিমা এসেছেন।

ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধা। বয়স সত্তরের কাছাকাছি নিশ্চয়। কিন্তু শিরদাঁড়া এখনো সিধে। ঘরে ঢুকলেন সহজভাবে, কিন্তু সুরমাকে দেখেই যেন একটু শক্ত হলেন। আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই পরিচয় করিয়ে দিল গোবিন্দ।

বললে, বাসুদা, পিসিমা পুরীতেই শেষ জীবন কাটাবে বলে এখানে বাড়ি কিনেছে।

পিসিমা বললেন, তোরা গল্প করছিস কর, আমি উঠি। একটু আগে ফোন করেছিলাম, তোরা বাড়ি ছিলি না। তাই নিজেই এলাম। আজ রাত ন'টার সময়ে তুই আর সুরমা আমার বাড়ি আসবি। কথা আছে।

কি কথা, পিসিমা? শুধোল গোবিন্দ।

গেলেই বুঝবি।—আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গিয়ে রিক্সায় উঠে বসলেন পিসিমা।

ঘরের আবহাওয়াটা কিন্তু পাল্টে দিয়ে গেলেন। সুরমার মত মেয়েও গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অকারণে কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে সুরমা বললে, টাকার গরমে মাটিতে আর পা পড়ছে

না বুড়ির।

আঃ, সুরমা! গোবিন্দর স্পষ্টত বিরক্তি।

থামো তুমি! বুড়ির সব সম্পত্তি তুমি পাবে তো—তাই কোন দোষ দেখতে পাও না! চোখ রাঙানির ধার ধারি না আমি!

সুরমার মুখে ঠিক এ ধরনের কথা তো কখনো শুনি নি? ব্যাপার কী? রাগে যেন ফুটছে মেয়েটা।

আমার সামনে আর দাম্পত্য কলহের মধ্যে গেল না গোবিন্দ। চালাক ছেলে। জোর করে মুখের বিরক্তি মুছে ফেলে বললে, চলুন বাসুদা, আপনি কোথায় থাকেন দেখে আসি!

চলো। সুরমা, তুমিও এসো।

সুরমা যেন পা বাড়িয়েই ছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন।

হেঁটেই গেলাম তিনজনে। শ্মশানের পেছনকার রাস্তা ধরে গল্প করতে করতে অতখানি পথ চোখের নিমেষে ফুরিয়ে গেল। সুরমা আবার উচ্ছল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আবার হাসছে, খুনসুটি করছে। গোবিন্দকে রাগিয়ে দিচ্ছে। আমার বালি ঢাকা বাড়ির সামনে এসে বললে, ওরে বাবা! এ যে ভূতুড়ে বাড়ি।

খিড়কির দরজার পাশ দিয়ে, বালি ঢাকা পাঁচিলের গা দিয়ে সমুদ্রের দিকের সদর দরজার দিকে এগোতেই দেখলাম সদর দরজা পেরিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এল মালিনী। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ওর বাড়ির দিকে।

মালিনী!

মালিনী কিন্তু দাঁড়াল না। আমার ডাক শুনেও যখন দাঁড়াল না, তখন আর ডাকাডাকি করলাম না। নির্জনতাপ্রিয় মেয়েটা এসেছিল শুধু আমার সঙ্গেই দু-দণ্ড কাটিয়ে যেতে! সঙ্গে আরো দুজন আছে দেখে চলে যাচ্ছে যখন—যাক। তাছাড়া, ও এখন যে-কথা বলবে, তা গোবিন্দ-সুরমার সামনে বলা যায় না।

দেখতে দেখতে উঁচু বালির আড়ালে হারিয়ে গেল ওর ধবধবে

শাড়ি জড়ানো তন্বী মূর্তি।

পাশ ফিরে বললাম, এসো সুরমা।

বলেই থমকে গেলাম। মুখখানা যেন কিরকম হয়ে গেছে সুরমার। উচ্ছলতা চপলতা অন্তর্হিত হয়েছে। অনিমেষে চেয়ে আছে মালিনীর গমন পথের দিকে।

বাসুদা, ও কে?

ঘরে চলো, বলছি।

দুজনকে বসালাম ঘরে। বললাম, মালিনী কে এবং কি হচ্ছে যাচ্ছে। আমার ঘরণী।

টেবিলের ওপর থেকে সদ্য তোলা ফটোটা এনে ধরলাম সুরমার সামনে—পছন্দ হচ্ছে ভাবী বৌদিকে?

চোখের ভুল কিনা বলতে পারব না, কিন্তু যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল সুরমার মুখ থেকে।

এর পরের ঘটনা-স্রোত এগিয়ে চলল অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

যাবার সময় গোবিন্দ বলে গেল, রাতের খাওয়াটা তার ওখানেই খেয়ে আসতে হবে আমাকে—কোন আপত্তি চলবে না। আমিও এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম শুধু একটা বিষয় পরিষ্কার করার জন্যে। মালিনীর ফটোগ্রাফ দেখার সঙ্গে সঙ্গে অত বিমনা হয়ে গেল কেন সুরমা? যেতে যেতে ব্যাপারটা জানতে হবে। পিসিমার সঙ্গে ওদের কথাবার্তা আছে ন'টায়। দশটার মধ্যেই ফিরে আসবে'খন।

সন্ধ্যে হলো। একা একা ভাল লাগছিল না। গেলাম মালিনীর বাড়িতে। বাড়ি খালি। নিশ্চয় কোথাও বসে আছে একাকিনী। সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম এক জায়গায়। অন্ধকার সৈকতে এখন কেউ নেই। ঢেউয়ের সাদা মাথার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। তন্ময় হয়ে রয়েছি পর পর ঘটে যাওয়া অনেকগুলো গূঢ় ব্যাপার নিয়ে। ভালোবেসে বিয়ে করেছে

সুরমা আর গোবিন্দ। অথচ ওদের সম্পর্কে কোথায় যেন একটা চিড় খেয়েছে—সুরমা পরিহাসছলে বলছে গোবিন্দকে খুন করতে ইচ্ছে যাচ্ছে—মনোবিজ্ঞানীর কাছে কিন্তু এই ধরনের কথার মধ্যেই অবচেতন মনের চেহারা ধরা পড়ে। গোবিন্দর পিসিমা যে সুরমাকে পছন্দ করেন না, তাও স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। সুরমা তু'চক্ষে দেখতে পারে না পিসিমাকে—অথচ পিসিমার সমস্ত সম্পত্তি পাবে তারই স্বামী। সুরমা মালিনীর আদল দেখে প্রথমে কাঠ হয়ে গেছল—পরে ছবি দেখে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মালিনীও ওদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, এখনও পাত্তা নেই। কেন? এরা কি আগে থেকেই চেনে পরস্পরকে? মেয়েদের মন দেবা ন জানন্তি। কেন তুজনে তুজনকে দেখতে পারছে না? মালিনীকে আমি দেখে বুঝেছি তার মত মেয়ে সংসারে বিরল। কিন্তু বিপ্লব বলছে তার স্বামী আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। সে নর্তকী ছিল, অভিনয়কে পেশা করেছিল—জীবিকা করেছিল আরও একটি বিদ্যেকে—

ব্ল্যাকমেলিং! কানের কাছে ফিসফিস করে কে যেন বলল।

দারুণ চমকে উঠে পেছন ফিরলাম। নিঃশব্দে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জগন্নাথ দাস। অন্ধকারেও তারার আলোয় দেখা যাচ্ছে তার কদাকার মূর্তি।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার—আবার এসেছেন! গেট আউট।

মোলায়েম গলায় জগন্নাথ বললে, খ্যামোকা রেগে যাচ্ছেন স্যার। ব্ল্যাকমেলিং চলছে পুরোদমে—বলতে এলাম, অমনি রেগে গেলেন।

গেট আউট।

যাচ্ছি স্যার, যাচ্ছি—কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। আপনার বন্ধু ওই গোবিন্দবাবুকে তো তুয়ে মুসে শেষ করে দিচ্ছে মালিনী পোদ্দার।

গেট আউট !

ব্ল্যাকমেলিং ! ব্ল্যাকমেলিং ! ব্ল্যাকমেলিং ! বলতে বলতে দামাল হাওয়ায় উড়ন্ত শার্ট সামলাতে সামলাতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল জগন্নাথ দাস।

সমুদ্র গর্জনের নিরন্তর হাহাকারে ডুবে গেল ভয়ানক কথাটা। বিপ্লব যেভাবে ফেউ লাগিয়েছে আমার পেছনে, বন্ধু বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

নির্জনে বসে মনের সঙ্গে কথা বলার আমেজটুকুই মাটি করে দিয়ে গেল বিদঘুটে প্রাণীটা। উঠে পড়লাম। যদিও ন'টা বাজতে এখনো অনেক দেরি। তাহলেও আগেভাগে গিয়েই বরং বসে থাকি গোবিন্দর হলিডে হোমে। ওখানে টেলিফোন আছে। বিপ্লবের পিণ্ডি চটকাবো টেলিফোনে।

পান্থনিবাসের পেছনে হলিডে হোমে আলো জ্বলছে দেখলাম দূর থেকে। গোবিন্দ তাহলে আছে।

ঢুকলাম ঘরের মধ্যে। গোবিন্দ বসে আছে সোফায়—পাশে সুরমা। সামনের সোফায় যাকে বসে থাকতে দেখলাম, তাকে এখানে দেখব আশা করি নি।

নির্জন সৈকতে হাফপ্যান্ট পরা প্রায় বৃদ্ধ সেই অস্ট্রেলিয়ান সাহেবটি। চোখ যার নীল, ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই, চোখে মুখে প্রজ্ঞার ছাপ। এখন অবশ্য সাহেবের পরনে হাফপ্যান্ট নেই। আছে ঢিলে পায়জামার মত ট্রাউজার্স আর ঘন নীল রঙের বুশ শার্ট।

আমি ঢুকেই থমকে গিয়েছিলাম। গোবিন্দ সোল্লাসে বললে, আসুন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। আমার শ্বশুরমশাই কর্নেল ম্যালকট। ইনি ডক্টর বাসুদেব সাহা—যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

কর্নেল ম্যালকট দু-হাত তুলে নমস্তে করে আমাকে চমকে দিয়ে

বললেন ভাঙা-ভাঙা বাংলায়—আগেই দেখা হয়েছে আমাদের।

গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বললে, কোথায় ?

আমি নির্নিমেষে দেখছিলাম কর্নেল ম্যালকটকে। মহান পুরুষ! বাল্যবন্ধুর অপঘাত মৃত্যুর পর বন্ধুকন্যাকে মানুষ করার মত মানুষ এ-সংসারে অতি বিরল। কর্নেল ম্যালকটের অনেক কথাই শুনেছি সুরমা আর গোবিন্দর মুখে—আলাপ হয় নি ভদ্রলোক তখন দিল্লিতে ছিলেন বলে।

বললাম, সমুদ্রের ধারে। রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ইয়েস। ইয়েস। বড় নির্জন জায়গা। বড় ভাল লাগে! মিটিমিটি হেসে বললেন কর্নেল।

আমি বললাম গোবিন্দকে: কিভাবে তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু দিল্লি ছেড়ে উনি পুরীতে কি বেড়াতে ?

ও নো।—বললেন কর্নেল, বাড়ি কিনেছি এখানে। শেষ জীবনটা এখানেই থাকব।

রিয়্যালি!—অবাক না হয়ে পারলাম না। পুরীতে আজকাল অস্ট্রেলিয়ানরা যেন বড় বেশি গিজ গিজ করছে। ইউথ হোস্টেল ভরে গেছে অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরিস্টে। কর্নেল ম্যালকট কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল গোবিন্দ—বাসুদা, আপনার কাজ না থাকলে বসে থাকুন। মার্কেটে একটু কাজ আছে—ওখান থেকে পিসিমার বাড়ি যাব নটায়। সুরমা এখান থেকেই যাবে। কর্নেল, আমি এগোই।

উইশ ইউ বেস্ট অফ ইওর লাক।—হাসলেন কর্নেল।

কি বলতে গিয়ে চুপ করে গেল গোবিন্দ। ব্ল্যাকস্টিল সোর্ডের মত বডিখানা বেঁকিয়ে বিদায় নিল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমি, সুরমা আর কর্নেল। তারপর কথাবার্তা জিইয়ে রাখার জন্যেই সুরমা উচ্চকণ্ঠে আবার শুরু

করল আমার গুণকীর্তন। মনের ডাক্তারি করে আমি বিরাট পশার জমিয়েছি নাকি কলকাতায়। কত মানুষ এসে মনের দরজা হুহাট করে দেয় আমার সামনে—মনের ময়লা উপুড় করে দেয় আমার মনের ওপর। নীলকণ্ঠ বাসুদেব সাহা সবার মনকে নির্মল করে দিয়ে বসে থাকে গরলের ভাগটুকু নিয়ে।

সুরমার স্বভাবই এই। যখন যা বলবে, মাত্রা ছাড়িয়ে চলে যাবে। পুব-পশ্চিম স্টাইলে কথা বলা। খুশিতে প্রাণ গড়ের মাঠ হলে যা হয় আর কি।

কর্নেল ম্যালকট কিন্তু আর একটি কথাও বললেন না। শুধু শুনে গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার দেখা হবে।

বেরিয়ে গেলেন কর্নেল। আমি তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। বুঝলাম, এদের তিনজনের মধ্যে যে-কথা হচ্ছিল, তা আর হল না আমার আগমনে, শ্বশুর-জামাই তাই সরে পড়লেন—সুরমা একা বসে রইল অতিথি আপ্যায়ণ করতে।

ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে আটটা বাজে। বললাম, সুরমা, এবার তুমিও এগোও। আমি এখান থেকে একটা ফোন করব।

কাকে?

সত্যি কথা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। বিপ্লবকে ফোন করছি বললেই হাজার প্রশ্ন করে বসবে সুরমা। মালিনী সম্পর্কে অনেক বাজে কথাই বলতে হবে জবাবের মধ্যে। যে মালিনীকে দেখে মুখ রক্তশূন্য করে ফেলে সুরমা, তার সম্বন্ধে কোন কথা তার সামনে নয়।

বললাম, এক বন্ধুকে।

গভীরে প্রবেশ করার মত গভীরতা নেই সুরমার। তাই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ও বললে, তাই করুন। আমি পিসি বুড়ির বকবকানি শুনেই চলে আসব।—বলে, শিস দিতে দিতে হাওয়ায় শ্যাম্পু করা ঘাড়-ছাঁটা চুল উড়িয়ে বেরিয়ে গেল সুরমা।

সেকেণ্ড কয়েক বসে রইলাম চুপচাপ।

এরা তিনজনে কি কথা বলছিল জানি না, কিন্তু বিষয়টা যে গোপনীয় তাতে সন্দেহ নেই। পিসিমাও কি বলতে এসে আমি থাকার বলতে পারে নি—এদের বাড়িতে যেতে বললেন। সেখানে যাওয়ার আগে এলেন কর্নেল ম্যালকট। গোপনীয় কথা আমার সামনেও বলা গেল না। বিষয়টা এক নয় তো? যে বিষয় নিয়ে পিসিমা ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই নিয়ে কর্নেল ম্যালকট এসেছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে? কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে পিসিমার সম্পর্ক কী?

পকেট থেকে মালিনীর বি-টু এনলার্জমেন্টখানা বার করে রাখলাম টেবিলের ওপর। আমার সামনে এরা কেউ মনের কথা বলতে চায় না। অথচ দীর্ঘদিনের পরিচয় ওদের সঙ্গে—কর্নেল ছাড়া। কিন্তু মালিনী স্বল্পক্ষণের আলাপেই মন উজাড় করে দিয়েছিল আমার কাছে। মালিনী আমাকে বিশ্বাস করেছে—অকপট হয়েছে। এরা কপট সৌজন্যতা বজায় রেখে চলেছে।

তিক্ত হয়ে গেল মনটা। লো টেবিলের ওপর ফটোখানা রেখে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা নিয়ে এলাম ফোনের পাশ থেকে। পাতা উল্টে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফোন নাম্বার খুঁজছি, এমন সময় জুতোর শব্দ হল দোরগোড়ায়। চোখ তুলে দেখলাম গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকছেন কর্নেল ম্যালকট।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। অবাক হলাম তাঁর সহসা আবির্ভাব দেখে নয়—তাঁর মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সমুদ্রের তীরে আত্মনিমগ্ন চোখে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার পানে চেয়ে থাকার সময়েও মুখে যে হাসি দেখেছি—কিছুক্ষণ আগে এই ঘরেও যে স্মিত হাসির রেশ ঠোঁটের প্রান্তে দেখেছি—এখন তার লেশমাত্র নেই চোখে মুখে। মানুষটা যেন অকস্মাৎ আর এক মানুষ হয়ে গেছেন। গম্ভীর, গভীর, বিষণ্ণ।

ম্লান চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আসতে পারি ?

সুরমা তো বেরিয়ে গেল।

জানি।

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন ?

হ্যাঁ। দেখেই তো এলাম। বলতে বলতে এসে আমার উল্টো দিকের সোফায় ধপ করে বসে পড়লেন কর্নেল : অবাক হচ্ছেন ?

তা হচ্ছি।

দরকারটা আপনার সঙ্গে, ডাক্তার।

আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ. মুখের ওপর হাত চালিয়ে নিলেন কর্নেল—সুরমা তো বলল, আপনার কাছে সবাই এসে মনের ময়লা সাফ করে যায়—আমি এসেছিলাম আমাকে দেখাতে।

কি হয়েছে আপনার ?

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। আমি বিপত্নীক, নিঃসন্তান। সংসারধর্মে আর আকর্ষণ নেই। কিন্তু ডাক্তার, আমি যা বলব, কথা দিন কাউকে বলবেন না ?

অবান্তর কথা বলছেন, কর্নেল। আমার পেশায় কারো কথা কাউকে বলার নিয়ম নেই।

সুরমার কাছেও বলতে পারবেন না—কথা দিন।

বিরক্ত হলাম—কথা দিলাম।

ঠিক এই সময়ে ক্রিং ক্রিং করে বাজল টেলিফোন। যাদের টেলিফোন, তারা কেউ বাড়ি নেই। তাদের শ্বশুরমশাইও টেলিফোন যন্ত্রের মুখরতায় বিলক্ষণ বিচলিত। যেন বিশেষ একটা সুরে মন-বীণার তার বেঁধে এনেছিলেন—হঠাৎ বিরস যন্ত্রের ঝনঝনানিতে তার ছিঁড়ে গেল। টেলিফোন যন্ত্রের দিকে হাতও বাড়ালেন না। বার-কয়েক ক্রিং ক্রিং হয়ে যাওয়ার পর তাই আমি উঠে গিয়ে কর্নেলের

পেছনে দাঁড়িয়ে রিসিভার তুললাম। কর্নেল একই রকম বিরসবদনে চেয়ে রইলেন সামনের লো-টেবিলের দিকে।

রিসিভারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল একটা আর্ত চিৎকার।

বাসুদা, বাসুদা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি। তুমি কে?

সুরমা—সুরমা বলছি। খুন, বাসুদা, খুন।

খুন।

জুতোর শব্দে চমক ভাঙল। ঘর থেকে বেগে উধাও হয়ে যাচ্ছেন কর্নেল ম্যালকট। দৌড়ে পালিয়ে গেলেন মনে হল।

কান্না জড়ানো গলায় সুরমা চিৎকার করে বলল, খুন! খুন! পিসিমা খুন হয়ে গেল।

কি বলছো সুরমা? কে খুন করল?

সে—সে—যার ফটো দেখালেন আমাকে···

মালিনী!

নাকঝাড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ হল দোরগোড়ায়। রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকছে জগন্নাথ দাস।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আবাগীর বেটি!···

কনভেন্টে শিক্ষিতা মেয়ের মুখে কি চমৎকার বিশেষণ! জগন্নাথ দাস ফোঁৎ-ফোঁৎ করে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ে আছে আমার দিকে। তীক্ষ্ণ চাহনি।

বললাম, সুরমা, আমি আসছি। ঠিকানা কী?

ঠিকানা বলে গেল সুরমা। শুনলাম এবং মনে মনে মুখস্থ করে নিলাম। মুখে উচ্চারণ করলাম না পাছে জগন্নাথ শুনে নেয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে বললাম, আবার কেন এসেছেন?

আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ড যে হেদিয়ে গেল।

শাট আপ! গেট আউট!

দরজার কাছ থেকে মালিনী বললে, ওঁকে অমন করছেন কেন?

আমি আপনার বাড়ি গেছিলাম। এই ভদ্রলোক এসে বললেন, ডাক্তারবাবুকে খুঁজছেন তো? উনি তো মিটিং করছেন। যাবেন? বলে আমাকে নিয়ে এলেন।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম—মালিনী…আ-আপনি।

কি হয়েছে? অমন করছেন কেন?

নিরীহ স্বরে জগন্নাথ বললেন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনে ফেলেছি কি হয়েছে। আপনাকে নিয়ে এলাম মিটিংয়ের মাঝে আপনাকে হাজির করে সবার চোখ খুলে দেবো বলে। কিন্তু তার আগেই দেখছি চোখ খুলে গেছে ডাক্তারবাবুর।

কি বলছেন? মালিনী বিমূঢ়।

আমি বললাম, আমাকে খুঁজছেন কেন?

মালিনী বলল, এমনি।

ফোঁৎ ফোঁৎ করে আবার নাক ঝেড়ে জগন্নাথ বলল, কেস খুব সিরিয়াস। এখুনি একটা খুন হয়ে গেল।

খুন!—মালিনী মনে হল টলে পড়ে যাবে।

স্কাউণ্ড্রেল জগন্নাথ কিন্তু তা দেখেও দেখল না। রুমাল শুদ্ধ হাত মাথায় তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, কিন্তু মিস্ত্রী কি জানেন—খুন যিনি করলেন, তিনি তো আমার সঙ্গেই রয়েছেন।

দরজার পাল্লা ধরে মালিনী সামলে নিল। দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। পর মুহূর্তেই 'না-না-না-না' বলতে বলতে দু-পা পিছু হঠেই পেছন ফিরে দৌড়ে নেমে গেল রাস্তায়।

প্রবল ইচ্ছে হল ঠাস করে একটা চড় মারি জগন্নাথকে। মেরেই বসতাম, তার আগেই শশব্যস্ত হয়ে জগন্নাথ বললে, চলুন। চলুন! মার্ডারটা দেখে আসি?

জগন্নাথ পুরীর বাসিন্দা। রাস্তাঘাট চেনে। তাই মারধর করার ইচ্ছেটা শিকেয় তুলে ওর সঙ্গেই এসে পৌঁছলাম পুরীর মন্দিরের

অনতিদূরে একটা দোতলা বাড়িতে। নিরালা বাড়ি—রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে। জগন্নাথ সঙ্গে না থাকলে চিনে বার করতে মুস্কিল হত।

একতলায় উদভ্রান্তের মত বসেছিল সুরমা। বিস্রস্ত চেহারা। যতই সাহেবিয়ানা থাকুক, স্বচক্ষে খুন দেখলে খুব কম মেয়েই স্থির থাকে।

কি হয়েছে, সুরমা?

আমি বাড়িতে পা দিতে না দিতেই শুনলাম পিসিমা চেঁচাচ্ছেন, তুই ডাইনী! তুই বেশ্যা! তুই কুলটা! গলা চিরে সে কি চেঁচানি! শুনেই কাঠ হয়ে গেলাম। তার পরেই আবার চেঁচিয়ে উঠল পিসিমা—মেরে ফেললে! মেরে ফেললে! অঁ-অঁ আওয়াজ শুনেই হুদ্দাড় করে ওপরে দৌড়েছিলাম। দোতলায় উঠেই পিসিমার ঘরের মধ্যে দেখলাম সাদা শাড়ি পরা একটা মেয়েছেলে গলা টিপছে পিসিমার। আমাকে দেখেই মেয়েটা পিসিমার গলা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমিও দৌড়লাম পেছন পেছন। পেছনের দরজা খোলা দেখলাম—মেয়েটাকে আর দেখলাম না।

হাঁপাতে লাগল সুরমা।

জগন্নাথ নোটবই বার করে দ্রুত নোট করছে দেখে বললাম, মেয়েটাকে তুমি চিনতে পেরেছো?

বললাম তো সেই মেয়ে—যার ফটো দেখালেন।

খকখক করে হেসে উঠে জগনাথ বললে, মালিনী পোদ্দার।

আমি আর দাঁড়ালাম না। দৌড়ে উঠে গেলাম দোতলায়। সামনের ঘরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন গোবিন্দর পিসিমা। হেঁট হয়ে নাড়ি দেখলাম। মারা গেছেন।

পেছনের দরজাটা হু-হাট করে খোলা দেখে বেরিয়ে গেলাম সেই দরজা দিয়ে। সামনেই একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা

দরজার সামনে। দরজায় খিল তোলা ভেতর থেকে। খিল খুললাম। সামনে বাগান। অনেক পেছনে পুরীর মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

ফিরে এলাম বাড়ির ভেতর। সামনের সদর দরজায় যাওয়ার পথ দোতলা দিয়ে—আর পথ নেই। তাই দোতলায় উঠে এলাম। পিসিমার ডেভবডির পাশ দিয়ে সামনের গলিপথে এসে দেখলাম একটা সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে সদর দরজার সামনে একতলার ঘরে, আর একটা সিঁড়ি গলিপথের কোণ থেকে নেমে শেষ হয়েছে বাড়ির একদম বাইরে। রাস্তার ওপর। দরজাটা হু-হাট করে খোলা।

এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। এদিক ওদিকে দেখলাম। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক।

ফিরে এলাম দোতলায়। নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে একতলার ঘরে। গোবিন্দকে দেখলাম ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। সুরমা চোখের জলে গাল ভাসাচ্ছে আর বলছে এইমাত্র কি ঘটে গেল। দ্রুত নোট নিচ্ছে জগন্নাথ।

আমি বললাম, জগন্নাথবাবু, আপনি এবার বিদেয় হোন।

বিদেয় হবো! সে কী স্যার! বডি না দেখেই—

অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন। বিপ্লবকে খবর দিন। যান।

আমার কণ্ঠস্বর শুনেই নোটবই আর ডটপেন পকেটে পুরে ফেলল জগন্নাথ। বুঝল, অন্যথা হলে পরিণামটা ভাল হবে না। ও বেরিয়ে যেতেই আমি সুরমাকে বললাম, তুমি দেখেছিলে মেয়েটাকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—

পাশের দরজা দিয়ে নয়?

না, না, না—

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তুমি বাড়ির মধ্যে এসে

দরজা বন্ধ করেছিলে ?

না, না, না—

তাহলে পেছনের দরজার ভেতর দিয়ে খিল তোলা কেন, সুরমা ?

থতমত খেয়ে চেয়ে রইল সুরমা।

আমি বললাম, আমি নিজে গিয়ে দেখে এলাম, পেছনের দরজায় খিল বন্ধ। তার মানে তুমি যা বললে, তা সত্যি নয়। ও দরজা দিয়ে কেউ বেরোয় নি।

সুরমা তেড়ে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল, গোবিন্দ থামিয়ে দিয়ে বললে, বাসুদা, সুরমা সত্যিই বলেছে। দরজা খোলাই ছিল।

তুমি কি করে জানলে ?

আমি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলাম। খিল তুলে দিয়ে ওপরে উঠেই পিসিমার ডেডবডি দেখে ভয় পেয়ে যাই। ঠিক সেই সময়ে শুনলাম, একতলায় কাঁদতে কাঁদতে সুরমা কি যেন বলছে। একটু নামতেই দেখলাম আপনাকে আর ওই লোকটাকে। পুলিশের লোক বলেই মনে হল। তাই আপনাদের সামনে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ঠিক হবে না মনে করে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম।

বললাম, তাহলেও বলব সুরমা মিথ্যে বলছে।

কী মিথ্যে ? ঝাঁঝিয়ে উঠল সুরমা।

তুমি যখন ফোনে বললে মালিনী খুন করেছে পিসিমাকে—ঠিক সেই সময়ে মালিনী দাঁড়িয়ে আছে তোমারই বাড়ির সামনে। তারও আগে ছিল ওই পুলিশের লোকটার সঙ্গে। সুতরাং সে খুন করে নি।

থেমে থেমে গোবিন্দ বললে, তাহলে কি আপনি বলতে চান—

আমি এখন কিছুই বলতে চাই না, গোবিন্দ। কিন্তু আমি বাঁচাতে চাই দুটি নারীকে। সুরমাকে বাঁচাতে চাই সে আমার বোন বলে—মালিনীকে বাঁচাতে চাই,—বলে গলা সাফ করে নিয়ে শেষ করলাম, সে আমার ভাবী বধূ বলে।

তবুও কিন্তু গলাটা সাফ হল না—শেষের দিকে বুজে এল।

বিপ্লবকে নিয়ে জগন্নাথ দাস ফেরে ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে। সঙ্গে একপাল পুলিশের লোক। ডেডবডি নিয়ে তারা ব্যস্ত রইল ওপরের ঘরে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট সারা বাড়ি তোলপাড় করে ফেলল আঙুলের ছাপের অন্বেষণে। ফোটোগ্রাফার কত ফটো যে তুলল, তার ইয়ত্তা নেই।

জগন্নাথ দাস আর বিপ্লব একতলার ঘরে বসে জেরায় জেরায় কাহিল করে তুলল সুরমাকে। মালিনী পোদ্দারকে সে স্বচক্ষে দেখেছে পিসিমাকে মেঝেয় ফেলে বুকে বসে গলা টিপে ধরে থাকতে। না, তার কোন সন্দেহই নেই এই ব্যাপারে। চোখের ভুল? অসম্ভব! ডাক্তার বাসুদেব সাহার কাছে ফটোগ্রাফ দেখেছে মালিনী পোদ্দারের —তারও আগে দেখেছে ডাক্তার বাসুদেব সাহার ঘর থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে। কাজেই ভুল তার হয় নি—হতে পারে না। মালিনীই খুন করে গেছে তার পিসিমাকে। কেননা, পিসিমা তাকে ডাইনী, বেশ্যা এবং কুলটা বলে গালাগাল দিয়েছিল—স্বকর্ণে শুনেছে সুরমা। শুনেই তো ওপরে দৌড়ে গিয়েছিল সে। গিয়েও বাঁচাতে পারে নি পিসিমাকে, পাকড়াও করতে পারে নি মালিনী পোদ্দারকে, হরিণীর মত তিন লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, পেছনের দরজা দিয়ে উধাও হয়েছে সে। দরজা খোলাই ছিল—গোবিন্দ খোলা দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় নিজের হাতে। বন্ধ দরজা দেখেছেন বাসুদেব সাহা। পিসিমার সঙ্গে সুরমার সম্পর্ক কিরকম ছিল? অম্লমধুর। কেননা পিসিমা বড্ড বেশি শাশুড়িগিরি ফলাতেন সুরমার ওপর। সেকালের মানুষ তো, একালের মেয়েদের বেহায়াপনা দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে না করলে কখনোই সুরমাকে তিনি বিয়ে করতে দিতেন না। তাই বলে গোবিন্দকে

তিনি তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতেও চান নি। অগাধ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশনকে—দুই তৃতীয়াংশ গোবিন্দকে। রাত ন'টায় এই সব কথা বলবার জন্যেই বোধ হয় তিনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন ভাইপো আর ধিঙ্গি বউকে। সেই সঙ্গে সুরমাকে অন্তর টিপুনি দিয়ে কিছু জ্ঞানও দিতেন।

সংক্ষেপে, এই হল সুরমার জবানবন্দী। ঘণ্টাখানেক জেরার সারবস্তু। বিপ্লব সব শুনে বলেছিল—পিসিমার মৃত্যুতে কার লাভ বেশি? গোবিন্দ মুখ কালো করে বলেছিল—আমার। জানি আমাকেই বেশি সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি খুন করতে যাব কেন? সম্পত্তি তো আমি পাচ্ছিই। উইলও পাল্টান নি। তাছাড়া, উনি যখন খুন হন, আমি তখন যে ডীলারের সঙ্গে গল্প করছিলাম, তাকে আপনাদের সামনে হাজির করব'খন কাল সকালে।

বিপ্লব তখন বলেছিল, ছি-ছি, এসব কি বলছেন? আপনাকে আমি সন্দেহ করতে যাব কেন? আমি জানতে চাইছিলাম, পিসিমাকে গলা টিপে মেরে লাভটা কার বেশি?

গোবিন্দ এবার শক্ত গলাতেই বলল, বলছি তো আমার। কিন্তু পিসিমা মরার আগে কুলটা, বেশ্যা, ডাইনী বলে যাকে গালাগাল দিচ্ছিলেন, সে নিশ্চয় আমি নই।

বিপ্লব আর এক প্রস্থ 'ছি-ছি' করে বলেছিল, বারবার আপনি সেই একই ভুল করছেন গোবিন্দবাবু। লাভ বলতে সব সময়ে যে টাকাকড়ির লাভ হয়, তা তো নয়। অনেকরকম ভাবেই একজন মানুষ লাভবান হতে পারে আর একজনের মৃত্যুতে। মালিনী পোদ্দারের কোন লাভ আছে কি পিসিমাকে খুন করে?

সেটা বার করাই তো আপনাদের কাজ!—চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিল গোবিন্দ।

এবং সেটা আমরা বার করব, নিশ্চিন্ত থাকুন।—এবার একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বলেছিল বিপ্লব, কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?

কোথায় ?

মালিনী পোদ্দার যে ধোয়া তুলসী পাতা নয়, সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু এই কেসে তাকে আমরা জড়াতে পারছি না। কারণ, আপনার পিসিমা যে সময়ে খুন হয়ে গেলেন, ঠিক সেই সময়ে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছিলেন ইনি—। বলে জগন্নাথ দাসকে দেখালো বিপ্লব।

পান চিবুতে চিবুতে জগন্নাথ বললে নির্লিপ্ত স্বরে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি অন্তত এই কেসে মালিনী পোদ্দারের স্বপক্ষে সাক্ষী দেবো কোর্টে। উনি নির্দোষ। খুন উনি করেন নি—করেছে অন্য কেউ।

গোবিন্দির স্নায়ু আর সহ্য করতে পারল না। রেগে গিয়ে বললে, ঘুরে ফিরে সেই আমাকেই সন্দেহ করা হচ্ছে।

মুঠোর ওপর চিবুক রেখে বিপ্লব বললে ঠাণ্ডা গলায়, রেগে গেলে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন, গোবিন্দবাবু। আমরা প্রথম পর্যায়ে সবাইকেই সন্দেহ করব—আপনার স্ত্রীকেও। দ্বিতীয় পর্যায়ে তদন্ত ফলের ভিত্তিতে একে-একে নির্দোষীদের বাদ দেব। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করব। আপনারা স্বামী-স্ত্রী এখন প্রথম পর্যায়ে। তাই বলছিলাম, রাগ করবেন না। আমাদের সন্দেহকে খুঁচিয়ে শক্ত করে দেবেন না।

আমি গলা খাঁকারি দিলাম। বিপ্লব বললে, কিছু বলবি, বাসুদেব ?

হ্যাঁ। প্রথম পর্যায়ের সন্দেহভাজনদের ফর্দ থেকে তাহলে মালিনী বাদ গেল তো ?

সতর্ক দৃষ্টি হেনে বিপ্লব বললে, হ্যাঁ।

তাহলে আমি তার সঙ্গে মেলামেশা চালিয়ে যেতে পারি তো ? পেছনে টিকটিকি ঘুরবে না ?

ঘুরবে।—ফোঁস করে উঠল রোগা বেঁটে বিপ্লব। মাথার সব চুল উঠে গেছে বলেই বিরলকেশ মস্তকে হাত বলানো ওর ব্যায়রামে

দাঁড়িয়ে গেছে। মস্তক এবং শীর্ণ দীর্ঘ নাসিকার অগ্রভাগ কণ্ডূয়ন করে নিয়ে বললে ছোটলোকি গলায়, আর লোক হাসাস নি বাসু। ঢি-ঢি পড়ে যাবে সমাজে। এই খুনে মালিনী জড়িত না থাকতে পারে—শুধু যে অন্যত্রস্থিতিই জোরদার, তা নয়—মালিনী পোদ্দারের সঙ্গে পিসিমার আগেভাগে কোন যোগাযোগই যে ছিল না, সে খবরও আমাদের কাছে আছে। তাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছিল এই কারণেই, যাতে আবার কাউকে ব্ল্যাকমেল করতে না পারে।

মালিনী পোদ্দার ব্ল্যাকমেল করে নাকি? তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুরমা।

করে বৈকি। বোম্বাইয়ের ফিল্মওয়ার্লডে মালিনী পোদ্দারের বছর পাঁচেক আগেও বিলক্ষণ নাম-ডাক ছিল নর্তকী এবং এক্সট্রা অ্যাকট্রেস হিসেবে। গোয়াতে প্রথম ভাব হয় মুকুন্দ গোয়েঙ্কার সঙ্গে। ব্যাচেলর মুকুন্দ স্মরণীয় সম্মান দিতে চেয়েছিল মালিনীকে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে মালিনী তাকে দোহন করতে শুরু করে নিজেরই কয়েকটা ফটো তার কাছে পাঠিয়ে। ফটোগুলো সে নাকি পাঠিয়ে দেবে মুকুন্দর আত্মীয়স্বজনের কাছে। অবশ্য এক লাখ টাকা পেলে সে ছেড়ে দেবে মুকুন্দকে। নইলে আত্মীয়স্বজনের কাছে মাথা হেঁট করে ছাড়বে মুকুন্দর।

কিসের ফটো? সুরমা উদগ্রীব। আমিও।

ব্লু ফিল্মের।—আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল বিপ্লব। নোংরা ফিল্মে চূড়ান্ত নোংরামির অভিনয়। কদর্য এবং ভয়াবহ। সে সব ছবির বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়—দেখলেও পাপ। মালিনীর সেই ছবি দেখে মুকুন্দ এক লাখ টাকা দেয় মালিনীকে। কিন্তু মালিনী আজও তাকে ছাড়ে নি—খেপে খেপে টাকা আদায় করে যাচ্ছে। মুকুন্দ একটা ভুল করেছিল। গোয়ার সী বীচে মালিনীর সঙ্গে অনেকগুলো ফটো তুলে ফেলেছিল। আমার বন্ধু ডাক্তার বাসুদেব সাহা সেই একই ভুল করে ফেলেছে পুরীর সমুদ্রতীরেও—

নাম-ডাক আছে কলকাতায়—ব্ল্যাকমেলিং আরম্ভ হল বলে। কাজেই মালিনী পোদ্দারকে আমরা ছাড়ছি না।

আমি বললাম, সাধু, সাধু, সাধু। হে সমাজসেবী বিপ্লব, একটা প্রশ্ন তাহলে করা যাক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

হোক, প্রশ্ন হোক।

মুকুন্দ গোয়েঙ্কা নামক গাড়লটি কি মালিনীর হাতে টাকা দিয়েছিল ?

না। মালিনীর লোক এসে নিয়ে গেছে।

ফার্স্ট ক্লাশ। মালিনীর ব্লু-ফিল্ম ফটোগ্রাফ কি মালিনী নিজের হাতে দিয়েছিল মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে ?

না, পোস্টে এসেছিল।

আরো ফার্স্ট ক্লাশ। কোন প্রমাণ আছে কি যে মালিনীর হাতে মুকুন্দ গোয়েঙ্কার টাকা পৌঁছেছে ?

না, মানে—

ব্যস, আর কোন কথা নয়। মালিনীকে তাহলে কি ব্ল্যাকমেলার বলা যায় ?

টেকনিক্যালি বলা যায় না। কিন্তু ফটোগুলো তো—

আর কোন কিন্তু নয়। ফটো যাই থাক না কেন, মালিনী নিজে যখন টাকা নেয় নি, তখন সে ব্ল্যাকমেলার নয়। একজন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ দেওয়াটা পুলিশী রুচিতে সম্ভব—ভদ্রসমাজে অন্যায়। আমি কিন্তু লিগ্যাল স্টেপ নেব, কারণ মালিনী আমার ভাবী বউ।

ননসেন্স।—রেগে গেল বিপ্লব, মালিনীর আগের স্বামী প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দার সুইসাইড করল কেন জানিস ?

শুনতে আপত্তি নেই।

একই রকম ব্লু-ফিল্ম ফোটোগ্রাফ প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দারের কাছেও পৌঁছেছিল। ভদ্রলোক ফিল্মের মেয়ের জৌলুষে ভুলেছিলেন।

বিয়ের পর পর সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশও করেছিলেন মালিনীকে। তারপরেই এসে পৌঁছলো ফটো আর লাখ টাকার দাবী।

কে পাঠালো? মালিনী?

আমতা আমতা করে বিপ্লব বললে, সেরকম প্রমাণ আমরা এখনও পাই নি। আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এই: মালিনীর কৌশলই হল কাউকে দিয়ে ফটো আর ব্ল্যাক-মেলিংয়ের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর—

আমি বললাম, এবার আমি ননসেন্স বলব। কোন সেন্স নেই তোর কথার মধ্যে। যে মেয়ে স্বামীর সম্পত্তি পাবেই, সে কখনো নিজের কলঙ্কিত অতীতের ছবি স্বামীকে পাঠিয়ে তার মন ভেঙে দেয়? টাকা চেয়ে সোনার হাঁসকে মারতে চায়? ননসেন্স! ননসেন্স! ননসেন্স!

মরিয়া হয়ে বিপ্লব বললে, নো, নো, দেয়ার ইজ সেন্স ইন ইট। মালিনীর মোডাস অপারেনডি সরল অথচ বুঝতে না পারার জন্যে জটিল মনে হয়। সে স্বামীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল যাতে পুরো সম্পত্তিটা হাতে পেলে ফুর্তি করতে পারে সারা জীবন।

ননসেন্স! মেয়েরা ঘর বাঁধতে চায়—ভাঙতে চায় না। তাছাড়া, তার মধ্যে যে সন্ন্যাসিনীর পবিত্রতা আর বৈরাগ্য লক্ষ্য করেছি, তাকে ফুর্তি করা বলা যায় না। অন্তর্দৃষ্টি তোর কবে জাগবে বিপ্লব?

টেবিলে দমাস করে ঘুসি মেরে আর নাকের ডগা আর মাথায় টাক চুলকোতে চুলকোতে চিলের মত চেঁচিয়ে বিপ্লব বললে, তুই মরেছিস, বাস্থ, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে টকাস টকাস করে ডালার ওপর টোকা মারতে মারতে বললাম, নস্যি নেওয়াটা প্র্যাকটিশ কর, বিপ্লব। ব্রেন খুলে যাবে। তোর কথা থেকেই আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি, তা এই: কোন এক ব্যক্তি মালিনীর ব্লু-ফিল্ম ছবি

পাঠিয়ে মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে ব্ল্যাকমেল করেছে এবং এখনও করছে, প্রাণকৃষ্ণ পোদ্দারকে সেই একই পন্থায় দোহন করতে গিয়ে তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে, সম্ভবত পিসিমাকেও ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল বলে উনি আজ গোবিন্দ আর সুরমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরামর্শ করার জন্যে। পিসিমার সম্পত্তির ওয়ারিশ গোবিন্দ। মিস্টিরিয়াস এই ব্ল্যাকমেলারের মোডাস অপারেনডি হল কোন পুরুষের নামে কলঙ্ক লেপন করার হুমকি—এ ক্ষেত্রে পুরুষ গোবিন্দ স্বয়ং। তার নামে কুৎসা রটনার ভয় দেখালেই মুখবন্ধ করার জন্যে পিসিমা এনি অ্যামাউন্ট দিতে চাইবেন।

ননসেন্স।—তেড়ে উঠল বিপ্লব, গাল্পগল্প অনুমান সিদ্ধান্ত ফিকশানে মানায়—বাস্তবে নয়। যে ব্ল্যাকমেকার মুকুন্দ আর প্রাণকৃষ্ণকে ভয় দেখিয়েছে, সেই একই ব্ল্যাকমেলার পিসিমাকে ভয় দেখাতে আসবে, এই উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসছে কি করে?

আসছে সুরমার জবানবন্দী শোনবার পর।—গম্ভীর গলায় বললাম আমি, সে দেখেছে মালিনীকে পিসিমার গলা টিপে ধরে থাকতে। মিথ্যে সে নিশ্চয় বলছে না। অথচ জগন্নাথ দাস ঠিক সেই সময়ে মালিনীর সঙ্গে ছিল অন্যত্র। তাহলে কাকে দেখেছে সুরমা?

মালিনী পোদ্দারের ছায়াকে।—ব্যঙ্গের সুরে বললে বিপ্লব।

রাইট ইউ আর, আমিও তাই বলতে চেয়েছিলাম। সুরমা দেখেছে এমন একজনকে যে মালিনীর ছায়ার সামিল। অর্থাৎ নকল মালিনী বলেই তাকে মনে হতে পারে। হয় সে মালিনীর যমজ বোন অথবা মালিনীর মত দেখতে অন্য কোন মেয়েছেলে।

ঘর নিস্তব্ধ। গোবিন্দ, সুরমা, জগন্নাথ, বিপ্লব—প্রত্যেকের মুখের দিকে একে একে চাইলাম। প্রত্যেকেরই চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চোখ গোল-গোল হয়ে গেছে।

আমি উঠতে উঠতে বললাম, এই অনুমান সিদ্ধান্ত থেকেই ব্লু-

ফিল্ম ফটোর মিস্ত্রীও সলভ করা যায়। ফটোগুলো আদৌ মালিনীর নয়—ভ্রষ্টা সেই মেয়েছেলেটির। ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে হয়কে নয়, নয়কে হয় করা যায়—ক্যামেরা ট্রিকসের এই যাদু দিয়ে মালিনীর মতই দেখতে একটি মেয়েকে মালিনী বলে চালিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন কাজ? বিশেষ করে বোম্বাইতে। যেখানে জাঁদরেল ক্যামেরাম্যান ট্রিক-শটয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে দেশময়? সুতরাং আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই—মালিনী আধোয়া তুলসীপাতা—ওর মধ্যে কোন মালিন্য নেই—যা কিছু আছে তা তার মধ্যে, আর এই লোকটার মধ্যে।—বলে তর্জনি সঙ্কেতে দেখালাম জগন্নাথ জীবটিকে।

সাততাড়াতাড়ি বললে বিপ্লব, যাচ্ছিস কোথায়?

মালিনীর কাছে। তার মুখেই শুনতে চাই এরকম কোন মেয়েছেলের সন্ধান সে রাখে কিনা।

লাফিয়ে উঠে বিপ্লব বললে, দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও যাব তোর সঙ্গে।

কিন্তু মালিনীকে তার ভগ্ন ইষ্টকালয়ে পাওয়া গেল না। ঘরে তালা ঝুলছে। রাত তখন এগারোটা। এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা করে বিপ্লবের কাছ থেকে একটুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে টর্চের আলোয় লিখলাম:

মালিনী,

তোমার নামে সমস্ত মিথ্যে কলঙ্ক আমি মুছে দেব। শুধু একটা খবর তোমার মুখেই শুনতে চাই। তোমার মত দেখতে অন্য কোন একটি মেয়েকে তুমি চেনো? কাল সকালে ছটায় আসব। বাড়িতে থেকো। ভয় নেই—আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কাল সকাল ঠিক ছটায়। ইতি—

তোমার ভাবী স্বামী

বাসুদেব

চিঠিখানা দরজার কড়ায় রুমাল দিয়ে বেঁধে রেখে চলে এলাম বাড়িতে।

পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় বিপ্লব এল আমার বাড়িতে। দুজনে গেলাম মালিনীর বাড়িতে। দরজা ভেজানো রয়েছে। খাটের ওপর ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে মালিনী। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজে মোড়া যেন একটি দেবীমূর্তি।

আমাদের পায়ের শব্দ এবং গলা খাঁকারিতেও মালিনী পাশ ফিরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল না। টেবিলের ওপর তালা চাপা একটা চিঠি দেখলাম।

প্রিয়—

তুমি যাকে চেয়েছিলে. তাকে এবার পাবে। সে আমার বোন, মোহিনী। আমার জীবন বিষময় করে তুলেছিল মোহিনী। আমার সুখ সে দেখতে পারে নি। ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরেছে, নিজের কুকীর্তির ছবি পাঠিয়ে আমার একটা বিয়ে হওয়া ভেঙেছে, আর একটা বিয়ের পর স্বামীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। এখানেও সে আমার পেছন পেছন এসেছে! সে আমার জীবনের দুষ্টগ্রহ। আমি একা থাকতে চাই এই কারণেই—কারও জীবনে অভিশাপ হয়ে ঢুকতে চাই না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে ভুলে যেও। আজ যা ঘটে গেল, এরপর আমার বেঁচে থাকবার ইচ্ছেও আর নেই। আমি আর পারছি না সহ্য করতে—আর পারছি না। চললাম। ইতি—

তোমার

মালিনী

চিঠিখানা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলাম। বিপ্লব একদৃষ্টে চেয়ে আছে ঘুমন্ত মালিনীর পিঠের দিকে। আমিও তাকালাম সেদিকে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে এলোখোঁপার তলায়।

খাট ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম মালিনীর সামনে।

না, মালিনী নয়। তারই মত কোঁকড়া চুল, শ্যামল কান্তি—কিন্তু সে মালিনী নয়। মোহিনী। যমজ বোন।

মোহিনীর কপালে এতটা বুলেটের ফুটো। রক্ত জমে গেছে চারপাশে।

বিপ্লব যখন হেঁট হয়ে দেখছে মোহিনীকে, আমি তখন ঘরের জিনিসপত্র দেখে নিলাম। মালিনীর স্যুটকেশ যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে। মানিব্যাগ পর্যন্ত রেখে গেছে। দড়িতে সাদা শাড়ি আর ব্লাউজ ঝুলছে। পায়ের জুতো টেবিলের তলায় রয়েছে। স্যুটকেশ না নিয়ে খালি পায়ে মালিনী চলে গেছে। কোথায়? কোথায় যেতে পারে সে নগ্ন পদে? মানিব্যাগ সঙ্গে না নিয়ে স্যুটকেশ ফেলে রেখে সমুদ্র সৈকতে তার যাবার পথ কোন দিকে?

উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে এলাম বাইরে। বালির ওপর অনেক পায়ের দাগ। কিছু দূরেই সমুদ্র। রাত্রে জোয়ারের জল সরে গেছে। ভিজে মসৃণ বালুকাতটে অজস্র গর্ত দিয়ে কাঁকড়ার দল উঁকি মেরে যেন সকৌতুকে লক্ষ্য করছে আমাকে। জলে ভেসে আসা ঝিনুক পড়ে আছে বিস্তর।

মোলায়েম পেলব বালুকাতটের ওপর দিয়ে শুধু একজোড়া পায়ের ছাপ জলের দিকে এগিয়ে গেছে। ছোট পদচিহ্ন—জলের মধ্যে নেমে গেছে, আর উঠে আসে নি।

কিছু দূরে একটা ভেজা রুমাল। আমার। রুমাল অল্পস্বল্প জল এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—নিয়ে যেতে পারছে না।

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম। জোরালো হাওয়া মিতালী পাতিয়ে গেল আমার দু'চোখের দু' বিন্দু লোনা অশ্রুর সঙ্গে।

আমার প্রথম ভালোবাসা হারিয়ে গেল জলের মধ্যে। পেছন থেকে কাঁধে হাত রাখল বিপ্লব। বলল গাঢ় কণ্ঠে, বান্ধু, আমাকে ক্ষমা কর।

করলাম।

খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে মালিনী পোদ্দার—এই মর্মে পরের দিনই দৈনিকে খবর বেরিয়েছিল, চোখে পড়ে থাকবে আপনাদের। মোহিনী খুন করেছে গোবিন্দর পিসিমাকে, মোহিনীকে খুন করে সমুদ্রে নেমে গেছে মালিনী। ব্যস, মিটে গেল। কেস চাপা পড়ে গেল।

পুলিশ অবশ্য পুরীর একটি বিখ্যাত হোটেলের সিঙ্গলরুমে মোহিনীর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র খুঁজে পেয়েছিল। পাওয়া গিয়েছিল ব্লু-ফিল্ম নেগেটিভ এবং প্রিণ্ট, ব্ল্যাকমেলিংয়ের চিঠিপত্র। মুকুন্দ গোয়েঙ্কাকে লেখা চিঠির খসড়া এবং একটি ডায়েরী। ডায়েরী না বলে একটা খাতাই বলা উচিত। খাপছাড়া ভাবে লেখা দিনপঞ্জী। যখন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছে মোহিনীর জীবনে, তখন কিছু লিখেছে। তাই সেই লেখায় জীবনের ব্যথা আছে, হাসি আছে, উল্লাস আছে, আবার বিষাদও আছে। আছে জীবনের প্রতি পদে প্রবঞ্চিত হওয়ার করুণ ইতিহাস। মালিনীর মত সে ভালভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে অন্য পথে টেনে নামানো হয়েছিল। সে যখন হেরে যাচ্ছে নিজের অবিমৃষ্যকারীতার পরিণামে, তখন জিতে বেরিয়ে যাচ্ছে মালিনী। ঈর্ষা-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে মালিনীকেও টেনে এনে দাঁড় করাতে চেয়েছিল তার পাশে—হেরে যাওয়া জায়গাটিতে।

তাই ব্ল্যাকমেলিংয়ের চিঠি, ব্লু-ফিল্মের ফটো। সাল তারিখ পাওয়া গেল ডায়েরী থেকেই—কবে কি চিঠি পাঠানো হয়েছে কাকে, পাওয়া গেছে কত টাকা এবং কিভাবে তিল তিল করে গড়ে তোলা মালিনীর সুখের প্রাসাদ ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে চক্ষের নিমেষে—তারই ইতিহাস। দুঃখ পেয়েছে কি মোহিনী? না। একদম না। দু-বোন একই সময়ে এসেছিল জগতে—যমজ যে। একই ভাবে তাদের

জীবন কাটুক—মোহিনী শুধু তাই চেয়েছিল? কিন্তু মালিনীর অত সতীপনা তার ভাল লাগে নি। তাই মালিনীকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে সে—লোকে ভুল করবে, মোহিনীকে মালিনী ভেবে নেবে, মোহিনীর সমস্ত অপকর্মের জন্যে মালিনীকে শাস্তি দেওয়া যাবে। মোহিনীর জীবনে ঘর-বর নেই, মালিনীর জীবনেও ঘর-বর থাকবে না—এই হল মোহিনীর পণ। তার মোটিভ।

পুলিশ খাতাখানা পেয়ে উপকৃত হল। মালিনীকে ছায়ার মত ফলো করে এতদিন তারা যে পণ্ডশ্রম এবং পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে মালিনীকে কিন্তু পাওয়া গেল না।

পাওয়া গেল না রিভলবারটিকেও—যার গুলি দিয়ে বোনের করোটি ছিদ্র করেছে মালিনী।

মোহিনী গোবিন্দর পিসিমার কাছে কেন গিয়েছিল, এ রহস্য কিন্তু রহস্যই থেকে গেল। খাপছাড়া ভাবে লেখা খাতায় এ ব্যাপারটা লেখবার সুযোগ পায় নি মোহিনী—ক্লাইম্যাক্স আসার পরেই তো খুন হয়ে গেল নিজেই। তাই আফশোষ রয়ে গেল পুলিশ মহলের। কি এমন ঘটেছিল যে পিসিমা অমন চিলের মত চেঁচিয়ে মোহিনীকে কুলটা, ডাইনী এবং বেশ্যা বলবেন?

যাই হোক, সব রহস্যের তো সুচারু সমাধান হয় না। পুলিশের দপ্তরে অমন কত আনসল্‌ভড মিস্ট্রিই তো ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। তাই ডবল খুনের জোড়াতালা সমাধান করে পুলিশ নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু ডবল লোকসান হয়ে গেল গোবিন্দর আর সুরমার। পিসিমা তো গেলেনই, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হলেন কর্নেল ম্যালকট।

পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয় মনে আছে, সুরমা যখন টেলিফোনে 'খুন! খুন!' বলে চেঁচিয়ে খবর দিচ্ছিল আমাকে, ঠিক তখনি উনি যেন ছুটে পালিয়ে গেছিলেন বসবার ঘর থেকে।

তার পর থেকে কর্নেল ম্যালকটকে আর কেউ দেখে নি।

এর কিছুদিন পরেই আমিও নিরুদ্দেশ হলাম।

কলকাতা ফিরে এসে কিছুদিন চেম্বার খুলে বসেছিলাম। কিন্তু মন তখন এত রিক্ত যে কোন ব্যাপারে মন লাগাতে পারছিলাম না। এরকম মানসিক দৈন্যদশা আমার কখনো হয় নি। একটি নারীর অভাবে পুরুষের অন্তর যে এরকম শূন্য হয়ে যায়, এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সেই প্রথম। মনের ভেতরটা সদাই মোচড় দিতে থাকে অব্যক্ত বেদনায়। অব্যক্ত, সত্যই অব্যক্ত। বলে কাউকে বোঝানো যায় না কি কষ্ট মনের মধ্যে। মন হু-হু করা কাকে বলে, তা সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে উপলব্ধি করলাম। ভালোবাসা কি বস্তু, তা ভালোভাবেই টের পেলাম।

এই মন নিয়ে মনের রুগীর চিকিৎসা করা চলে না। তাই অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে যে অসম্ভব অভিযানের বাসনাটা সুপ্ত ছিল, এবার তাই নিয়েই মাতব ঠিক করলাম। হিমালয় আজও দুর্গম, দুর্জ্ঞেয়। দেশ-বিদেশের দুঃসাহসীরা হিমালয়ের একটির পর একটি শিখর জয় করে চলেছে এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় হিসেবী বুদ্ধি দিয়ে যার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, প্রাণ বিপন্ন করে পাহাড়ে উঠে শিখর জয় করে কোন লাভ আছে কি?

আছে বৈকি। দুর্গমের সঙ্গে সংগ্রামের আনন্দ। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে চিত্তকে নির্ভর করার আনন্দ। আমিও ঠিক করলাম, এই দুর্গম পথেরই পথিক হব। একা। তুষার ঢাকা হিমালয়ের কোলে কিছুদিন একা একা ঘুরে মনটাকে সমৃদ্ধতর করে আবার বসব প্র্যাকটিশে।

সুরমা আমার সঙ্কল্প শুনে চমকে উঠে বলছিল, বাসুদা, আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।

আমি রাজী হই নি। হেসে বলেছিলাম, পথি নারী বিবর্জিতা।

যেভাবে আমি টো টো করে বেড়াব, তা তোমরা সহ্য করতে পারবে না।

সন্ন্যেসী হয়ে যাচ্ছেন নাকি? চোখ বড় বড় করে বলেছিল সুরমা, হিমালয়ে গিয়েই তো সবাই সাধু হয়ে ফেরে?

অনেকে ফেরেও না।—বলেছিলাম আমি, কিন্তু আমি ফিরব। সাধু-টাধু হওয়ার বান্দা আমি নই। সমুদ্রের ধারে গেছিলাম নির্জনে কিছুদিন কাটাবো বলে—ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। তাই এবার যাব এমন এক জায়গায় যেখানে ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্তরা হুট করে যেতে পারে না।

ট্রেকিং করবেন? বলেছিল গোবিন্দ।

হ্যাঁ।

আসল অভিপ্রায়টা বলি নি অবশ্য। কলকাতা থেকে বেরোতে চাই লম্বা ছুটি নিয়ে কয়েকটা রহস্যের মীমাংসা করার জন্যে।

প্রথমে গেলাম দিল্লীতে। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে পৌঁছলাম কাঠমাণ্ডুতে।

সেদিন ছিল তেসরা মার্চ।

বাতাস বেশ পরিষ্কার। বুক ভরে শ্বাস নিলে সমস্ত শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আট টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বড় হোটেলে উঠব না ঠিক করেছিলাম, হিপিরা যে কৃচ্ছ্রসাধন করে, আমিও করব সেই রকম।

উদ্দেশ্য আরও একটা ছিল। যথাসময়ে তা স্পষ্ট হবে।

চাইনীজ খাবার খেলাম এক প্লেট। ছ' টাকায় এমন তরিবৎ করে খাওয়া কলকাতায় বসে ভাবতেই পারা যায় না। খেয়েদেয়ে বেরোলাম কাঠমাণ্ডু দর্শনে। মার্কোপোলোর আমলের সাজানো শহর যেন। সুপ্রাচীন সভ্যতার ছাপ এ শহরের সব জায়গায়।

চোখ জুড়োনো দৃশ্য, কান জুড়োনো শব্দ আর মন ভোলানো সুগন্ধির অপূর্ব সমাহার। হিন্দু মন্দির আর বৌদ্ধ প্যাগোডায় ছাওয়া শহর। পিলুটি করা কাঠ আর পাথরের কত দেবদেবীর মূর্তি যে দেখলাম, তার ঠিক নেই। মন্দির আর প্যাগোডার বিরামবিহীন টং টং ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, পথেঘাটে মশলা দিয়ে রান্না করা রকমারি আহারের সুগন্ধ, ঠিক মাঝখানে বিরাট মার্কেট স্কোয়ার। দৈবপ্রসাদ ধন্য ষাঁড় আর গরু নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরু সরু পথগুলোয়। পবিত্র চতুষ্পদ বলেই তাদের খাতিরের অন্ত নেই। মানুষ এত পূজা পায় না, যত পায় এরা। তিব্বতী লামাও ষাঁড় আর গরুদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে পথঘাট। সেই সঙ্গে আছে হিন্দু সন্ন্যাসী, ফুলওয়ালা আর কাঠওয়ালা—মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে হাঁটছে অক্লেশে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে হাসিস আর মারিহুয়ানা সেবনে আইনের চোখরাঙানি ছিল না নেপালে। যত পারো খেয়ে যাও—কেউ বাধা দেবে না। হিপিদের এত ভিড়ের অন্যতম কারণ সেইটাই। 'হাশশপ'য়ে সে ভিড় ইউরোপীয়ান আর নর্থ আমেরিকান ছোঁড়াছুঁড়িদের। তিব্বতী উদ্বাস্তু পরিচালিত ডজনখানেক ছোট রেস্টুরেন্ট এদের আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের ইউথট্রেড কন্ট্রোল করছে এই ক'টি তিব্বতী রেস্টুরেন্ট। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাপ্ল কেনার ইচ্ছে হলে চলে আসুন কাঠমাণ্ডুতে। সেই সঙ্গে শুনবেন সিমন আর গারফানকেলের স্টিরিও বাজনার সঙ্গে হিন্দু পূজারীদের একঘেয়ে স্তোত্রপাঠ।

আমার চোখ ঘুরছে কিন্তু পথেঘাটে। হাশশপে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি—গলি খুঁজতে, মার্কেট স্কোয়ারেও নজর রেখেছি। সস্তা হোটেলের আড্ডাখানাগুলোতেও বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চিন্তাভাবনা এনার্জি যদিও হিমালয়ের দিকে—যার টানে এসেছি নেপালে।

যেভাবে আমি টো টো করে বেড়াব, তা তোমরা সহ্য করতে পারবে না।

সন্ন্যেসী হয়ে যাচ্ছেন নাকি? চোখ বড় বড় করে বলেছিল সুরমা, হিমালয়ে গিয়েই তো সবাই সাধু হয়ে ফেরে?

অনেকে ফেরেও না।—বলেছিলাম আমি, কিন্তু আমি ফিরব। সাধু-টাধু হওয়ার বান্দা আমি নই। সমুদ্রের ধারে গেছিলাম নির্জনে কিছুদিন কাটাবো বলে—ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে। তাই এবার যাব এমন এক জায়গায় যেখানে ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্তরা হুট করে যেতে পারে না।

ট্রেকিং করবেন? বলেছিল গোবিন্দ।

হ্যাঁ।

আসল অভিপ্রায়টা বলি নি অবশ্য। কলকাতা থেকে বেরোতে চাই লম্বা ছুটি নিয়ে কয়েকটা রহস্যের মীমাংসা করার জন্যে।

প্রথমে গেলাম দিল্লীতে। দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে পৌঁছলাম কাঠমাণ্ডুতে।

সেদিন ছিল তেসরা মার্চ।

বাতাস বেশ পরিষ্কার। বুক ভরে শ্বাস নিলে সমস্ত শরীর যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আট টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিলাম। বড় হোটেলে উঠব না ঠিক করেছিলাম, হিপিরা যে কৃচ্ছ্রসাধন করে, আমিও করব সেই রকম।

উদ্দেশ্য আরও একটা ছিল। যথাসময়ে তা স্পষ্ট হবে।

চাইনীজ খাবার খেলাম এক প্লেট। ছ' টাকায় এমন তরিবৎ করে খাওয়া কলকাতায় বসে ভাবতেই পারা যায় না। খেয়েদেয়ে বেরোলাম কাঠমাণ্ডু দর্শনে। মার্কোপোলোর আমলের সাজানো শহর যেন। সুপ্রাচীন সভ্যতার ছাপ এ শহরের সব জায়গায়।

চোখ জুড়োনো দৃশ্য, কান জুড়োনো শব্দ আর মন ভোলানো সুগন্ধির অপূর্ব সমাহার। হিন্দু মন্দির আর বৌদ্ধ প্যাগোডায় ছাওয়া শহর। পিলটি করা কাঠ আর পাথরের কত দেবদেবীর মূর্তি যে দেখলাম, তার ঠিক নেই। মন্দির আর প্যাগোডার বিরামবিহীন টং টং ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ, পথেঘাটে মশলা দিয়ে রান্না করা রকমারি আহারের সুগন্ধ, ঠিক মাঝখানে বিরাট মার্কেট স্কোয়ার। দৈবপ্রসাদ ধন্য ষাঁড় আর গরু নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে সরু সরু পথগুলোয়। পবিত্র চতুষ্পদ বলেই তাদের খাতিরের অন্ত নেই। মানুষ এত পূজা পায় না, যত পায় এরা। তিব্বতী লামাও ষাঁড় আর গরুদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে পথঘাট। সেই সঙ্গে আছে হিন্দু সন্ন্যাসী, ফুলওয়ালা আর কাঠওয়ালা—মাথায় ফিতে দিয়ে বাঁধা বিরাট কাঠের বোঝা নিয়ে হাঁটছে অক্লেশে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে হাসিস আর মারিহুয়ানা সেবনে আইনের চোখরাঙানি ছিল না নেপালে। যত পারো খেয়ে যাও—কেউ বাধা দেবে না। হিপিদের এত ভিড়ের অন্যতম কারণ সেইটাই। 'হাশশপ'য়ে সে ভিড় ইউরোপীয়ান আর নর্থ আমেরিকান ছোঁড়াছুঁড়িদের। তিব্বতী উদ্বাস্তু পরিচালিত ডজনখানেক ছোট রেস্টুরেন্ট এদের আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের ইউথট্রেড কন্ট্রোল করছে এই ক'টি তিব্বতী রেস্টুরেন্ট। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাপ্ল কেনার ইচ্ছে হলে চলে আসুন কাঠমাণ্ডুতে। সেই সঙ্গে শুনবেন সিমন আর গারফানকেলের স্টিরিও বাজনার সঙ্গে হিন্দু পূজারীদের একঘেয়ে স্তোত্রপাঠ।

আমার চোখ ঘুরছে কিন্তু পথেঘাটে। হাশশপে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি—গলি খুঁজতে, মার্কেট স্কোয়ারেও নজর রেখেছি। সস্তা হোটেলের আড্ডাখানাগুলোতেও বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চিন্তাভাবনা এনার্জি যদিও হিমালয়ের দিকে—যার টানে এসেছি নেপালে।

তাই গেলাম দর্জি পিণ্ডা কামি শেরপার দোকানে। ওর ইচ্ছে সবাই ওকে পি-কে শেরপা নামে ডাকে। আমি ওর সে ইচ্ছে পূরণ করলাম এবং আমার ট্রেকিংয়ের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কিনলাম ৩৬ মিটার লম্বা নাইলন দড়ি, বরফ স্ক্রু (দেখতে অনেকটা বিরাটকায় ছিপি খোলার কর্কস্ক্রুর মত), পাইটন (ধাতুর স্পাইক), ক্র্যামপন (বরফের গা বেয়ে ওঠার বুটের তলায় লাগানোর ইস্পাতের তৈরি আঁকশি থাবা) আর ক্যারাবাইনার (ধাতুর তৈরি স্ক্রু লাগানো বড় সাইজের ক্লিপ—যার মধ্যে দিয়ে দড়ি টানা বা ছাড়া যায় খুশি মত অল্প অল্প করে)। একটা পুরু লোমশ জ্যাকেট, লোমশ ট্রাউজার্স, ছোটো বরফ কুঠার আর একজোড়া গেটার (গোড়ালি ঢাকবার পুরু চামড়ার পটি) সমেত আমার মোট খরচ হল দু'হাজার টাকা। পরে এক ক্যানাডিয়ান তরুণের কাছে শুনেছিলাম, সে দেশে এই ক'টা জিনিসের দম হত পাঁচগুণ, অর্থাৎ দশ হাজার টাকা।

কিন্তু কালঘাম ছুটে গেল এভারেস্ট অঞ্চলের ম্যাপ যোগাড় করতে গিয়ে। খবর নিয়ে জানলাম, ও অঞ্চলের যে ক'টা ভাল ম্যাপ আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার আগে যারা রওনা হয়েছে।

কারা গেছে? একটু চেষ্টা করতেই পেয়ে গেলাম তাদের নাম।

মোট তেরোটা পর্বতারোহী অভিযান বেরিয়ে পড়েছে এভারেস্ট আরোহনের অ্যাডভেঞ্চারে। এদের মধ্যে রয়েছে এক পঞ্চাশোর্ধের অস্ট্রেলিয়ান সাহেব। সাহেব। চোখ তার নীল, মুখে মিষ্টি হাসি, দেহ শীর্ণ, কিন্তু এনার্জিতে ঠাসা। অস্ট্রেলিয়ান নীলচক্ষু প্রৌঢ়। এই রকমই এক সাহেবের সন্ধানে যে বেরিয়েছি আমি।

ম্যাপের এত আকাল দেখে ফের শরণাপন্ন হলাম পি কে'র। একটা ম্যাপ সংগ্রহ করা গেল নগদ দামে। তাতে মূল শিখরগুলো চিহ্নিত করা আছে বটে, কোন পথে যেতে হবে এবং রাস্তায় কি কি গ্রাম পড়বে তাও লেখা আছে—নেই শুধু পথের খুঁটিনাটি বিবরণ।

তলায় ছোট ছোট হরফে লেখা বুক দমানো সতর্কবাণী—ব্রীজ আর নদী পেরোনোর সাঁকো বিনা বিজ্ঞপ্তিতে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

চমৎকার! অতীব চমৎকার! তারপর ভাবলাম এই না হলে অ্যাডভেঞ্চার। পথের কষ্ট মাথায় তুলে নেবো বলেই তো এসেছি। আসুক বিপদ, অদৃশ্য হোক সাঁকো—আমি এগিয়ে যাবই!

কিন্তু দরকার একজন গাইডের। সে গুড়েও বালি পড়েছে দেখলাম। তেরোটি অভিযান নেপালের সব ক'জন অভিজ্ঞ শেরপাকে নিয়ে গেছে। শেরপাদের আদি বাসভূমি তিব্বতে। কিন্তু এখন আস্তানা নিয়েছে নেপালে আর মূলত হিমালয়ের পাহাড় কন্দরে। সংখ্যায় তারা পঁচাশি হাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিয়ে খ্যাতির শিখরে উঠে গিয়েছে এরা। হিমালয়ের পাহাড়দের এরা যতটা চেনে ততটা আর কেউ চেনে না। পর্বতারোহনের পক্ষে এদের দেহ যতটা উপযোগী,আর কারো দেহ ততটা উপযোগী নয়। যে উচ্চতায় বাতাসের অভাবে অন্য পর্বতারোহীর ফুসফুস ফেটে যাবে,এরা সেই উচ্চতায় নিশ্বাস নেয় অক্লেশে! তাই ঠাট্টা করে শেরপাদের বলা হয় 'তৃতীয় ফুসফুস'। দুটো ফুসফুস ছাড়াও বাড়তি একটা ফুসফুস চাও তো সঙ্গে নাও শেরপা। কাঠমাণ্ডু তন্ন তন্ন করে চুঁড়েও যখন নির্ভরযোগ্য কোন শেরপা জোটাতে পারলাম না, তখন সুখবর নিয়ে এল পি-কে।

বললে, স্যার! হিলারীর সঙ্গে এভারেস্টে উঠেছে এমন একজনের খবর পাওয়া গেছে।

পাঠকপাঠিকাদের নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না কে এই হিলারী। ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম দুই ডানপিটে এভারেস্টের দর্প চূর্ণ করেন। একজন তেনজিং নোরগে. অপরজন স্যার এডমণ্ড হিলারী।

পি-কে নিয়ে এল তাকে। নাম শিমা তেনজিং শেরপা। বয়স আটাশ। খর্বকায়, কিন্তু সব শেরপার মতই বলিষ্ঠ। পর্বতারোহনের কোন প্রমাণ সে দাখিল করতে পারল না। পি-কে'র সুপারিশই

বিশ্বাস করলাম।

কিন্তু প্রথম অসুবিধে দেখা দিল কথা বলতে গিয়ে। শিমা তেনজিং শেরপা মাথা হেঁট করে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। বেচারা ইংরিজি জানে না বললেই চলে, হিন্দিতেও মা গঙ্গা।

শিমা ছাড়া আর শেরপা তো নেই। তাই তাকেই সঙ্গে নিলাম পনেরো টাকা রোজে, খোরাকি ফ্রী। ঝটপট কিনে আনলাম একটা ইংরিজি-নেপালী ডিক্সনারী, আর একখানা ব্যাকরণ যাতে শব্দের উচ্চারণ বিধি দেওয়া আছে। একটা মিনিটও নষ্ট না করে বাছাই করা কয়েকটা শব্দ অধ্যয়ন করতে শুরু করে দিলাম। যেমন, আপাত্তি মানে ডেঞ্জার, উরলাম্নু মানে পর্বতারোহন। ইত্যাদি। পাহাড়ে চড়বার সময়ে পরস্পরের ওপর নির্ভর করা পার্টনাররা—কথা বুঝতে না পারলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে যে! তাই আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম ডিক্সনারী নিয়ে।

মোটবাহকও জোগাড় হয়ে গেল একজন। নাম তার খুরকেমবা। বয়স চব্বিশ। ওজন ছাপ্পান্ন কিলোগ্রাম। বেশ মজবুত গড়ন। ইংরেজি আর হিন্দিতে সেও মা গঙ্গা। কিন্তু হাসিটি বড় মিষ্টি। সঙ্গী হিসেবে মন্দ হবে না। দশ টাকা রোজে বহাল করলাম তাকে। খাওয়া খরচ তার—এইটাই রীতি। কুলীরা নিজেরা খাবার জুটিয়ে নেয়।

এরপর ঝামেলা হল পারমিট জোগাড় করা নিয়ে। পর্বতারোহন (ক্লাইম্বিং) আর ট্রেকিংয়ের জন্যে আলাদা আলাদা। পারমিট নেওয়া দরকার। ট্রেকিং মানে যে পথে হরবকত যাতায়াত চলে, সেই পথেই যেতে হবে—কয়েকটা পাহাড়ে ওঠা চলবে না। সেসব পাহাড়ের লিস্ট আলাদা। ক্লাইম্বিং পারমিটের নিয়মকানুন কঠোর। দক্ষিণাও বেশি। ট্রেকিং পারমিটের দক্ষিণা মোট কুড়ি টাকা।

খোঁজ নিলাম ট্রেকিং পারমিট নিয়ে কারা গেছে আমার আগে। অযথা কৌতূহল নয়। হিমালয় অভিযাত্রীরা পরস্পরকে জানতে

চায়—জানাতেও হয় সরকার থেকে। তাই যাদের নাম দিল ওরা, তাদের মধ্যেই পেয়ে গেলাম বিশেষ সেই অস্ট্রেলিয়ান সাহেবটির নাম—যার চোখ নীল, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাই বুঝি মিষ্টি হাসি লেগেই থাকে মাজিত চোখে-মুখে।

ট্রেকিং পারমিটই নিলাম আমি। সেই সঙ্গে নিলাম ছ' সপ্তাহের ভিসা—এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে পৌঁছে ফিরে আসার জন্যে হাতে রইল আরও কয়েকটা বাড়তি দিন।

খাবার দাবারের এলাহি ব্যাপার করলে তো চলবে না। তাই যেসব খাবার না নিলেই নয় সেইগুলোই নিলাম। চাল, আলু, ডাল, এক থলি ক্যারামেল টফি, কফি, চা, চিনি, বিস্কুট, বাদাম তেল আর পাঁচ কিলো চীজ। দরকার মত খাবার রাস্তায় কিনে নেওয়া যাবে 'খন। হিমালয়ের পথে পথে ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যায় না বলে পাঁচ হাজার টাকা ছোট নোটের বাণ্ডিলে ঠেসে নিলাম আমার জিনিসপত্রের একদম ভেতরে।

মার্চ মাসের দশ তারিখে বাসে চেপে শেরপাদের নিয়ে নাচতে নাচতে আর ঝাঁকুনি খেতে খেতে পৌঁছোলাম দূরের লামোসাঙ্গুতে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে এভারেস্ট যাবার পথ। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার বিস্তৃত ঢেউ খেলানো পর্বত সানুদেশ। তার ওপারে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী যার পঁচিশটা শিখরের উচ্চতা ৭,৬০০ মিটারেরও বেশি। ট্রেকিংয়ের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না নিয়ে পা বাড়ালাম দুর্গম এই অভিযানে—লক্ষ্য আমার ট্রেকিং নয়—নীলচক্ষু সেই অস্ট্রেলিয়ানের নাগাল ধরা।

পাঠকপাঠিকারা এতক্ষণে নিশ্চয় আমার উদ্দেশ্য অনুধাবন করে ফেলেছেন। তাই আর লুকোচুরি খেলা না খেলে এত জায়গা থাকতে নেপালে কেন এলাম, তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাক।

স্মরণ থাকতে পারে সুরমা টেলিফোনে আমাকে পিসিমার হত্যা

সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেগে উধাও হয়ে গেছিলেন কর্নেল ম্যাঙ্গকট। তারপর থেকে তাঁর টিকি আর দেখা যায় নি। নিপাত্তা হয়ে গেছিলেন পুরী থেকে। কি যেন বলতে এসেছিলেন উনি আমাকে। এমন গোপন কথা যা সুরমাকেও বলা যায় না। আমাকে দিয়ে কথা আদায় করেছিলেন—যা শুনব, তা সুরমাকেও বলব না। তারপরেই এল সুরমারই টেলিফোন। কার টেলিফোন এবং কি বার্তা এল টেলিফোনে—তা তাঁর জানার কথা নয়। তবুও ভদ্রলোক শশকের মত বেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন অশরীরীর মত।

অনেকগুলো রহস্যের আবরণে নিজেকে ঘিরে নিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। পুলিশ কিন্তু তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি—তাঁর অস্তিত্বও পুলিশ জানত না। মালিনীকে নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিল—গোবিন্দর শ্বশুরকে নিয়ে নয়।

আমার মনে তিনি কিন্তু ধোঁকা রেখে গেলেন। রহস্যের জট ছাড়ানোর জন্যে অস্থিরতা অনুভব করলাম। এমনকি মালিনীর শোচনীয় পরিণতির পরেও কিছুতেও ভুলতে পারলাম না কি যেন বলতে এলেছিলেন কর্নেল এবং সুরমার টেলিফোন আসতেই চম্পট দিয়েছিলেন।

চম্পট কেন দিয়েছিলেন, তা আমি আঁচ করেছিলাম।

অনুমানটা যাচাই করতেও চেয়েছিলাম।

তাই খুঁজেছিলাম কর্নেলকে।

গোবিন্দর কাছ থেকে তাঁর পুরীর আস্তানার ঠিকানা সংগ্রহ করে একা গেছিলাম। তার আগেই অবশ্য সুরমা আর গোবিন্দ যেখানে কর্নেল যে নেই, খবরটা তারাই দিয়েছে। জিনিসপত্র নিয়ে রাতারাতি তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন।

চাবিটা গোবিন্দর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। ওরা গিয়ে দেখেছিল, বাড়ির দরজা-জানলা সব খোলা—কেউ নেই। নিজেদের

তালা লাগিয়ে এসেছিল দরজায়। আমি গিয়ে খুললাম সেই তালা।

বাড়িটা একতলা। হিপিদের নিবিড় আস্তানা যেদিকে সেই দিকেই নির্জন, নিস্তব্ধ অঞ্চল। সামনে ছোট্ট সিমেন্টের দাওয়া। ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে। ছাদ থেকে সমুদ্র দেখা যায়। ঘর বা দাওয়া থেকে নয়।

একটি মাত্র ঘর একতলায়। এ ছাড়া ঘেরা অঞ্চলে কল-পায়খানা আর রান্নাঘর। রান্নার তৈজসপত্র সেখানে আছে, শোবার ঘরে আছে একটিমাত্র তক্তপোষ, একটা ইজিচেয়ার, একটি পালিশ চটা টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে আধপোড়া মোমবাতি। আর কিছু নেই। সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে এসেছেন কর্নেল। মায়ামুক্ত সন্ন্যাসীর মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন বিনা নোটিশে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম পরিত্যক্ত ঘরখানার মধ্যে। এই সেদিনও প্রৌঢ় ওই তক্তপোষে শুয়েছেন। ইজিচেয়ারে গা এলিয়েছেন, হাফপ্যাণ্ট পরে খালি গায়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সকাল সন্ধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, তারপর অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ঘরের পেছনে খোলা জায়গায় স্তূপাকার বালির মধ্যে হাবিজাবি অনেক বাজে জিনিস পড়েছিল। এককালে হয়তো হিপিদের আড্ডা ছিল। তাই মদের বোতল ভাঙা থেকে শুরু করে ভাঙা কালো কাচের চশমা পর্যন্ত সব দেখলাম সেখানে। অসীম যত্নে এই জিনিসগুলোই নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায়।

এবং পেলামও।

একদলা কাগজ।

শিশিরে ভেজা বালিতে নোংরা কাগজ।

মেলে ধরেছিলাম দলা পাকানো কাগজখানা। একখানা চিঠি সবে শুরু করে দু'তিন লাইন লিখেই দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দেওয়া হয়েছে। সামনেই ঘরের জানলা। জানলার পাশেই টেবিল। ওই টেবিলে বসে মোমবাতি জ্বালিয়ে চিঠি লেখা শুরু করেছিল পত্রলেখক—তা চিত্তে ধরে নি, তাই দলা পাকিয়ে জানলা দিয়ে নিক্ষেপ করে লিখেছে নতুন করে।

আসল চিঠির মূল সুরটা কিন্তু বাতিল চিঠির খসড়ার প্রথম পংক্তিতেই ধরা পড়েছে।

চিঠিখানা এই :

সুরমা,

আই থিংক আই শুড লিভ ইণ্ডিয়া। নেপাল ইজ দ্য বেস্ট প্লেস হোয়্যার আই ক্যান হাইড অ্যাণ্ড গেট পীস। আই মে রেসপণ্ড টু দ্য কল অভ হিমালয় অ্যাণ্ড—

খসড়ার শেষ এইখানেই। কে চিঠি লিখছে, তা লেখা নেই। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। পাঠকপাঠিকারাও বুঝবেন। যে কেউ বুঝবে। এ বাড়িতে বসে সুরমাকে চিঠি লিখতে পারেন একজনই। তিনি ইণ্ডিয়া ত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন। নেপালেই আত্মগোপন করে থাকতে চান শান্তির সন্ধানে। হিমালয়ের ডাকেও সাড়া দিতে পারেন।

কর্নেল ম্যালকটের সন্ধানে তাই আমি নেপাল রওনা হব ঠিক করেছিলাম সেই মুহূর্তে। কিন্তু কাউকে তা বলি নি। কেন বলব? সুরমাকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় তিনি চিঠি লিখে গেছিলেন। সুরমা সে চিঠির কথা তো আমাকে বলে নি? কি ছিল সেই চিঠিতে? গোপনীয় এমন কিছু বৃত্তান্ত যা তার বাসুদাকেও বলা যায় না—এমন কিছু বৃত্তান্ত যার জন্যে কর্নেল ম্যালকটের মত ধনবান সন্ন্যাসীসম ব্যক্তিকেও লুকিয়ে থেকে মনের শান্তির অন্বেষণে ছুটে যেতে হচ্ছে সুদূর নেপালে? হিমালয় অভিযানের অভিপ্রায়ও তাঁর রয়েছে।

তাই দলা পাকানো কাগজখানা সযত্নে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম

কলকাতা। নেপাল পরিদর্শনের অভিমত ব্যক্ত করে লক্ষ্য করলাম সুরমার মুখের ওপর প্রতিক্রিয়া। চমকে উঠেছিল সুরমা। আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। রাজী হই নি।

সোজা নেপালেও আসি নি। সুরমাকেও বলিনি প্রথমে কোথায় যাচ্ছি।

গেছিলাম দিল্লীতে। দিল্লীর কোন অঞ্চলে কর্নেল ম্যালকটের সঙ্গে সে কৈশোর কাটিয়েছে, তা ওর মুখেই শুনেছিলাম অনেক আগে। কোন স্কুলে পড়েছে, তাও বলেছিল আমাকে। তাই খোঁজ নিতে কোন অসুবিধে হয় নি। বাড়ি খুঁজে বার করেছিলাম। একটা বাড়ির দুটো অংশ। বাঁ দিকের অংশে থাকতেন কর্নেল আর সুরমা। ডান দিকের অংশে এক পাঞ্জাবী পরিবার। কর্নেল চলে যাওয়ার পর তাঁর এক গৃহভৃত্য চাকরি নেয় পাঞ্জাবী পরিবারে। নাম তার মকবুল। অল্প বয়স। চটপটে।

মকবুল মুখ খুলেছিল একশো টাকার একখানি নোট হাতে পেয়ে।

অবিশ্বাস্য সেই কাহিনী শুনে থ হয়ে গিয়েছিলাম।

অজস্র রহস্যের আবরণে ঘেরা কর্নেল ম্যালকট কিন্তু আরও দুজ্ঞেয় হয়ে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী মনের কাছে। তাঁর নাগাল ধরার সঙ্কল্পটাও দৃঢ়তর হয়েছিল।

নেপালে এসে অল্প আয়াসেই তাই খোঁজ পেয়ে গেলাম কর্নেল ম্যালকটের—রহস্যাবৃত নীলচক্ষু আধা-হিপি অস্ট্রেলিয়ান প্রৌঢ়ের।

আমি নাকি সাহেব, তাই আমাকে নিতে হল সবচেয়ে কম বোঝা। মোট তেইশ কিলো। শিমা নিল তিরিশ কিলো, আর ছত্রিশ কিলো ওজনের তলায় মনে হল যেন চাপা পড়ে যাবে ক্ষুদে খুরকেমবা। অথচ ওই বিপুল ভার পিঠে নিয়েও সে বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হল না। আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। তাপমাত্রা বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আমি লাল টকটকে জাকিন

জ্যাকেট আর লাল হ্যাভারসাকে ঝলমলে। কিন্তু আমার দুই সঙ্গীর পরনে সুতির শার্ট আর হাফপ্যান্ট।

আকাশ পথে সিধে উড়ে আমাদের যাত্রাপথ মোটে একশো নব্বই কিলোমিটার। কিন্তু এঁকেবেঁকে খাড়াই উৎরাই পেরিয়ে পথের দৈর্ঘ তার দ্বিগুণ। হিমালয় থেকে বহু নদী ভেসে এসেছে দক্ষিণে। সমকোণে এই সব নদীর অববাহিকা পেরোতে গিয়ে বহুবার আঠারোশো মিটারেরও বেশি পথ খাড়াই ভাবে উঠতে হল। প্রথম দিনেই মোটামুটি মালুম হল ট্রেকিং কি জিনিস।

দ্বিতীয় দিনে রুটিন তৈরি হয়ে গেল সারাদিনের। স্ফটিক স্বচ্ছ আকশের নিচে ঘুম ভাঙত ভোর ছটায়। প্রাতঃরাশ সমাধা করতাম চা আর বিস্কুট খেয়ে। তারপর পাইনের জটলা, আধা-নিরক্ষীয় ঝোপঝাড়, বুনো ফুলে ছাওয়া সবুজ মাঠ আর ছোটবড় টিলা পেরিয়ে যেতে হত এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে। যেতে যেতে দেখলাম, আধ হেকটর পরিমাণ ছোট ছোট ক্ষেতে ধান, গম, যব, আলু আর ভুট্টার চাষ করছে নেপালীরা।

প্রতিদিন পেরিয়ে এলাম দুটি কি তিনটি গ্রাম, কাঠ, পাথর অথবা মাটি দিয়ে তৈরি কটেজ—কখনো সাদা চুনকাম করা। জানলা-গুলোতে রঙ বা পালিশের বালাই নেই। মান্ধাতার আমলের কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে চাষ আবাদ চালিয়ে যাচ্ছে চাষীরা। কাঠ বা মাটির বাসনপত্র পিঠে নিয়ে পাহাড়ীরা কতবার পাশ দিয়ে চলে গেল। কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না, কেউ হাসল না। নেপাল দেশটা মৃদু হাসির দেশ। সেই সঙ্গে আছে হাত জোড় করে নমস্কার জ্ঞাপন।

সকাল দশটা নাগাদ পেট ভরে খাওয়ার জন্যে দাঁড়াতাম। নিকটস্থ চাষীর কাছ থেকে কখনো সংগ্রহ করে আনতাম মুরগী, ভেণ্ডুর দাঁড় করিয়ে কিনতাম মাছ। খোলা আগুনে সেঁকে নিতাম, অথবা সেদ্ধ করে নিতাম।

শিমা আর খুরকেমরা দুপুরের রান্না নিয়ে বসলেই আমি

খুলতাম আমার গ্রামার বইখানা। দুপুর নাগাদ খেয়েদেয়ে তরতাজা হয়ে ফের হাঁটতাম—সন্ধ্যের আগে আর দাঁড়াতাম না।

দ্বিতীয় দিন বিকেল যখন গড়িয়ে এসেছে, আঠারোশো মিটার ঢাল বেয়ে নামবার সময়ে একটা খাড়াই দেওয়ালের মত পাহাড় ঘুরে আসতে হল। উত্তরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম না এই বাধার জন্যে। পাহাড় ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে দেখলাম সাত হাজার একশো চুয়াল্লিশ মিটার উঁচু গৌরীশঙ্কর-কে। যেন সিংহাসনে আসীন সম্রাট। গায়ে ঝকমক করছে নীল ধূসর এবং শ্বেতশুভ্র রাজবেশ।

দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম অপরূপ সেই দৃশ্য দেখে। এত কাছ থেকে বিশাল পর্বত এই প্রথম দেখলাম। রাজকীয় রূপ। গৌরীশঙ্করের চূড়ায় দুটি মিনারের মত শিখর হাঁ করে যেন আকাশে কামড় বসাতে যাচ্ছে। মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসছে মন্থর গতি তুষার-সাদা মেঘ। অনেক উঁচুতে তুলোর মত মেঘপুঞ্জ উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে চীনের দিকে। সূর্য তখন ডুব দিচ্ছে। উজ্জ্বল কমলা-গোলাপী রঙে ঝলমলে হয়ে উঠল গোটা পর্বতটা—আগুন লেগে গেল যেন তুলোর মত মেঘরাশিতে।

দাঁড়িয়ে রইলাম সম্মোহিতের মত। সম্বিত ভাঙল চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকার দেখে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত নেমে চললাম পাহাড় বেয়ে। চোখ ঘোরাতে পারলাম না কিন্তু দেবমূর্তির মত শিখর থেকে, হোঁচট খেলাম বহুবার, তবুও আঠার মত চাহনি নিবদ্ধ রইল শিখর-দেশে। অবশেষে এসে পড়লাম গাছের তলায়। অদৃশ্য হয়ে গেল গৌরীশঙ্কর।

রাত্রে ঠাঁই নিলাম একটা নেপালী পরিবারের কুঁড়ে ঘরে। মায়ের কোলে শিশু যেমন, কুঁড়ে ঘরটিও পাহাড়ের গা থেকে ঝুলছে তেমনি ভাবে। মাত্র তিন টাকার বিনিময়ে পেলাম একটা খাওয়া আর থাকার জায়গা। বেশির ভাগ নেপালী বাড়ির মতই এটিও দ্বিতল।

ওপরে থাকে ফ্যামিলি, নিচে গরু ছাগল, চাষ-আবাদের জিনিসপত্র আর গরু-মোষের শুকনো খাবার। ওপরের একটি মাত্র ঘরের এক কোণে স্লিপিং ব্যাগ খুলে আমি লম্বা হলাম। আর এক কোণে জ্বলতে লাগল ধূমায়িত খোলা ফায়ারপ্লেস। একই ঘরে গোটা ফ্যামিলি খানাপিনা, কিচিরমিচির এবং প্রেম ভালোবাসা চালিয়ে গেল মাঝরাত পর্যন্ত। কোণে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে এল বাচ্চারা। সব মিলিয়ে সে এক বিকট গন্ধ। কিন্তু আমার পা তখন ছিঁড়ে যাচ্ছে ব্যথায়, ক্লান্তিতে অবসাদে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়ে রইল বলেই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল না। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই স্লিপিং ব্যাগের পাশে দেখলাম একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। আমার কোন কাগজ তো মাথার কাছে রেখে শুই নি। নেপালীরা কুড়িয়ে পেয়ে হয়তো রেখেছে আমার জিনিস মনে করে।

খুললাম ভাঁজ। একটা ম্যাপ। বিশদ বিবরণ দেওয়া ম্যাপ। যে ম্যাপ কাঠমাণ্ডুতে হন্যে হয়েও খুঁজে পাই নি, সেই ম্যাপ। ম্যাপের ওপর লাল কালি দিয়ে দাগানো একটা পথ। এই পথ দিয়েই যেন যাওয়া ঠিক করেছে ম্যাপের মালিক।

ম্যাপের তলায় লেখা একটি নাম :

কর্নেল ম্যালকট।

শিমা আর খুরকেমবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কর্নেল ম্যালকটের দাগানো ম্যাপ আমার মাথার কাছে এল কিভাবে। অবশ্য আকারে ইঙ্গিতে জানতে চেয়েছিলাম—নেপালী বিদ্যে তখনও তেমন রপ্ত করতে পারি নি। ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। পণ্ডশ্রম বুঝে আর কথা বাড়াই নি।

হয়তো নেপালী ফ্যামিলির কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে ম্যাপটা। হয়তো কর্নেল ম্যালকট এই গৃহেই রাত কাটিয়েছিলেন। ম্যাপটা ফেলে গেছেন ভুল করে।

তাই কি ?

যাই হোক, ম্যাপটা আমার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিল। খুঁজে খুঁজে আর কর্নেল ম্যালকটকে বার করতে হবে না। ঠিকানা তিনিই রেখে গেছেন অজ্ঞাতসারে।

কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত নেপালী ভাষা রপ্ত হতে শিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন কোন পাহাড়ে সে উঠেছে। হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে সে জানিয়েছিল—কোন বড় পাহাড়ে নয়। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় নি। আদৌ কোন পাহাড়ে উঠেছে কিনা, সে সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার মনে। ট্রেকিং করতে বেরিয়ে অনভিজ্ঞ শেরপা সঙ্গে রাখার মত বড় বিপদ আর নেই। রাগারাগি করাটা আরও সাংঘাতিক। তাই যা থাকে কপালে বলে চুপ করে রইলাম।

চতুর্থ দিন বিকেলের দিকে যখন দু' কাঁধের যন্ত্রণায় কাহিল, ফোস্কা বোঝাই পা দুটোকে মনে হচ্ছে সেদ্ধ আলুর মত তলতলে, ঠিক তখনি একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বললে একজন শেরপা, সাহেব কি হাঁপিয়ে গেছেন ?

পরিষ্কার ইংরেজি। কথা বলতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লোকটার নাম দোরজী। একটি ইউরোপীয় দম্পতিকে নিয়ে যাচ্ছে এভারেস্টের কাছে সুবিখ্যাত ব্যায়াঙবোচি মঠে। আমার অবস্থা দেখে এসেছে সাহায্য করতে।

সাহায্য নিয়েছিলাম সাগ্রহে। কর্নেল ম্যালকটকে সে দেখেছে। ম্যাপে দাগানো পথেই তিনি এগোচ্ছেন। দ্রুত পা চালালে আমি নাগাল ধরে ফেলব।

দ্রুত পা চালাবো ? আমি তখন ক্ষতবিক্ষত পা দুখানা আর ব্যথা-টনটনে কাঁধ নিয়ে ভাবছি হিলারী প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ের বেশ কয়েকটা হসপিট্যালের একটায় আশ্রয় নেব কিনা।

দূরে পৃথিবীর ছাদ তিব্বতের শিখরগুলো কিন্তু আমার মনের মধ্যে নতুন শক্তি এনে দিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বিশ্রাম একবারই নেব—যেদিন কর্নেল ম্যালকটের নাগাল ধরব।

এবং ছিন্নভিন্ন করে ফেলব রহস্যের মায়াজাল।

এই দোরজীই আমাকে প্রায় ধরে ধরে নিয়ে এল জানাবসি গ্রাসে। একপাল নেপালী বাচ্চা ছেঁকে ধরল আমাকে। 'হামি চকোলেট লিনচৌন—হামি চকোলেট লিনচৌন'। ক্যারামেল টফি কিছু বিলিয়ে নিস্তার পেলাম তাদের হাত থেকে। রাত্রে আবার অস্থির করে তুলল আমার চুল আর জামা টেনে। আর একপ্রস্থ টফি বিলিয়ে তবে রেহাই পাওয়া গেল।

একুশে মার্চ দারুণ ঠাণ্ডা পড়ল। জল জমে বরফ হয়ে যাওয়ার মত ঠাণ্ডা। কলকাতায় তখন কিন্তু রাস্তায় পিচ গলছে। দুধকোশী উপত্যকা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম অভ্রের কুচো লেগে রয়েছে বড় বড় পাথরের গায়ে। চারদিকে কেবল পর্বতশিখর—হিমালয়ের একদম ভেতরে পৌঁছে গেছি, তারই প্রমাণ। তারপর উপত্যকা পেরিয়ে ঢুকলাম নামচিবাজারে।

উনিশশো একান্ন সাল পর্যন্ত নামচিবাজারে আধুনিক সভ্যতার ছায়াপাত ঘটে নি। ওই বছরেই নেপাল সরকার পরিবর্তন হয় এবং বিশ্বের সব মানুষের কাছে নেপালের দুয়ার খুলে ধরা হয়। নামচি-বাজার এখন তাই কেবল শেরপাল্যাণ্ডের অলিখিত রাজধানীই নয়—পর্বতারোহীদের রসদ সংগ্রহের মূল কেন্দ্র। যদিও নামচিবাজার এখনও সামান্য একটা গ্রাম। খোলামেলা কয়েকটা দোকানে খাবার বিক্রি হচ্ছে, স্রোতস্বিনীর পাশে চৌকোণামন্দিরে ভক্তবৃন্দ আনাগোনা করছে, ছোট্ট বাজারে ইয়াক উল থেকে কার্পেট তৈরি হচ্ছে।

ক্লাইম্বিং অথবা ট্রেকিং—উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, সবাইকে পারমিট চেক করাতে স্থানীয় পুলিশ পোস্টে যেতে হয়। আমিও

গেলাম। পুলিশ অফিসার আমার পারমিট দেখল। দেখেই গম্ভীর মুখে বললে, নামচিবাজার ছেড়ে আমার যাওয়া চলবে না।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন—কি অপরাধ আমার? অফিসার অল্প কথায় যা বললে, তার সারমর্ম এই: আমি নাকি ট্রেকিং পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন করেছি—ক্লাইম্বিংয়ের চেষ্টা করেছি। কাজেই নামচিবাজারেই আমাকে এখন নজরবন্দী থাকতে হবে। রোজ পুলিশ পোস্টে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে—হেড অফিস থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত।

কি কষ্টে যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতাম, তা আমিই জানি। কর্নেল ম্যালকট এই নামচিবাজার হয়ে আরও এগিয়ে গেছেন—আর আমি আটক থাকব তাঁর এত কাছে এসে? অনেক বোঝালাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। শিমা শেরপাকে দিয়েও কোন কাজ হল না। আমার কথা বুঝলে তো বোঝাব? দোরজীকে খুঁজলাম, কিন্তু তার টিকি দেখা গেল না।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠলাম একটা নেপালী ফ্যামিলির দ্বিতল গৃহে। এ বাড়িটা অনেক পরিষ্কার। সাদা চুনকাম করা। কল-পায়খানা আলাদা। ঘরে দুর্গন্ধ নেই। গেস্টরুম সম্পূর্ণ পৃথক। জানলায় দাঁড়ালে দূরে দেখা যায় উঁচু উঁচু পর্বত—এভারেস্ট, লোৎসে আর নুপৎসে। গম্ভীর মহান সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কেন জানি না চোখ জ্বালা করে উঠল আমার।

দুদিন অস্থির হয়ে কাটালাম এই ঘরে। তৃতীয় দিন বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হতে চলেছে, পুলিশ পোস্ট থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকেই থ হয়ে গেলাম।

ক্যাম্পখাটে বসে রয়েছেন কর্নেল ম্যালকট।

কর্নেল ম্যালকট।

অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে এভারেস্ট দেখছিলেন উনি। আমি

ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে মুখ ফেরালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব পাল্টে গেল। প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর অবাক হলেন, তারপর যেন শঙ্কিত হলেন। পর মুহূর্তেই জোর করে মুখে মিষ্টি হাসি টেনে এনে বললেন, ডক্টর যে!

আমার মুখে কিছুক্ষণ কোন কথা জোগালো না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

কর্নেল সহজ সুরে বললেন, আপনি কি এ ঘর ভাড়া নিয়েছেন?

ঘাড় নেড়ে নীরবে সায় দিলাম।

কর্নেল বললেন, দোরজী কিন্তু আপনার নাম বলল না তো!

দোরজী!—এতক্ষণে কণ্ঠস্বর ফুটল আমার।

হ্যাঁ। জিনিসপত্র সব চুরি হয়ে গেল কিনা। ট্রেকিং ইনকমপ্লিট রেখে প্রাণ বাঁচাতে ফিরে এলাম। দোরজী শেরপাই বাজার থেকে ধরে নিয়ে এল আমাকে। বললে একখানাই ঘর আছে এখন—এক সাহেবের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিন। আমি কি জানতাম আপনিই সেই সাহেব?

জানলে কি করতেন?—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম আমি।

কি করতাম?—আনমনে বলে ফের জানলা দিয়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইলেন কর্নেল। ঘরের মধ্যেও একটু একটু করে আঁধার জমা হচ্ছে তখন। উনি বললেন, মোমবাতি আছে তো?

নিরুত্তরে দেশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরিয়ে দিলাম। চোখ রইল কিন্তু কর্নেলের ওপর। দরজার কাছ থেকে খুব দূরে গেলাম না।

বিষণ্ণ মুখে আমাকে দেখছিলেন কর্নেল। বললেন, আপনি কি ট্রেকিং করতে এসেছেন?

না। আপনাকে ধরতে।

আমাকে ধরতে? কেন?

আমা'র মুখে শুনতে চান ?

চুপ করে রইলেন কর্নেল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমিও বলতে পারি। বলবার জন্যেই তো সেদিন গেছিলাম আপনার কাছে।

মোমবাতির ম্লান আলোয় কর্নেলের শীর্ণ মুখের একদিকই দেখতে পেলাম। সেদিকে কেবলই বিপদ। আর কিছু নয়।

বললাম, যখন বলতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই একটা টেলিফোন এল, আপনিও ছুটে পালিয়ে গেলেন। কেন পালিয়ে গেলেন, আমি তা জানি।

আপনি জানেন ?

হ্যাঁ, জানি। লো-টেবিলের ওপর একটা ফোটোগ্রাফ রেখে আমি ফোন ধরতে উঠে গেছিলাম। আপনি সেই ফটো দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে পালিয়ে গেছিলেন। ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে ফটোর মেয়েটির এতই যখন আঁতাত, তখন তো আপনার গোপন কাহিনী আমাকে আর বলা যায় না। কেন যায় না ? এই মেয়েটিই তো আপনাকে ব্ল্যাকমেলিং করে এসেছে বছরের পর বছর। আপনার গোপন কাহিনী একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ তা জানে না। এই মেয়েকেই সমুদ্র সৈকতে যেদিন থেকে বসে থাকতে দেখেছেন, আপনি সমুদ্রের ধারে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভয়ে—তাই না কর্নেল ?

কর্নেল চমকে উঠলেন।

আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করে বললাম, কিন্তু আপনি মস্ত ভুল করেছিলেন কর্নেল। যার ছবি আপনি দেখেছিলেন, সে মোহিনী নয়, ব্ল্যাকমেলার নয়—তারই যমজ বোন মালিনী।

মালিনী !

হ্যাঁ, মালিনী। মোহিনীর ঠিক উল্টো চরিত্রের মেয়ে। চেহারা

এক ধাকায় মোহিনী তার সুখের সংসার বারবার ভেঙে দিয়েছে। এবারেও ভেঙে দিয়ে গেল। মোহিনী যেমন আর বেঁচে নেই, মালিনীও তেমনি আর ইহলোকে নেই। মোহিনী খুন হয়েছে আর মালিনী আত্মহত্যা করেছে—না করলে পুলিশ তাকে ছাড়তো না।

ধীরে ধীরে ক্যাম্পখাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল : আত্মহত্যা করেছে?

বসুন।—বললাম আমি, সে মরে বেঁচেছে। কিন্তু তার নামের ওপর যে মিথ্যে অপরাধের বোঝা আপনি চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, তা নামিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। না, না, বসুন আপনি। এ ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টাও করবেন না। কর্নেল, আমি জানি, মোহিনীকে আপনিই গুলি করে খুন করেছিলেন।

আস্তে আস্তে ক্যাম্পখাটে বসে পড়লেন কর্নেল ম্যালকট। মুখ তাঁর আশ্চর্য রকমের শান্ত।

আমার গলা কিন্তু উত্তেজনায় কাঁপছে—স্বর ভেঙে গেছে। ভাঙা গলায় বললাম, মালিনী যদি রিভলবার চালিয়ে গুলিই করতো, রিভলবার ঘরেই রেখে যেত। পায়ের চটি পর্যন্ত যে ফেলে রেখে জলে গিয়ে ডুবে মরেছে, সে কি রিভলবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে? কর্নেল, আমি জানি সে রিভলবার খুঁজলে আপনার ব্যাগেই পাওয়া যাবে এখন। রিভলবারটা আমাকে দিন, পুলিশকে দেবো। ফরেনসিক রিপোর্ট পেলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে খুনী কে, প্রমাণিত হয়ে যাবে মালিনী নির্দোষ।

কর্নেল যেন পাথর হয়ে গেছেন।

কিন্তু আমার মাথায় তখন দেহের সমস্ত রক্ত যেন ঠেলে উঠেছে। মাথা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। ভাঙা গলায় তীব্রতর কণ্ঠে বললাম, দিল্লী গিয়ে খোঁজ নিয়ে আমি সব জেনেছি কর্নেল। মনের ডাক্তারের কাছে পাপের যে কাহিনী ব্যক্ত করে সুস্থ হতে গেছিলেন,

তা আর আমার অজানা নয়। এত বড় মহাপাপ আপনি করলেন কি করে কর্নেল? বন্ধুর তেরো বছরের মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে আপনি তাকে ভোগ করে গেছেন রাতের পর রাত। কৃষ্ণাঙ্গিনীদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের আকর্ষণ নতুন কিছু নয়। কিন্তু সে যে আপনার বন্ধুকন্যা—বাড়ন্ত গড়নের বলেই কি—

ডাক্তার!—ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন কর্নেল, এই কথাটাই খুলে বলতে গিয়েছিলাম আমি। আমি অসুস্থ কি সুরমা অসুস্থ, তা আপনাকে দিয়ে বিচার করতে গিয়েছিলাম। আমাকে উদ্দীপ্ত করে টেনে নামিয়েছে সুরমাই। আমার অপরাধ আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি। কতবার সামলে নিতে গেছি নিজেকে, কিন্তু সুরমা··· সুরমাই···তাই ওর বিয়ের ব্যবস্থা হতে খুশিই হয়েছিলাম। অথচ বিয়ের পরেও যখন দেখলাম যুবক স্বামী নিয়ে সে সুখী নয়, তখন—

আমি বললাম, আমি তা লক্ষ্য করেছি কর্নেল। সুরমার কথার মধ্যেই ওর মনোগত অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে। ওর আকর্ষণ বয়োবৃদ্ধদের দিকে—প্রায় সমবয়সীদের দিকে নয়। দাম্পত্য জীবনে তাই ওরা যে পুরোপুরি সুখী নয়, তা আঁচ করেছিলাম। তারপর যখন মালিনীর ফটো দেখে পালিয়ে গেলেন—রহস্যটা কোথায়, তা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এত নোংরামী কল্পনাও করতে পারি নি। আপনাকে আর সুরমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল মোহিনী। তাই সুরমাও মালিনীর ছবি দেখে মোহিনী ভেবে চমকে উঠেছে—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাই যখন মোহিনী গোবিন্দর পিসিমাকেও ব্ল্যাকমেল করবে বলে ঠিক করেছিল, তখন পিসিমা গোবিন্দ আর সুরমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল বাড়িতে সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে। আপনারা এই নিয়েই যখন কথা বলছিলেন, আমি গিয়ে পড়েছিলাম মাঝখানে। আর কথা বলতে পারেন নি। ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, ঠিক।

কর্নেল ম্যালকট, মোহিনীকে খুন করে মালিনীকে আত্মহত্যার পথে শুধু আপনিই ঠেলে দেন নি, দিয়েছে সুরমাও। সেই রাতে পিসিমা চেঁচিয়েছিলেন 'তুই ডাইনী, তুই কুলটা, তুই বেশ্যা' বলে। সত্যিই উনি হয়তো ওই বলেই চেঁচিয়েছিলেন—সত্যি কি মিথ্যে তা বলতে পারে সুরমা। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পিসিমা গালাগাল দিচ্ছিলেন সুরমাকেই—তার ভ্রষ্টা চরিত্রের পরিচয় পেয়ে। সুরমা আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি, পুরুষের মতই শক্তিমতী সে। তাই গলা টিপে পিসিমাকে শেষ করে দিতে সময় লাগে নি বেশি। মালিনীর ছবি সে দেখে গেছিল আমার কাছে। তাকে মোহিনী মনে করে খুনীর অপবাদে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর চমৎকার প্ল্যানটা সে বানিয়েছিল ওইটুকু সময়ের মধ্যে। কিন্তু এমনই কপাল তার, ঠিক সেই সময়ে পুলিশের লোকের সঙ্গেই ছিল মালিনী। নইলে তাকে আরো একটা মিথ্যে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হতে হতো। সুরমার টেলিফোন পেয়ে আমি খুন শব্দটা উচ্চারণ করতেই আপনি বুঝেছিলেন জল অনেকদূর গড়িয়েছে। মোহিনী যে পুরীতে এসেছে, সে খবরও আপনি রাখতেন। তাই সেই রাতেই তার পিছু নিয়েছিলেন—মালিনীর বাড়িতে তাকে গুলি করে খুন করে পালিয়ে আসেন নেপালে। আসবার আগে একটা চিঠি লেখেন সুরমাকে। প্রথম তিন লাইন লিখে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই ফেলে দেওয়া কাগজটা পড়েই আপনার ঠিকানা পাই। এই সেই কাগজ।

—বলে পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে টেনে নিলাম ভাঁজ করা কাগজটা : কর্নেল, সুরমাকে আমি প্রোটেক্ট করেছি এবং করব। কেননা পিসিমার মার্ডারের জন্যে মালিনীকে দায়ী করা হয় নি। কিন্তু আপনার অপরাধে অপরাধী হয়ে শাস্তি পাচ্ছে না মালিনীর আত্মা। আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিতে হবে—এইখানে, এখুনি। মোহিনীকে আপনি খুন করেছেন—মালিনীকে নয়। আপনার রিভলবারটাও আমাকে দেবেন—এখুনি।

হঠাৎ মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল কর্নেলের। এতক্ষণ যিনি শান্ত হয়ে শুনছিলেন আমার ভগ্ন স্বরের নায়েগ্রা-সম ধারাবিবরণী, সহসা তিনি কেন নিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকালেন দেখবার জন্যে আমি পেছন ফিরলাম।

দেখলাম, আমার ঠিক পেছনেই ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে সুরমা। পিস্তল নির্ঘোষটা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঝটিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছেন কর্নেল ম্যালকট। হাত থেকে ঠিকরে যাচ্ছে ধূমায়িত রিভলবার।

পিঠের ওপর একটা দেহ এলিয়ে পড়তেই পেছন ফিরে তাকে ধরে ফেললাম। অজ্ঞান হয়ে গেছে সুরমা। মেঝেতে শুইয়ে দিতে দিতেই দুমদাম করে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে এল শিমা শেরপা। হাঁপাতে হাঁপাতে বেগে ঘরে ঢুকেই বললে পরিষ্কার ইংরেজিতে: ইস্, গুলি চলবে ভাবতে পারি নি তো?

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম: শিমা তুমি ইংরেজি জানো?

অবাক হয়ে শিমা বললে, জানবো না কেন?

তবে কেন অ্যাদ্দিন ইংরেজি বলো নি?

ওপরতলার অর্ডার ছিল। আপনাকে আগলে রাখার জন্যেই আমি এসেছি—ইংরেজি বলতে নয়।

কে তোমার ওপরতলা?

আপনার বন্ধু।

বিপ্লব? বিদ্যুৎ চমকের মত সম্ভাবনাটা ভিড় করে এল মস্তিষ্কে।

হ্যাঁ। উনি জানতেন আপনার ওপর নজর রাখলেই মোহিনীকে যে খুন করেছে, তাকে ধরা যাবে। কেননা, হয় সে আপনার কাছে আসবে অথবা আপনিই তার কাছে যাবেন।

বিপ্লব! বিপ্লবের এত কুচুটে বুদ্ধি? আরও একটা সন্দেহের কালো ছায়া পড়ল মনের মধ্যে—কর্নেল ম্যালকটের নাম লেখা

ম্যাপটা মাথার কাছে কে রেখেছিল ? তুমি ?

মুখ কাঁচুমাচু করে শিমা বললে, ও, ইয়েস। আপনি কর্নেলের পেছন নিয়েছিলেন। তাই আপনাকে ওর নাগাল ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি। ম্যাপটা আমার—নাম লিখে দিয়েছিলাম কর্নেলের। পথের ঠিকানা আমি আগেই জানতাম।

রেগে গিয়ে বললাম, কিন্তু এত লুকোচুরি খেলে লাভ হল কিছু ? যার জন্যে বিপ্লব এত কাণ্ড করল, তাকে তো ধরতে পারলে না।

গম্ভীর হয়ে শিমা বললে, আজ্ঞে, তাকেই তো ধরেছি। আমরা ঠিক জানতাম সে আপনার কাছে আসবে।

শিমার কণ্ঠস্বরটা বড় অদ্ভুত। ভুরু কুঁচকে বললাম, কি বলতে চাও ?

সিঁড়ির দিকে চেয়ে শিমা বললে,ওই তো তার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

উঠে এল একাধিক পদশব্দ। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় প্রথমে উঠে এল বিপ্লব, তার পেছনে দোরজী, সবার পেছনে শুভ্রবসনা একটি নারীমূর্তি।

মালিনী পোদ্দার !

মাথা ঘুরে গেল আমার। টলে পড়ে যেতাম, যদি না শিমা তার সবল বাহু বাড়িয়ে ধরে ফেলত আমায়।

পুলিশ পোস্টে পৌঁছে বিপ্লব বললে, বাসু, এই ছলচাতুরীর জন্যে ক্ষমা করিস।

আমি তখন বাক্‌রহিত। বিমূঢ়। মস্তিষ্ক অসাড়। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছি মালিনীর মুখের দিকে। প্রেতিনী নয়—প্রাণবন্ত, গভীর নয়না সেই মালিনী।

বিপ্লব বললে, পুলিশকে দিয়ে পারমিটের ছুতো তুলে তোকে আমিই আটকে রেখেছিলাম এখানে। দোরজী গিয়েছিল কর্নেল

ম্যালকটের জিনিসপত্র লোপাট করতে, যাতে উনি ফিরে আসেন। আমরা নজর রেখেছিলাম কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে। জানতাম মালিনী তোর সব খবর রাখে—তোর পেছন পেছন ফাঁদে পা দেবেই। কাঠমাণ্ডু থেকে নামচি পর্যন্ত প্লেনে এসে পাহাড় দেখে সাহেবরা ফিরে যায়। প্লেনে আসার সুযোগটা আছে বলেই নামচিতে তোদের পাকড়াও করব ঠিক করেছিলাম। সত্যিই ফাঁদে পা দিলেন মালিনী পোদ্দার।

অতলান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল মালিনী—আমি চেয়ে রইলাম ওর দিকে। বিপ্লবের কথাগুলো মনে হল যেন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে ভেসে আসছে কানে—রাজকন্যে কিন্তু বসে আমার সামনেই।

বিপ্লব বললে, একই প্লেনে সুরমা আর মালিনী দেবীকে উঠতে দেখে মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। মালিনী দেবীকে অবশ্য সুরমা দেবী চিনতে পারেন নি—উপায়ও ছিল না। উনি বোরখা পরেছিলেন আগাগোড়া। পাছে ধরা পড়ে যান, এই ভয়ে। নামচিতে প্লেন ল্যাণ্ড করতেই ওঁকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তার পরেই দোরজী দৌড়োতে দৌড়োতে এসে বললে—এখুনি চলুন, খুনী ধরা পড়েছে। আসতে আসতেই খুনী সটকান দিল রে—কি ভোজ দিলি বল তো?

অবসন্ন কণ্ঠে বললাম, দোরজীও কি তোর লোক?

না। মালিনী দেবীর লোক।

মালিনীর দিকে ফিরতেই মাথা হেঁট করল সে।

বিপ্লব বললে, সত্যিই সতী সাবিত্রী। বড় ভালবাসেন তোকে। সারা জীবন তোকে চোখে চোখে রাখবেন ঠিক করেছিলেন। নেপালেও এসেছিলেন তোর পেছন পেছন, কিন্তু তুই হুট করে ট্রেকিংয়ে বেরিয়ে পড়ায় দোরজীকে পাঠিয়েছিলেন তোর ওপর নজর রাখার জন্যে।

বিপ্লব।—বললাম আমি, মালিনী যে বেঁচে আছে জানলি কি করে?

অনুমান করে।—হেসে বললে বিপ্লব, পুলিশের লোককে যতটা নিরেট ভাবিস, ততটা নিরেট তারা নয়। মালিনী যে মোহিনীকে খুন করে নি, তা ঘরের মধ্যে রিভলবার নেই দেখেই আঁচ করেছিলাম। রিভলবার হাতে নিয়ে সাড়ম্বরে কেউ জলে নেমে যায় না। রিভলবার নিয়ে গেছে যে, সে-ই যে খুন করেছে মোহিনীকে, আমি সেটা আঁচ করেছিলাম। তুই জানিস সে কে। তাই তোর ওপরেও নজর রেখেছিলাম। মালিনীর নামে মিথ্যে অপবাদ খণ্ডন করার জন্যে তুই যে দরকার হলে পৃথিবীটাকে চক্কর দিবি, তা তোর চরিত্র জানি বলেই পেছনে লোক রেখেছিলাম। প্র্যাকটিশ শিকেয় তুলে রেখে তোর নেপাল যাওয়াটাই তো সন্দেহজনক। পরে দিল্লী গিয়ে কর্নেল সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেই আমি আঁচ করেছিলাম তোর সন্দেহ কাকে। যাই হোক, পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম, মালিনী দেবীর পায়ের ছাপ জলে নেমে গেছে দেখেই তুই ভেঙে পড়েছিস, তখন তোর কাছে যখন ক্ষমা চাইছিলাম, তখনই জানি উনি জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে অন্য কোথাও বালিতে উঠে পড়েছেন। ঠিক কিনা?

হেসে ফেলল মালিনী।

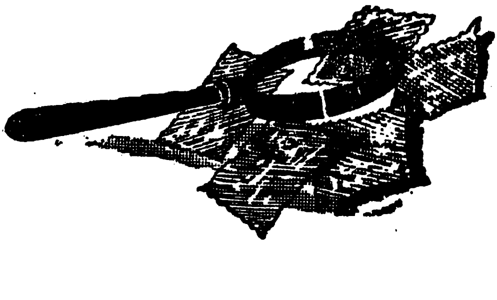

বিন্দু

শ্রীধর সেনাপতি

সন্ধ্যের একটু আগে থেকেই প্রকৃতি কী ভীষণ তাণ্ডবই না শুরু করেছিল। চিরাচরিত নিয়মবাঁধন যেন আর মানতে চায় না সে। বিশ্বচরাচরের সমস্তকিছু জিনিস ভেঙেচুরে ওলোটপালোট করে দেবার অদম্য ইচ্ছায় যেন তাকে সাময়িক ভাবে পেয়ে বসেছিল। বড় বড় গাছের অনেক শাখাপ্রশাখা ভেঙে পড়ল ভূতলে, কোন কোন গাছ স্বয়ংই ভূমিশয্যা নিয়েছে। গাঁয়ের কাঁচামাটির ঘর, ঘরের করোগেট টিন বা খড়ের চাল উড়িয়ে দিয়ে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, গাঁয়ের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে এটিকে। ঝড়-মেঘ বজ্র-বিদ্যুৎ এবং প্রবল বর্ষণ সন্ধ্যের আগমনটাকে বুঝতে দেয় নি।

থানার একতলা বাড়ি। মাত্র তিনখানা ঘর। সামনের কম্পাউণ্ডে নতুন একটা জলাশয় সৃষ্টি হতে দেখে ব্যাঙেরা উল্লসিত। জোর গলায় গান ধরেছে তারা। আশ্চর্য, এত শীঘ্র তারা খবর পেলো কী করে!

ঘরে বিদ্যুৎ সাপ্লাই নেই। তার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোথাও। কখন যে বিদ্যুৎ আসবে, সে প্রশ্ন আপাতত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-গর্ভে হয়তো ঘুমিয়েই পড়ল। কনস্টেবল মধু দাস একটা হ্যারিকেন জ্বেলে রেখে গেছে আমার টেবিলের ওপর। ঘরের জানলাগুলো খুলে রাখতে সাহস পায় নি। এখনও ভিজে হাওয়া ঘরের বাইরে মাঝে মাঝে দাপট দেখাচ্ছে। ঘরের ভেতরে কি ঢুকতে

দেওয়া যায়? ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দেওয়া ওটার স্বভাব। যাই হোক, বাইরের হাওয়াকে ভেতরে ঢুকতে না দিলেও একটু ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ তৃপ্তির আমেজ পাওয়া যাচ্ছে।

একটা প্রয়োজনীয় ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। পায়ের জুতোর আওয়াজ তুলে মধু ঘরে ঢুকল। এই সুযোগে খোলা দরজা দিয়ে একঝলক হাওয়া এসে খোলা ফাইলের কাগজপত্রগুলোকে মুহূর্তের জন্যে একটু নাড়াচাড়া করে নিল।

মধু কর্তব্যসজাগ ভঙ্গিতে বলল, সেই মেয়েছেলেটা এসেছে, বড়বাবু।

মেয়েছেলেটা! কার কথা বলছো?

ওই যে, বিন্দু! বংশী মাকালে'র মা। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

চুপ করে রইলাম। মধুর মুখের ওপর থেকে চোখ ছুটো সরে এল। সামনে রাখা হ্যারিকেনের আলোর জ্যোতিটা যেন পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ। আলোকে ঘিরে ওড়াউড়ি করছে ছু'চারটে বাদলে-পোকা।

মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বিন্দু মাকালের হয়তো অনেক কিছু বলবার আছে আমাদের কাছে। অনেক নালিশ। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আর এত তাড়াতাড়ি তার সেই সমস্ত অভিযোগের মুখোমুখি হতে মন আমার যেন প্রস্তুত হয়ে নেই। অথচ পুলিশের কর্তব্য ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও একটা দিক আছে। মানবিকতা। সেদিক দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে বিন্দু মাকালের বক্তব্য আমার শোনা উচিত।

আমার নির্দেশের অপেক্ষায় কনস্টেবল টেবিলের সামনে অপেক্ষা করছে।

তাকে বললাম, বিন্দুকে আর একটু বসিয়ে রাখো। আগে একবার বিমান বোসকে এখানে পাঠিয়ে দাও। কী করছে সে এখন?

বিমানবাবু কোথায় যেন গেছেন, স্যার।—মধু দাস অপরাধীর

মত বলল, আমি ঠিক জানি না—

কোথায় গেছে? কখন? একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। হঠাৎ এমন একটা অভাবনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মত জরুরি কাজের ডাক সে পেলেও আমি জানবো না, এমনটা হয় না। তার কর্তব্যকর্মের নির্দেশ যাবে আমার কাছ থেকে—এটাই তো নিয়মের মধ্যে আছে।

ঝড়বৃষ্টি শুরুর আগেই সাইকেল নিয়ে তাকে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত থানায় ফিরে আসেন নি।

আমার থানার সশস্ত্র কনস্টেবল সবেধন নীলমণি এই বিমান বোস। বয়স চল্লিশের নিচে। স্বাস্থ্যবান। তার বাইরের আচরণ দেখলে মনে হয় খুবই সাহসী বেপরোয়া প্রকৃতির। তার মধ্যেও যে অমন একটা কোমল প্রাণ লুকিয়েছিল ভাবতে পারি নি। আশ্চর্য, গতকালের ঘটনাটা তাকে যেন একেবারে উদভ্রান্ত করে দিয়েছে।

মধু দাসকে বললাম, ঠিক আছে। মিনিট দশ বাদে বিন্দু মাকালকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কনস্টেবল চলে গেল।

ফাইল নিয়ে বৃথাই নাড়াচাড়া করতে লাগলাম তারপর। কাজে আর মন বসাতে পারলাম না। মনের দৃষ্টি বারবার পিছন ফিরতে লাগল। এই অজ গ্রামের থানার ভার নিয়ে আমার আসার পর তখনও বোধ হয় একটা বছরও পূর্ণ হয় নি। সেই সময়।

ছায়াছবির মতো আমার চোখের সামনে দিয়ে মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়ে যেতে থাকে পর পর কয়েকটি দৃশ্য এবং প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে রাজবংশীদের বিধবা বধূ বিন্দু মাকাল। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। একমাথা ঘন কালো কোমর-ছোঁয়া চুল। ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে। শরীরের লম্বা গড়ন যৌবনকে তখনও যেন সে দেহবন্দী করে রেখেছে। পরনে অতি সাধারণ শাড়ি জামা। কিন্তু দেহের চটকে শহুরে সম্ভ্রান্ত অনেক তরুণীকে যেন সে হেলায় পিছনে ফেলে এগিয়ে আসতে

পারে।

ধীবর সম্প্রদায় এরা নয়। তবুও পশ্চিম বাংলার এ অঞ্চলে এদের অধিকাংশের পেশা মাছ ধরা এবং হাটেবাজারে সেগুলি বিক্রি করা।

বিস্তীর্ণ এক মাঠের মাঝখানে এদের ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। বর্ষাকালে সমস্ত মাঠ যখন জলে থৈ থৈ করত, ধানের চারা সেই জলের ভেতর থেকে মাথা উঁচিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে মৃদু ছন্দে নৃত্য করত, তখন এই গ্রামের রূপ হত একটা সবুজ দ্বীপের মত। হাটেগঞ্জে যেতে হলে তালগাছের তৈরি ডোঙা-নৌকো ছিল একমাত্র ভরসা। এখন অবশ্য হাটেগঞ্জে যাওয়ার নতুন সড়ক-পথ তৈরি হয়েছে ওই গ্রামে।

একদিন অপরাহ্ণ বেলায় থানার বারান্দায় আরামকেদারায় শুয়ে একটু মৌজ করছিলাম। কনস্টেবল এসে বললে, বড়বাবু! একটি মেয়েছেলে ডায়রী লেখাতে এসেছে।

কেন? কী কেস?—কথাটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ না করে শুয়ে শুয়েই নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। শব্দটাকে অনুসরণ করে ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম।

বিন্দু মাকালকে ওই সময়েই আমার প্রথম দেখা। বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিল বারবার।

কনস্টেবল মেয়েটিকে হাতের ইশারায় আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে বলল।

পা পা করে আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল সে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি আটকা পড়ল তার মুখের ওপর। চোখের ওপর থেকে সে তখন আঁচল সরিয়ে নিয়েছে। কিছুটা রক্তিম হয়ে উঠেছে কান্নাভেজা ফর্সা মুখখানা। ছলছল চোখ। যেন এক সাক্ষাৎ বিষাদপ্রতিমা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি প্রশ্ন করার কোন সুযোগই পেলাম না প্রথমে। বিন্দু আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তার পিঠের

ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। সস্তা দামের জীর্ণ একটি জামা পায়ে। বুকের একপাশে ছেঁড়া একটা অংশ দিয়ে পুরুষ্টু স্তন প্রকট হয়ে পড়েছে। ওখানে রক্তের চিহ্ন। ঘাড়ের ওপর একটা লম্বা মসীরেখা।

আমার দিকে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বিন্দু ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, দেখলেন তো দারোগাবাবু, আমার ওপর অত্যেচারটা কেমনধারা হয়েছে দেখুন।

নোটবই খুলে শুধোলাম, কী নাম তোমার?

বিন্দু—বিন্দু মাকাল।

কোথায় বাড়ি?

গ্রামের নাম বলল। থানা থেকে দু-আড়াই কিলোমিটার দূরে।

কে তোমাকে এভাবে মেরেছে? তোমার স্বামী?

হুঁ, সোয়ামী! একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল বিন্দু মাকালের। তারপর কান্নায় কণ্ঠস্বর ফের রুদ্ধ হয়ে গেল। শাড়ির আঁচল চেপে ধরল চোখের ওপর। তাকে সামলে ওঠার আর একটু সময় দিলাম।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই মিনসের জন্যিই আজ আমার এই হাল, দারোগাবাবু—

আমি রাগে ফুঁসে উঠলাম, বটে! এই মধু, এর জানোয়ার স্বামীটাকে এখনই বেঁধে টানতে টানতে এখানে নিয়ে আসবে। হারামজাদাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কত ধানে কত চাল—

বিন্দু কান্না ভুলে 'আঁক!' করে একটা শব্দ করল মুখে। তারপর বলল, আপুনারা তাকে কুথায় পাবেন গো! সে কি ইহসংসারে আছে নাকি? পর পর ক'বার বাহ্যিবমি করে একদিনের ভেতরেই টেঁসে গেল। গেল তো গেল, তার আগে আমার প্যাটে শত্তুরটাকে ভরে দে' গেল ওই নেমকহারাম মিনসে। ওই শত্তুর এখন আমার ওপর শোধ নিচ্ছে।

এতক্ষণে বোঝা গেল বিন্দু মাকাল বিধবা।

তোমার ছেলেই তাহলে তোমার ওপর অত্যাচার করেছে এই

ভাবে ?

হ্যাঁ, আমার প্যাটের শত্তুর বংশী।

কয়েক সেকেণ্ড আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম। বংশী মাকাল শিশু-কালে যে সুধাভাণ্ড লুটেপুটে খেয়ে বড় হয়েছে, সেখান থেকে এখন আর সুধা নয়, রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

বিন্দু বলল, আমাদের গাঁয়ের কিষ্টোবাবু বুললে, তুই কত আর সহ্যি করবি। পেরায়ই তো জ্বলে পুড়ে মরচিস। থানায় যা। দারোগাবাবুরে বুলে আয় সব বিত্তান্ত। বংশীরে দারোগাবাবু যেন একটু টাইট দিয়ে দেন। তাই আমি এখেনে এইচি, দারোগাবাবু। কিষ্টোবাবু আরও বুললে, তুই বলে আয়। আমি পরে দারোগাবাবুর সাথে দেখা করব'খন। ছেলিটারে এটটু শাসন করি দেয়ার দরকার হইছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিষ্টবাবু কে ?

প্রশ্ন শুনে বিন্দু মাকাল রীতিমত অবাক ঃ হাই মা। কিষ্টোবাবুরে চেনলেন না গো ? আমাদের গাঁয়ে তো উনি সব্বেসব্বা। পঞ্চাত মেম্বর। আমরা সবাই ভোট দিয়ে ওরে খাড়া করিচি। আমাদের ভালমন্দ দেখভাল করা তো কিষ্টোবাবুর কাজ।

কত বয়স হবে তোমার ছেলের ?

অ্যাই। তবেই বুঝুন দারোগাবাবু। দুধের ছানা নয় তো কী ? আমার বয়স য্যাখন চোদ্দ কি পনেরো—উ ত্যাখন সবে আমার প্যাটে এয়েছে। এখনি ওই ছেলি গঞ্জের হাটে বন্ধুস্যাঙাৎ জুটটেচে অনেকগুলো। মুখের বুলি শুধু ট্যাকা দে, ট্যাকা দে। বন্ধুরা সবাই ফুর্তি করচে, আমি করবুনি ? তো, বংশেরে, আর এটটু বয়েস বাড়ুক, ত্যাখন নাহয় আনন্দফুর্তি করবি—শুনব, বুঝব। কিন্তুক ছেলে শুনবে নি। ট্যাকা—ট্যাকা চাই। ট্যাকা দে। আমিও দোবনি, উ-ও ছাড়বে নি। হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়েই—

বিন্দুর গলার স্বর ফের কান্নায় বুজে এল।

সেদিন তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে থানা থেকে বিদায় করলাম। উপলব্ধি করেছিলাম, ছেলের প্রতি অভিমানক্ষুব্ধ বিন্দু মাকাল যেন একটু দিশেহারা হয়েই থানায় ছুটে এসেছিল। আমার কাছ থেকে পাওয়া সহানুভূতি বিন্দুকে শেষ পর্যন্ত খুশি করতে পেরেছিল ওদিন।

এ ঘটনার পর আবার একদিন থানায় এল বিন্দু। এসেই প্রায় একটা চৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল।

কী ? হলো কী আবার ?

বিন্দু মাকালের মুখে ঝকঝকে হাসি।

দারোগাবাবুদের জন্যি এটটা জিনিস এনিচি গো। বলেই থলির ভেতর থেকে একটা বড়সড় চিতল মাছ বের করে দিল।

আমরা দারুণ খুশি। অমায়িক হেসে বললাম, তোমাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম, তোমার ছেলেটা বুঝি আবার তোমাকে মারধর করেছে—তাই নালিশ জানাতে এসেছ কের ?

বিন্দু খুশি-খুশি গলায় বলল, একদিন শত্তুরটারে আমি আপুনাদের দরবারে এনে হাজির করবো। করবোনি ভেবেছেন ? নিঘ্যাৎ আনবো। বড্ড বেড়ে উঠেচে। তবে এখুন আর আমার গায়ে তেমন হাত তোলে না।…এটটা কথা দারোগাবাবু—

বলো।

বিন্দু বার দুই ইতিউতি তাকাল। মাছটা নিয়ে মধু দাস চলে গেছে। থানার বারান্দায় এখন আমি আর বিন্দু ছাড়া কেউ নেই। মনে হল বিন্দু নিভৃতে আমাকে কিছু বলতে চায়। অথচ কোথাও যেন একটা বাধা পাচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার বংশীর কথা কিছু বলবে নাকি ? কোন গোপন খবর ?

ইদানীং লোক মারফৎ খবর আসছিল হাটের পথে এবং হাটের মধ্যেও নানান উৎপাত শুরু করেছে কয়েকটি ছেলে। জোর করে

চাঁদা আদায় ঝগড়া-মারামারি পর্যন্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। বিন্দুর ছেলে বংশী মাকালও রয়েছে নাকি ওই দলে। সাট্টা জুয়ার আসরও পাতা হচ্ছে আজকাল। উঠতি এইসব মস্তানদের একটু ভয় দেখানোর মতলবে আমি বিমান বোসকে একটা রাইফেল দিয়ে মাঝেমধ্যে হাটের দিকে টহল দিতে পাঠাই। নামে হাট। আগে অবশ্য তাই ছিল। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসতো। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের চাহিদাও বাড়ছে প্রতিদিন। তাই ওই হাট এখন বাজারে পরিণত। ছোট-বড় অনেক দোকানও হয়ে গেছে ওখানে।

বিন্দুর সাবধানী দৃষ্টি ফের এপাশ ওপাশ থেকে ঘুরে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, আচ্ছা, আজ থাকুক দারোগাবাবু। কথাটা এখুনি চাউর হয়ে গেলে···হ্যাঁ, বিপদ। খুবই ভয়ের কথা। আজ আমি যাই। মাছটা খেতে কেমুন নাগল বুলবেন একদিন।

সত্যিই, ভয় পাওয়া মানুষের মতোই যেন ওদিন পালিয়ে গিয়েছিল বিন্দু মাকাল। আমার মনে তার ছেলে বংশী সম্পর্কে একটা গভীর সন্দেহ জাগিয়ে দিয়ে যায়। হয়তো এখন সে নেশা-ভাঙ করে আগের চেয়ে অনেক বেশি বেপরোয়া হিংস্র হয়ে উঠছে তার নিজের জন্মদাত্রীর ওপরেও। বিন্দু আগের চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে।

সেদিন থেকে বিমান বোসকে হাটের দিকটা একটু বিশেষ ভাবে নজর রাখতে বলেছিলাম। এ অঞ্চলে যেন কোন বড় রকমের অশান্তি না ঘটে। বলেছিলাম, বোস, বংশী মাকালটাকে একটু চোখে চোখে রেখো।

বিন্দুর দেওয়া টাটকা চিতল মাছের স্বাদ আমাদের জিভ কতটা তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছে, সে খবর নিতে আর আমার কাছে আসে নি বিন্দু মাকাল। হয়তো আসতে ফুরসৎ পায় নি।

কয়েক মাস বাদে বিন্দু ফের থানায় পা দিল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়

মাথায় নিয়ে।

ঘরের বন্ধ জানলায় ফের আছড়ে পড়তে লাগল ঝড়ো হাওয়া। কানে আসছে মেঘের গুরু গর্জন। মধু দাস এসে বলল, ঝড়জল আবার নতুন করে শুরু হল দেখছি। বিমানবাবু তো এখনও ফিরে এলেন না—

বললাম, বিন্দু মাকালকে এবার এখানে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু বিন্দু ইতিমধ্যে মধু দাসের পিছনে পিছনে চলে এসেছে ঘরের মধ্যে। ইশারা করলাম। মধু দাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হ্যারিকেনের আলোটা এই সময়ে বারকয়েক দপদপ করে নেচে উঠল। এই গেল বুঝি নিভে। ভেজাল তেলের কারসাজি। নাহ্, আলোর শিখাটা ফের উজ্জ্বল আর স্থির হয়ে গেল। সবকিছু চোখে পড়ছে।

আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিন্দু। জলে ভেজা জামাকাপড় লেপটে রয়েছে তার দেহে। মেঝেতে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। মাথার খোলা চুল কিছু বুকে, কিছু কাঁধে, কিছু পিঠের ওপর জট পাকিয়ে কালো কালো সাপের মত ঝুলে রয়েছে। সঙ্কীর্ণ কপালের ওপরও লেপটে আছে কিছু চুল। তার হাতে একটা চটের থলি। কী আছে ওতে কে জানে। দু'চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে বিন্দু মাকাল আমার সামনে নীরবে কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইল। চোখের কোলে কালি।

আমার কাছ থেকে একটু দূরে যে বেঞ্চখানা আছে, সেটাকে হাতের ইশারায় দেখিয়ে বললাম, বিন্দু, বসো ওখানে।

বিন্দু ধীরে ধীরে বসল পুতুলের মত। বেঞ্চে নয়, আমার মুখোমুখি ঘরের মেঝের ওপর।

নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে নেবার একটু প্রয়োজন বোধ করলাম। আমার সাধ্যমত এখন সান্ত্বনা দিতে হবে বিন্দু মাকালকে। কাজটা একটু কঠিনই মনে হতে লাগল। আহা, এই

মুহূর্তে যদি বিন্দুর মনের ভেতরটা পড়ে নেওয়া যেত। তাহলে আমার পক্ষে হয়তো সহজ হতো ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজটুকু। যা হবার হয়ে গেছে। আমরা আর কী করতে পারি এখন ? বিন্দুর মনের শোক-তাপ-জ্বালা আমার মুখের ক'টা কথা দিয়ে আমি কি জুড়িয়ে দিতে সক্ষম হবো।

বিন্দু মাকাল আমার ঘরের মেঝের ওপর বসে এখন পাষাণ হয়ে গেছে।

ইতস্তত করে অনেকক্ষণ বাদে অবশেষে আমি বলতে পারলাম, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, বিন্দু। তুমি আগেও তো এখানে এসেছিলে তোমার ছেলের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে। আমরাও মানি, সঙ্গদোষে ভাল ছেলেও খারাপ হয়ে যায়। তাই বলছি, সেই পুরোনো নালিশের কথাগুলোই যদি তুমি, মানে তোমার কাছ থেকে যদি একটা বিবৃতি পাই, তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হতো। যা হয়ে গেছে···নতুন করে তা তো আর কোনদিন হবে না। ঠিক বলছি কিনা বলো। তুমি এখন বলো, তোমার ছেলে বংশী বরাবরই এই রকম ছিল। বেপরোয়া। খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা···এই রকম আর কী। বলো তোমার কথা।

কথাগুলো বলতে বলতে, বিন্দুকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তার হাত দুটো চটের থলিকে যেন আগের চেয়ে কঠিন-ভাবে চেপে ধরল

কী আছে বিন্দু মাকালের হাতের ওই থলিটার ভেতর ?

এমন সময়ে বাইরে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলো ঘরের ভেতরের অবশিষ্ট অন্ধকারকে চমকে দিয়ে গেল। গুড়গুড় আওয়াজ এল ভেসে।

অবশেষে বিন্দু মুখ খুলল। গলায় স্বর অতি ক্ষীণ, দুর্বল : আমার কথা। কেন বলবুনি, দারোগাবাবু। বুলব।—বিন্দু একটু দম নিল।

আমি নোটবই-কলমের ওপর তাড়াতাড়ি হাত রাখলাম।

আমার ছেলিকে আপুনার পুলিশ খুন করেচে। আমার বংশী—

আমি সজোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, না, না বিন্দু, ভুল—ভুল। তোমাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে মনে হয়। তোমাদের বিমান বোসের মুখ থেকেই তুমি নিজের কানে শুনে যেতে পারতে গতকাল আসলে কী ঘটেছিল। আজ সন্ধ্যের আগে, ঝড়বৃষ্টি তখনও শুরু হয় নি—বিমান কোথায় যেন বেরিয়েছিল। পথে নিশ্চয়ই আটকা পড়েছে, এখনও ফিরতে পারে নি। আশা করছি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে এসে পড়বে। তুমি তাকে চেনো না। খুউব ভাল মানুষ। গতকালের ঘটনাতে সেও মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছে। খারাপ লোক সে নয়। পুলিশের চাকরিতে তার সুনাম আছে যথেষ্ট। মোট কথা, বিমান বোস সহজে মাথা গরম করে না। গোঁয়ার বা অবুঝ নয়, বুঝলে? আমার কথা—অন্তত আমি তোমাকে যা বলছি, তুমি বিশ্বাস করো, বিন্দু। হাটে জুয়ার আড্ডাতে গণ্ডগোল বেঁধেছিল। সেটা যাতে বেশিদূর না গড়ায় সেই চেষ্টাতে বাধা দিতে এগিয়েছিল বিমান বোস। তো তোমার ছেলে বংশী হঠাৎ বিমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে থানার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল। মাটিতে পড়ে গেল দুজনেই। আর তখন রাইফেল থেকে একটা গুলি ছুটে বংশীর বুকে—তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছো। কপাল! কী আর করবে বিন্দু, মেনে নাও—

না!—চিল-চিৎকার দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিন্দু। হাতের থলি বুকে চেপে ধরে বলল, এই দারোগাবাবু! আপুনি যা বলছেন, সব মিথ্যে মিথ্যে। সত্যি নয়। আমি মানবুনি। তুমাদের ওই পুলিশটা ছিল ভাল মানুষ, খারাপ নোক নয়, তাই না? থুঃ থুঃ। ওটা ছিল হারামী শয়তানের বাচ্চা। ওটার লেগে আমি হাটেবাজারের পথে জ্বলে মরিচি। রাতে আমার ঘরে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুতে পারতাম না। রাত সাঁই সাঁই করচে, বলাকওয়া নেই শয়তানের বাচ্চা হুট করে গিয়ে ঢুকে পড়ত আমার

ঘরে। আমি একদিন এখেনে বুলতে এসেছিনু। মনে পড়ে মাছ নিয়ে এসেছিনু? বুলব বুলব করেও ভরসা পাইনি। ওই হারামী আমাকে শাসিয়েছিল কুনো কথা ফাঁস হলে আমার ছেলির সঙ্গে আমাকেও খতম করি দেবে। আমি তুমাদের কি বলেছিনু উসব কথা? তবু দেখো আমার ছেলিকে শয়তানের বাচ্চা খতম করি দিল গো!

উচ্ছ্বসিত কান্নায় লুটিয়ে পড়ল বিন্দু। হ্যারিকেনের আলোটা ফের দপদপ করে নেচে নেচে উঠছে। বাইরে থেকে বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ার শব্দ কানে আসছে। আমার বাকশক্তি যেন সাময়িক ভাবে ছিনতাই করে নিয়েছে রাজবংশীদের ওই তরুণী বিন্দু মাকাল।

ক্ষণকাল বাদে বিন্দু মাকাল ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াল আমার সামনে। এবার তার চোখের আগুনে অশ্রুকে বিদায় করে চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলতে লাগল, তুমাদের ওই বিমান বোস কুথায় জানো-নি দারোগাবাবু? সাঁঝের আগে ঝড়ের মতই সে গিয়ে ঢুকেছিল আমার ঘরে। পাগলা কুত্তার মত মূর্ত্তি! দেখতে দেখতে আমার ওপর ঝাঁপ দে' পড়ল। কিন্তুক হারামী কুত্তা বিন্দু মাকালকে চিনতে পারে নি। মাছকাটা ধারালো বঁটিটা ছিল হাতের কাছে। তার একটা কোপেই··· বিশ্বাস করবে নি আমার কথা দারোগাবাবু? তাই তো কুত্তার রক্তমাখা ওই বঁটিখানা আমি নিয়ে এসেছি তুমাদের কাছে। এই ন্যাও—

হাতের থলিটা বিন্দু সজোরে রাখল টেবিলের ওপর। যেটুকু আওয়াজ উঠল, তার চেয়ে আমার নিজের বুকের আওয়াজ যেন শতগুণ বেশি হয়ে আমার কানে বাজল। একটা বাজ পড়ল কোথাও। হ্যারিকেনের আলো গেল দপ করে নিভে। আর আমি —অমুক থানার বড়বাবু ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ রাতে নিশ্ছিদ্র গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিন্দু মাকালকে সামনে নিয়ে বজ্রাহত হয়ে বসে রইলাম। বাইরে প্রমত্ত ঝড় হা হা করে নেচে বেড়াতে লাগল।

ভগ্ন অংশ ভাগ

মনোজ সেন

শিবেন প্রশ্ন করল, 'অশোকনাথ ঘোষালের নাম জানা আছে ?'

দময়ন্তী বলল, 'না।'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, জানা আছে। যদি প্রোগ্রেসিভ ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান এ এন ঘোষালের নাম হয়।'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, ওই নামই বটে। এঁর সম্বন্ধে তুই কি জানিস ?'

'তেমন কিছু নয়। অনেকগুলো কম্পানীর ডিরেক্টর, এককালে বোধ হয় বিখ্যাত বৃটিশ ফার্ম স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লোম্যাক্সের চীফ ছিলেন, রায় বাহাদুর বা রায়সাহেব ধরনের খেতাব পেয়েছিলেন। ভালো লোক, কেবল ফার্মাসিউটিক্যালসই নয়, সব ইণ্ডাস্ট্রির লোকেরাই এঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে থাকে। বয়সের গাছপাথর নেই, অথচ শুনেছি রোজ গল্‌ফ খেলেন।'

'বাঃ, তুই তো অনেক কিছুই জানিস দেখছি। ভদ্রলোকের বাড়ি কোথায় জানিস?'

'নাঃ। চেয়ারম্যান কোথায় থাকেন সে সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র ধারণা নেই।'

'হাঁসপুকুর লেনের নাম শুনেছিস? জোড়াসাঁকোয়। তার তিন নম্বর বাড়িতে।'

'অত্যন্ত সুসংবাদ। তা, আমাদের কি করতে হবে? তিনি কি ওই হাঁসপুকুর না কি বললি, সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ? হ্যাঁ মানে কি?' সমরেশ আর দময়ন্তী সমস্বরে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ মানে হ্যাঁ। বড়কর্ত্তাকে অনুরোধ করেছেন যেন আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা আমি তোদের নিয়ে ওঁর বাড়িতে যাই। বৌদির সঙ্গে ওঁর কি সব পরামর্শ আছে। মিস্টার ঘোষালের নিজেরই এখানে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে সে ইচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় কার্যে পরিণত করতে পারছেন না। যদি আপনি যেতে না পারেন, তাহলে কাল সকালের মধ্যে লালবাজারে বড়কর্ত্তাকে জানিয়ে দেবেন সেকথা। তবে, আপনি গেলে উনি খুব খুশি হবেন।'

দময়ন্তী ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'সে তো বুঝতে পারছি। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল আমার নাম জানলেন কোত্থেকে?'

শিবেন সহাস্যে বলল, 'আপনার যে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? কাজেই, কোত্থেকে জানলেন সে প্রশ্ন বাহুল্য মাত্র।'

'ইয়ার্কি করবেন না তো। এত বড় একজন মানুষ, আমার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক থাকতে পারে ? আপনি কিছু জানেন ?'

'একেবারেই না। কাল তো শনিবার, সন্ধ্যেবেলা ট্র্যাফিক বেশ বেশিই হবে। আমি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসব, তাহলে ঠিক সন্ধ্যের মুখে জোড়াসাঁকোয় পৌঁছে যাওয়া যাবে। তখনই সব ব্যাপারটা বোঝা যাবে।'

সমরেশ বলল, 'এইরকম এঁদো গলিতে তোর চেয়ারম্যান ঘোষালের বাড়ি ?'

শিবেন অত্যন্ত সাবধানে ওর ফিয়াট গাড়িটা গলিতে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'ছাখ সমরেশ, প্রথমত, এই ঘোষাল আমার চেয়ারম্যান নন। দু নম্বর, এটা গলি ঠিক, কিন্তু এঁদো নয়। দুপাশের বাড়িগুলো দেখেছিস ? এখানকার লোকেরা লাখ টাকার নিচে চেক লেখে না, বুঝলি ! এই সব বাড়িগুলোর দলিলে ওয়ারেন হেস্টিংসের সই আছে। বন কেটে বসত।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। পলাশী যুদ্ধের আমলের যত বাড়ি। ভেতরে নিশ্চয়ই ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূতও আছে।'

'তা থাকা অসম্ভব নয়। এই যে, তিন নম্বর এসে গেছে। বাপরে, গেটের কী বাহার।'

কেবল গেট কেন, সমস্ত বাড়িটাই দেখবার মত। অনেকটা সবুজ জমির মধ্যে ইংরেজি রূপকথার বইয়ে আঁকা দুর্গের মত দেখতে বাড়িটা। দেখলে যেমন বিস্মিত হতে হয়, তেমনি কেমন ভয়ও করে। মনে হয় সত্যি সত্যি যেন এর অন্ধকার ছায়া ছায়া আনাচে কানাচে এ বাড়ির পূর্বপুরুষদের জটলা চলেছে। যেন পুরোনো

কলকাতা চলে যেতে যেতে এইখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আকাশে তখনও দিনের শেষ আলো, অন্ধকার নামতে কিছু দেরি আছে। সেজন্যে বাড়িটাতে তখনও আলো জ্বলে নি, কেবল গেটের দুপাশে থামের মাথায় কারুকার্য করা রট-আয়রনের লণ্ঠনে আলো জ্বলছে। সেই আবছায়া আলোয় বাড়িটাকে রূপকথার দুর্গের মতই অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

শিবেনের গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াতে বাড়িটার মতই এক অতি প্রাচীন দরোয়ান দরজা খুলে দিল। একমাত্র গেট খোলা ছাড়া দরোয়ানের আর কোন কর্তব্য যে থাকতে পারে সেরকম মনে হল না। কিন্তু গাড়ি-বারান্দার নিচে যে অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে অবশ্য অতটা প্রাচীন নয়। তার পরনে সাদা পাজামা, সাদা গলাবন্ধ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট, মাথায় সাদা গান্ধী-টুপি। বিনয়ে আনত হয়ে সে অতিথিদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

সাদা গান্ধীটুপি অতিথিদের যে স্বল্পালোকিত ঘরে ঢুকিয়ে বিনীত ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, সেটা একটা লাইব্রেরী। একপাশের দেওয়ালে তিনটে রঙিন কাচ বসানো খিলেন করা লম্বাটে জানলা আর বাকি তিনপাশের দেওয়ালে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু বই-ভর্তি অতিকায় আলমারির সার। একটা আলমারির সামনে দিকের ওপরের তাকগুলো থেকে বই পাড়ার জন্যে তলায় চাকা লাগানো একটা ঘড়াঞ্চি রাখা আছে। মেঝেয় পুরু কার্পেট। জানলাগুলোর সামনে একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সামনে গোটা-চারেক কারুকার্য করা উঁচু ব্যাকরেস্ট-ওলা চেয়ার। টেবিলের উল্টোদিকে একটা রিভলভিং চেয়ারে একজন বসে ছিলেন। অতিথিদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বলিরেখাচ্ছন্ন মুখ, শীর্ণকায়, পক্ককেশ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ, চোখে মোটা

কাচের মোটা ফ্রেমের চশমা, পরিষ্কার করে কামানো মুখ, পরনে চিকনের কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি। একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন, সেটা দাঁড়াবার স্বাভাবিক ভঙ্গিও হতে পারে, বয়েসের ভারেও হতে পারে। মুখে স্মিত হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি সজাগ ও তীক্ষ্ণ।

শিবেন এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল, তারপর বাকি দুজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বৃদ্ধ হাত নেড়ে নেড়ে অতিথিদের বসতে বলে নিজেও বসলেন। কিছুক্ষণ দময়ন্তীকে দৃষ্টি দিয়ে যেন যাচাই করে নিয়ে বললেন, 'তোমার এত কম বয়েস আমি বুঝতে পারি নি। তুমি করেই বললুম, কিছু মনে করো না।' ভদ্রলোকের গলা অনুচ্চ এবং গম্ভীর।

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'মনে করব কেন? আপনি তুমি করেই বলবেন।'

বৃদ্ধও হাসলেন। বললেন, 'ভালো কথা। তা, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি তোমার খোঁজ পেলুম কোত্থেকে। পেয়েছি আমার এক নাতনীর কাছে, সে তোমার ছাত্রী। বি-এ পড়ছে।'

'কি নাম?'

'সেটা বলা বারণ আছে। দেখলুম প্রফেসর ডি-ডি-জিকে সে যেমন ভক্তি করে তেমনি ভয়ও পায়। তা থাক সে কথা। আমি তোমাকে যে কারণে ডেকেছি, আগে সে কথাটা সেরে নিই। তবে তার আগে বল কে কি খাবে। সেনসাহেব, হুইস্কি চলবে তো?'

শিবেন অম্লানবদনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আপনার? হুইস্কি?'

সমরেশও বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মতি জানাল।

'আর তোমার? শেরি?'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না। একটু কফি হলে ভালো হত।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পান্নালাল, দুটো হুইস্কি, একটা কফি আর আমার জন্যে একটা ছোট কনিয়াক নিয়ে এস।'

দরজার কাছে চিত্রার্পিতবৎ গান্ধীটুপি হঠাৎ মাথাটা একবার সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অশোকনাথ ঘোষাল বললেন, 'আমরা তাহলে শুরু করতে পারি?'

দময়ন্তী এইবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'যে সমস্যাটা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই, সেটা ঠিক আমার সমস্যা নয়, আমার ছেলের।'

দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'আপনার ছেলে কোথায়?'

'সে এ বাড়িতে থাকে না। যোধপুর পার্কে তার বাড়ি।'

'আপনার কি একই ছেলে?'

'হ্যাঁ। এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সে থাকে মাদ্রাজে। আমার জামাই সেখানে ডাক্তারি করে।'

'আপনার স্ত্রী?'

'তিনি বহুদিন গত হয়েছেন। রাকার বয়েস তখন বছর বারো। আমার মেয়ের নাম রাকা।'

'তাঁর এখন বয়েস কত?'

অশোকনাথ মনে মনে হিসেব করে বললেন, 'ছাপ্পান্ন। আশ্চর্য নয়? সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়।' বলতে বলতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, 'কিন্তু সমস্যাটা তো আমার মেয়ের নয়, আমার ছেলে—অলোকনাথের।'

'সমস্যাটা?'

'বলছি। হোয়াইট স্টার ইণ্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের নাম শুনেছ কিনা জানি না। আমার ছেলে এই কম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ক্যামাক স্ট্রীটে এদের হেড অফিস। দুটো ফ্যাক্টরি আছে, একটা

জোকায় অন্যটা বালিটিকুরিতে। এরা হোয়াইট স্টার ব্র্যাণ্ড নেম-এ নানারকম ইকুইপমেন্ট বানায়। এইখানে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। তাই নিয়েই তোমার সঙ্গে পরামর্শ।'

'কি ধরনের গণ্ডগোল ?'

'বলছি। তবে তার আগে একটা অনুরোধ করতে চাই—আপনাদের সকলের কাছে। তা হল, এখানে যা কথাবার্তা হবে তা নিয়ে যেন বেশি জল ঘোলা না হয়। আমি চাই তদন্তটা যথাসম্ভব গোপনে লোক জানাজানি না করে যেন করা হয়।'

শিবেন বলল, 'তাই হবে। যথাসম্ভব গোপনেই করা হবে।'

'বেশ। এবার তাহলে গণ্ডগোলটা কি সেটা বলি। হোয়াইট স্টার ইণ্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, আদতে ছিল সাহেবী কম্পানী। উনিশশো সাতচল্লিশের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বিলেত থেকেই এটা চালানো হত। আটান্ন থেকে বিলেতের প্রভাব কমতে থাকে এবং ম্যানেজমেণ্টে ভারতীয়রা আসতে শুরু করে। সত্তর সালে এটা পুরোপুরি ভারতীয় কম্পানী হয়ে যায়।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'এখন এর মালিক কে ?'

'মালিক ঠিক কেউ নেই, এটা পাবলিক লিমিটেড কম্পানী। তবে কোন একজন ইণ্ডাসট্রিয়ালিস্ট সম্প্রতি গোপনে এটা কিনে নেবার চেষ্টা করছিলেন।'

'কে ?'

'সেটা সঠিক জানি না। তবে গুজব শুনেছি মহাকোশল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের যোগেশ্বর রাই নাকি এর পেছনে ছিল।'

'আচ্ছা, এ ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব।' বলল দময়ন্তী, 'এখন বলুন গণ্ডগোলটা কি হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। গণ্ডগোলটা হচ্ছে সাবোটাজ। জোকা ফ্যাক্টরিতে দুবার আগুন লাগে। তখন ভাবা হয়েছিল সে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেণ্ট। কিন্তু বালিটিকুরিতে যা ঘটেছে, তারপর আর তা

ভাবা যাচ্ছে না। তবে সে ঘটনার কথা বলবার আগে হোয়াইট স্টারের ইতিহাস একটু বলা দরকার।

'সত্তর সালে সাহেবরা যখন চলে যায়, এখন এদের একমাত্র বালিটিকুরিতেই ফ্যাক্টরি ছিল। সেই সময় হোয়াইট স্টার খুব দুরবস্থায় পড়েছিল। বাজার মন্দা, লেবার ট্রাবল, অন্যান্য গোলমাল, সব মিলে কম্পানীর যায়-যায় অবস্থা। সেই সময় আমার ছেলে, সীতারামন আর প্রশান্ত ঘটক, এই তিনজনে শক্ত হাতে হাল ধরে। আমার ছেলে ছিল প্রোডাকশনে, সীতারামন ফাইনান্সে আর প্রশান্ত সেলসে। এদের তিনজনের মিলিত চেষ্টায় হোয়াইট স্টার আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এমন কি ছিয়াত্তর থেকে রীতিমত প্রত্যেক বছর শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দিতে শুরু করে। জোকায় নতুন ফ্যাক্টরি খোলে।

'এর পরের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। গত দেড় বছর থেকে হোয়াইট স্টারের অবস্থা হঠাৎ আবার খারাপ হতে থাকে। এর দুটো কারণ আছে। প্রথম, এক্সপোর্ট বাজারে মার খাওয়া। দ্বিতীয়, দেশে এদের ইকুইপমেন্টের চাহিদা কমে যাওয়া।'

'চাহিদা কমে গেল কেন?' দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল।

'কমে গেল তার কারণ সরকারি নীতির পরিবর্তন। এরা যে ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করে, তার চেয়ে উন্নত ধরনের মাল বিদেশ থেকে আমদানি করার ঢালোয়া অনুমতি দেওয়ার ফলে এ ব্যাপারটা ঘটল। হোয়াইট স্টার তখন এই অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে তাদের সমস্ত প্রোডাক্ট নতুন করে ঢেলে সাজাবার এবং উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করল। এতে স্বভাবতঃই লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে মন-কষাকষি শুরু হল। ফলে অশান্তি বাড়ল। তার ওপর এই সব নতুন ব্যবস্থার ফলে টাকার টানাটানিও শুরু হল। অবস্থা যখন রীতিমত সঙ্গীন, হোয়াইট স্টার সিক ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে যাবে কিনা এই যখন শেয়ার বাজারে জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়েছে,

তখন কম্পানী মাস তিনেক আগে হঠাৎ ছুটো প্রকাণ্ড অর্ডার পেল। একটা এক্সপোর্ট, একটা ডোমেস্টিক। এইবার, যখন সমস্ত ছবিটা পাল্টাবে এটাই সবাই ধরে নিয়েছে, ঠিক তখুনি পর পর তিনটে দুর্ঘটনায় সব কিছু তছনছ হয়ে গেল।'

'দুর্ঘটনা? অন্তর্ঘাত বা সাবোটাজ নয়?'

'সাবোটাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জোকা ফ্যাক্টরির আগুন যদিও বা দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যায়, বালিটিকুরির ব্যাপারটা সেরকম কখনোই হতে পারে না। বালিটিকুরির ফাউণ্ড্রি শপে যে বিস্ফোরণটা হয়, সেটা টাইম বোমার। পুলিশ এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আর, ওই ঘটনার পর থেকে দুজন ওয়ার্কার নিরুদ্দেশ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরা দুজনেই ছিল মগুপ, দুশ্চরিত্র এবং জুয়াড়ী। সব সময়েই এদের টাকার টানাটানি চলত।'

'অর্থাৎ, কেউ চাইছে যেন হোয়াইট স্টার উঠে দাঁড়াতে না পারে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই বটে।'

'লেবার ইউনিয়ন কি বলছে?'

'তারা বলছে, এটা ম্যানেজমেণ্টের ষড়যন্ত্র। ফ্যাক্টরি লক-আউট ঘোষণা করার বাহানা। যে দুজন ওয়ার্কার অদৃশ্য হয়েছে, তারা নাকি নিতান্ত নিরীহ ভালো লোক ছিল। কম্পানী গুণ্ডা লাগিয়ে তাদের খুন করেছে। এই নিয়ে অশান্তি চরমে উঠেছে। বালিটিকুরির ফ্যাক্টরি কার্যত বন্ধ। জোকায় লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।'

'আমরা যদি ধরে না নিই যে লেবার ইউনিয়ন যা বলে তা সবই মিথ্যে, তাহলে আপনার কি মনে হয় তাদের এই ধারণার পেছনে একেবারে কোনই সত্য নেই?'

অশোকনাথ মোটা কাচের চশমার ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থেমে থেমে

বললেন, 'লেবার ইউনিয়ন যা বলে তার সবই মিথ্যে, এ ধরনের কোন প্রত্যয় আমার নেই। তবে, তাদের যে ধারণার কথা আমি তোমাদের বললুম, সেটাও যে একেবারেই ঠিক নয় সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'কেন?'

'আমার ছেলে এই কম্পানীর ম্যানেজমেণ্টের শীর্ষে আছে। কাজেই, ম্যানেজমেণ্ট ষড়যন্ত্র করছে কি করছে না, সেটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানবে? আমার ধারণা, এই ঘটনাগুলোর পেছনে আছে ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতা। আমার ছেলের নেতৃত্বে এই কম্পানী বড় হোক, এটা কোন লোকের কাম্য নয়। এতদিন সে সুযোগ খুঁজছিল, গত বছরের দুরবস্থা তাকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। আর, এই ব্যাপারটাই তোমাকে দেখতে হবে। নিজের অহঙ্কার আর ঈর্ষার জন্যে যে কয়েক হাজার লোককে অনাহারের মুখে ঠেলে দিতে পারে, তার মুখোশ খুলে দিতে হবে।'

'এই কাজ পুলিশ করতে পারে না?'

অশোকনাথ তির্যক দৃষ্টিতে শিবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না। তাহলে আমার বংশের কিছু গোপন কথা, কিছু লজ্জার কথা, সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।'

'কিন্তু কয়েক হাজার লোকের অনাহার কি আপনার বংশ-গৌরবের চেয়ে বড় নয়?'

অশোকনাথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'বড় ঠিকই। তবুও, যতদিন এবং যতদূর সম্ভব, এসব কথা গোপন রাখা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। যদি দেখা যায়, গোপন করা আর কোনমতেই সম্ভব নয়, তখন পুলিশের কাছে যেতে হলে যাব। শিবেনবাবু সেকথা জানেন। আমি তাঁর কাছে উপদেশ চেয়েছিলুম এবং তোমার নাম বলেছিলুম। তখন তিনি এই

আলোচনার প্রস্তাব দেন। এমন কি এই আলোচনায় তিনি উপস্থিত থাকবেন না, একথাও বলেন। তবে, আমি জানি আমি ওঁকে বিশ্বাস করতে পারি। ওঁর অনুরোধ ছিল যে আমি যেন ওঁর ওপরওলার অনুমতি নিয়ে নিই। তাতে কোন অসুবিধে হয় নি। ওঁর ওপরওলা আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন।'

এই কথার মধ্যে পান্নালাল ঘরে ঢুকল, তার সঙ্গে আর একটি গান্ধীটুপি। দুজনে একটা চাকা লাগানো রট-আয়রনের টেবিল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল। টেবিলের ওপর পানীয় এবং তিনটে প্লেটে নানারকম খাবার সাজানো।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'একি, আপনার জন্যে কিছু নেই ?'

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, 'না। বাঁধা সময়ের বাইরে আমার কিছু খাওয়া বারণ। আমার বয়েস কত জানো ? চুরাশি। এই বয়েসে খাওয়াটা সামলে রাখাই উচিত, তাই না ?'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নাকি এখনও রোজ গল্‌ফ খেলেন ?'

ঘন ঘন মাথা নেড়ে অশোকনাথ বললেন, 'না, না। কে বললে তোমাদের সে কথা ? এককালে খেলতুম ঠিকই, বছর দশেক হল ছেড়ে দিয়েছি। তবে ক্লাবে রোজ যাই। এতদিনের অভ্যেস !'

দময়ন্তী কফির কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'আপনার সন্দেহের কথা শোনবার আগে, আমার একটা সন্দেহের কথা জিজ্ঞেস করি ?'

'যোগেশ্বর রাইয়ের কথা তো ?' অশোকনাথ বললেন।

'হ্যাঁ। আমি অবশ্য ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ভাল বুঝতে পারি না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি যে হোয়াইট স্টারের যত দুরবস্থা হবে, ততই এটা কারুর পক্ষে কিনে নেওয়া সহজতর হবে।'

'ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু যোগেশ্বর রাই যদি এই সব অন্তর্ঘাত-গুলোর পেছনে থাকত, তাহলে সে এমন কোন কাজই করত না যাতে

কম্পানীর একটা পুরো প্রোডাকশন ইউনিটই ধ্বংস হয়ে যায়। সে কিনলে চালু ফ্যাক্টরি কিনবে, একটা ধ্বংসস্তূপ নয়। তাছাড়া, হোয়াইট স্টারের আজ এমন অবস্থা যে তাকে আবার পুরোপুরি চালু করতে যত টাকার দরকার, যোগেশ্বরের অত টাকা নেই। বা থাকলেও সে ঘর থেকে অত টাকা বের করবে না। আমার কাছে খবর এসেছে যে সে এখন অন্য একটা কম্পানীর দিকে ঝুঁকেছে। হোয়াইট স্টার নেবার আর কোন বাসনা তার নেই।'

'বেশ। এবার তাহলে আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

বৃদ্ধ তাঁর চশমাটা খুলে অনেকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ফট করে টেবিলের ওপর রাখা একটা ল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। ল্যাম্পের শেডটা এমন যে তার আলো পড়ে অতিথিদের মুখে, টেবিলের অপর প্রান্তে যিনি তাঁর মুখটা তখন আর ভাল করে দেখা যায় না। তারও কিছুক্ষণ পরে অশোকনাথ থেমে থেমে বলতে শুরু করলেন, 'কথাটা কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। আমার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়তো এসব ঘটনা আজ আর ঘটত না। আসলে, তাঁর অবর্তমানে আমি আমার ছেলেকে ঠিকমত মানুষ করতে পারি নি।'

সমরেশ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। দময়ন্তী টেবিলের নিচে হাত নেড়ে ওকে বাধা দিল।

'আমার স্ত্রী যখন মারা যান, অলোকের বয়েস তখন চোদ্দ বছর। সে দার্জিলিংয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত। আমি তাকে কলকাতায় নিয়ে আসি। সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু, ঠিক সেই সময় আমার যে মানসিক অবস্থা তাতে আমি চাইছিলুম যেন সবাই আমার কাছে থাকে, আমায় ঘিরে থাকে। তাছাড়া, রাকা বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তারও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল।

'আমি অবশ্য অলোককে কখনোই অতিরিক্ত স্নেহ দেখাই নি।

তবু বলব, তার কতগুলো আচরণ আমি স্নেহ বশতঃই মেনে নিয়েছিলুম। কলেজে পড়ার সময়ে সে রাজনীতির মধ্যে বেশ ভালো ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আমি ভেবেছিলুম ওটা অল্প বয়সের উত্তেজনা, বয়েস হলে কেটে যাবে। কিন্তু, তা হল না। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করবার পর তাকে স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড লোম্যাক্সে ঢুকতে বললাম—সে আমার কথা শুনলো না। বললুম, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এক জায়গায় চাকরি করতে না চাও তো সে ভালো কথা। মার্শাল অ্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জির জেনারেল ম্যানেজার অ্যালান হোণ্ডিং আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাকে লিখে দিচ্ছি, তার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। তাও করল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরি নিল হোয়াইট স্টারে। আনফরচুনেটলি, আমি তখন হোয়াইট স্টারে কাউকেই চিনি না। ফলে, ওকে একেবারে অ্যাপ্রেনটিসশিপ থেকে শুরু করতে হল।'

সমরেশ এবারে আর দময়ন্তীর বাধা মানলো না। বলল, 'কিন্তু সেটাই তো ভাল, এরকমই তো হওয়া উচিত, তাই না?'

'হ্যাঁ, সেটা যে ঠিক নয় তা বলব না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সে সময়টা জীবনের একটা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার শুরু। সেই পরীক্ষার নাম কেরিয়ার। আমি জানি, অনেক তথাকথিত ভদ্রসন্তানের কাছে কেরিয়ার হচ্ছে একটি ফোর লেটার্ড ওয়ার্ড। কিন্তু আমার কাছে তা নয়। আমি মনে করি, মানুষের জীবনে কেরিয়ারই সব। তাকে একেবারে শুরুতে যদি একটা উপযুক্ত ধাক্কা দেওয়া না যায়, তাহলে সব খুইয়ে পেছিয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাই প্রবল হয়।'

'আপনার ছেলে কিন্তু পিছিয়ে পড়ে নি।'

'সেটা তার সৌভাগ্য। আমি বলব, অত্যন্ত সৌভাগ্য। আমি শুনেছি, হোয়াইট স্টারে কাজ শুরু করে সে ইউনিয়নবাজী শুরু করেছিল, লেবার লীডার হয়ে বসেছিল। এই কাজ যদি সে মার্শাল অ্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জি বা আমার কম্পানীতে করত, তাহলে ম্যানেজমেণ্ট

তাকে পত্রপাঠ বিল্বপত্র গুঁজিয়ে দিত। তাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হত। কিন্তু তার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে হোয়াইট স্টারের তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর টোনি ওয়াকার এই সব কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাকে পছন্দ করতেন। টোনি অবশ্য পরে আমাকে বলেছিল যে তার কর্তব্যবোধ, কাজ শেখার ইচ্ছে এবং আগ্রহ দেখে সে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। ফলে, বেশ তাড়াতাড়িই সে ম্যানেজমেণ্ট কেডারে উঠে আসে। এবং, তার ফলে একটা সুবিধে হয় এই যে ইউনিয়নের সঙ্গে ভবিষ্যতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ওর বিশেষ গোলমাল কখনও বাঁধে নি। একটা সদ্ভাব, একটা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং বিশ্বাস বজায় ছিল। কাজেই, আজ থেকে বছর আষ্টেক আগে সে সময়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যমুনাদাস মিত্তাল যখন কম্পানীর চেয়ারম্যান হল, তখন প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে সে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে গেল।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'উনি তখন কোন পোস্টে ছিলেন?'

'প্রোডাকশন ডিরেক্টর।'

'আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোপন রাখা উচিত এরকম কোন লজ্জাজনক ঘটনার সন্ধান পেলুম না আপনার ছেলের কথায়।'

'আমি এইবার সেই কথাটাই বলব। বুড়ো হয়েছি, সংক্ষেপে কোন কথা বলার আর্টটা ভুলে গেছি। আমার নাতি-নাতনিরা হাসে, ইচ্ছে করলে তোমরাও হাসতে পারো।

'সে যাই হোক, আমার ছেলে যখন একদিকে চাকরি জীবনে উন্নতি করছে, অন্যদিকে সে একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। সে আর তার একজন সহকর্মী একসঙ্গে একই মেয়ের প্রেমে পড়ে। কী দেখে যে দুজনেই মজেছিল, তা আমি আজও জানি না। মেয়েটি রীতিমত কুৎসিত, প্রায় নিরক্ষর, বস্তিতে বড় হয়ে ওঠা একটা কদর্য ব্যাপার। অথচ এই নিয়েই দুজনের প্রতিযোগিতা, মন-কষাকষি, আরও কত কী! শেষ পর্যন্ত, দুর্ভাগ্য আমার যে, অলোকেরই জিত হল। সে তাকে বিয়ে করল। আমি অবশ্য তাদের এ বাড়িতে

ঢুকতে দিই নি। তারা তখন কোথায় এক বস্তিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল।

'কিন্তু, তার বন্ধুটি এই হেরে যাওয়াটা স্পোর্টিং স্পিরিটে কখনোই নিতে পারে নি। পদে পদে অলোকের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এতদিনে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সময় এসেছে। ক্ষতি যা করবার, তা তো সে করেছেই। কিন্তু, তাকে তো এতবড় একটা অপরাধের পর এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আর সেটা কি ভাবে করা যায়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'বেশ, চেষ্টা করে দেখা যাবে। তবে তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেলে ভালো হত।'

'কি প্রশ্ন, বল? জবাব জানা থাকলে, পাবে।'

'আপনার ছেলেকে কি আপনি ত্যজ্যপুত্র করেছেন?'

'না। তবে আমি তার মুখ দেখি না, সেও আমার মুখ দেখে না।'

'আপনি কি আপনার পুত্রবধূকে কখনোও দেখেছেন?'

'দেখেছি কয়েকটা পার্টিতে। দূর থেকে।'

'আপনার ছেলের যখন বিয়ে হয়, তখন তার বয়স কত ছিল?'

'আজ থেকে পঁচিই বছর আগে। মানে তখন তার বয়েস তেত্রিশ।'

'এর আগে কি তার অন্য কোন মেয়ের প্রতি কোন টান ছিল?'

'আমার জানা নেই।'

'আপনি বোধ হয় তার বন্ধুর নাম বলতেও ইচ্ছুক নন?'

'না, ইচ্ছুক নই। তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব তোমার।'

'আপনার ছেলের সন্তানাদি কি? তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

'আমার ছেলের সন্তান দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে

ছেলের বয়েস বাইশ বছর। গত বছর বি-কম পাশ করে হোয়াইট স্টারে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনী হয়ে ঢুকেছে। অত্যন্ত ইনটেলিজেন্ট ছেলে, যেমন চেহারা তেমনি চালচলন। জীবনে সে উন্নতি করবে, অবশ্য যদি সে তার বাপের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে।'

'তার নাম কি?'

'তার নাম অতীন্দ্রনাথ ঘোষাল। আমি ডাকি তিন্নু বলে। কখনো কখনো তিনকড়িও বলি।' বলে বৃদ্ধ একটা সস্নেহ হাসি হাসলেন।

'এবার আপনার নাতনির কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, সে এ বছর বি-এ দেবে। তোমারই ছাত্রী। নাম বলা বারণ। এক নম্বরের বিচ্ছু। সকলের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। লেখাপড়ার নাম নেই, কেবল গান আর গান।'

এবার দময়ন্তীর সস্নেহ হাসির পালা। বলল, 'বুঝেছি। অনু, অনিন্দিতা।'

'কে জানে? বলেছি তো, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—নাম বলা বারণ।'

'আপনি বললেন যে অতীন্দ্রনাথের জীবনের উন্নতির পথে বাধা হচ্ছেন তাঁর বাবা। এ কথাটার মানে কি?'

'মানে? কি ভাবে বোঝাবো জানি না। তিন্নু যে হোয়াইট স্টারে ঢুকেছে, তাতে তার ওপরে তার বাপের একেবারে জাতক্রোধ। বাপের ফার্মে ছেলে কাজ করছে, তাতে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ, বাপের জোরে তিন্নু কিন্তু ওখানে ঢোকে নি। যাতে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখানো হয় সেজন্যে হোয়াইট স্টার ম্যানেজমেন্ট ট্রেনী সিলেকশনের ভার দিয়েছিল একজন বিজনেস কন্সালট্যান্টকে। তিনি কম্পানীর নাম না দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তিন্নু তাই দেখে কাগজে অ্যাপ্লাই করেছিল, ইণ্টারভিউ দিয়ে সিলেকটেড হয়েছিল। এতে যে কি অন্যায়টা হয়েছিল তা আমার জানা নেই। আমার পুত্র সেই থেকে ক্রমাগত তিন্নুকে

চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য, তিমু যদি জীবনে উন্নতি করে, তাহলে সবাই বলবে যে সে তার বাপের জোরে করেছে, নিজের ক্ষমতায় নয়। সেটা নাকি ভয়ানক লজ্জার কথা। অদ্ভুত! বাপের জোরে ছেলে উন্নতি করবে, সেটা লজ্জার কথা? অথচ, আমার ছেলে জানে না যে...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অশোকনাথ।

'যে তার উন্নতির পেছনে আপনার অনেক অবদান আছে। তাই না?'

'হ্যাঁ দময়ন্তী, তাই। তবে আমার অনুরোধ, একথা তাকে কখনো বলো না। ভীষণ ক্ষেপে যাবে। ভয়ানক জেদী আর একরোখা ছেলে। তবে, আমার খারাপ লাগছে কি জানো? তুই তোর ছেলেকে ব্যাক করলিনে, না করলি, কিন্তু তাই বলে চান্স পেলেই তারই একজন সহকর্মীর সঙ্গে তুলনা করে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে তার মনটা ভেঙে দিবি, এটা কি? বিশেষতঃ, সেই সহকর্মীটি যেখানে তারই মামাতো ভাই, এক সঙ্গে বড় হয়েছে দুজনে। হতে পারে এই মামাতো ভাই তিমুর চেয়ে লেখাপড়ায় ভালো, কিন্তু সেটাই কি সব? জীবনে খেলাধুলোর কোন দাম নেই। তিমু যে য়ুনিভার্সিটি ব্লু, সেটা কোন বড় কথা নয়?'

বুড়ো ঠাকুর্দার এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না দময়ন্তী। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, গত পঁচিশ বছর তো আপনি আপনার ছেলের বৌয়ের মুখ দেখেন নি, অথচ তার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে...'

দময়ন্তী কথাটা শেষ করতে পারল না। অশোকনাথ ফোঁস করে উঠলেন, 'তার ছেলেমেয়ে মানে? ওরা আমার ছেলের ছেলেমেয়ে। ওরা তো আমার কাছে আসবেই। এটাই তো ওদের বাড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। আচ্ছা, এবার শেষ প্রশ্ন। আপনার

সাঙ্ভি তার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হোয়াইট স্টারে চাকরি করছে কেন?'

'কেন করবে না? সে তার বাপের ইচ্ছেয় ঢোকে নি যে তার ইচ্ছেয় ছাড়বে। আমিই বারণ করেছি। ছেলেটাকে আমেরিকায় পাঠাল না, বলল বিদেশে গেলে নাকি দেশের ঘুঘু রাজহংস হয় না। নিজেও অবশ্য যায় নি, একই যুক্তিতে। ঠিক আছে, তাই বলে ছেলেটাকে একটা ভাল চাকরিও করতে দেবে না? এত শত্রুতা!'

সমরেশ সোফার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'চমৎকার কেস! খাসা কেস! ব্যালিটিকুরি না গুষ্টির পিণ্ডি কোথায় বোমা ফাটল, এখন প্রমাণ করতে হবে যে এক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পঁচিশ বছর আগেকার রাইভাল সেটি ছুঁড়েছেন। এই পঁচিশ বছর তিনি বোমাটি বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সুযোগ পেলেন অ্যাদ্দিন বাদে। যত্তো সব! বুড়োর ভীমরতি ধরেছে না তোর ধরেছে?'

শিবেন বলল, 'তুই থামবি? যা বুঝিস না তাই নিয়ে বকবক করবি না। রাইভাল টাইভাল কোন কথা নয়। বোমাটা কে ফাটিয়েছে এবং কেন, সেটা বের করাই আসল কথা। আরে, এটাই তো প্রথম এরকম ব্যাপার নয়। কাগজ পড়িস না? এই ধরনের সাবোটাজ আজকাল মাঝে মাঝেই হচ্ছে, সে খবর রাখিস?'

'এই টাইম বোমা?'

'হ্যাঁ। নইলে আমরা চট করে ধরলুম কি করে যে ব্যাপারটা কি? এই পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এরকম প্রায়ই হচ্ছে নাকি?'

'প্রায়ই মানে ওই যে বললুম মাঝে মাঝেই হচ্ছে।'

সমরেশ বলল, 'তার মানে ওই রাইভাল ব্যাটা রীতিমত হাত মক্সো করছিল, 'অ্যাঁ?'

শিবেন চোখ পাকিয়ে বলল, 'ফের? তুই যা না, রাস্তায় একটু পায়চারি টায়চারি করে আয় না।'

দময়ন্তী বলল, 'এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে একটু বলবেন?'

শিবেন বলল, 'তাহলে আর এক রাউণ্ড চা।'

শিবেন বলল, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাবোটাজ বা শিল্পে অন্তর্ঘাত একটা নতুন ব্যাপার নয়। ইণ্ডাস্ট্রির গোড়া থেকেই আছে। কথাটা এসেছে সাবোট থেকে যার মানে কাঠের জুতো। সে যুগে য়ুরোপের শ্রমিকরা ওইরকম জুতো পরত আর মালিককে শিক্ষা দিতে চাইলে একটা জুতো পা থেকে খুলে মেশিনের মধ্যে ফেলে দিত। অমনি মেশিনের দাঁতটাত ভেঙে কলের চাকা বন্ধ। অর্থাৎ, এ ব্যাপারটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে যদি একটা প্যাটার্ন থাকে, একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তাহলে সন্দেহ হয় যে এরকম ঘটনাগুলোর পেছনে মালিক শ্রমিকের বিরোধ নয়, কোন ক্রিমিন্যাল ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বালিটিকুরিতে যা ঘটেছে, সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার। গত এক বছরে এটা চতুর্থ ঘটনা।

'আগেই বলেছি, পদ্ধতিটা এক। কারখানার মধ্যে প্রোডাকশন লাইনে বিস্ফোরণ, প্রত্যেকটাই টিফিনের সময়, প্রত্যেকবারই একই ধরনের বোমা। বোমাটা বানানো সহজ, সস্তায় হয়ে যায়, খুব একটা ভয়ঙ্কর রকমের শক্তিশালী নয়, কিন্তু বেশ কিছুদিনের জন্যে কারখানা বন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কেউ মারা গেছে?' দময়ন্তী প্রশ্ন করল।

'না। তবে দু-একজন আহত হয়েছে।'

'এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে?'

'আছে অবশ্যই। সেটাই এবার আমরা খুঁজে দেখছি। এতদিন এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা এই হিসেবে তদন্ত চলছিল। তবে প্রথম

দর্শনে কোন যোগসূত্র কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। যে চার জায়গায় এগুলো ঘটেছে, সেগুলো হচ্ছে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে ডায়মণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড, রাণীগঞ্জে সুপ্রীম সেরামিক্স লিমিটেড, আসানসোলে গ্লোব ইনসুলেটারস লিমিটেড আর এই হাওড়ার হোয়াইট স্টার ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এদের মধ্যে একমাত্র মিল হচ্ছে এরা লিমিটেড কম্পানী আর এককালে বিদেশী মালিকানা ছিল। এ ছাড়া আর কোথাও কোন মিল নেই।'

সমরেশ বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। আমি এদের সম্পর্কে জানি। হোয়াইট স্টার ছাড়া বাকি তিনটেই আমাদের কম্পানীর ক্লায়েন্ট। তবে, এদের সাবোটাজ করে কার যে কি লাভ হতে পারে তা তো বুঝতে পারছি না। যদ্দুর শুনেছি, এদের প্রত্যেকেরই অবস্থা বেশ খারাপ। ঠিক সময়ে পয়সাকড়ি দিতে পারে না, লোকজন ছাঁটাই করছে, বাজারে এদের শেয়ারের দাম পড়ে যাচ্ছে হু হু করে। এমনিতেই এই অবস্থা, তার ওপরে সাবোটাজ করা মানে কম্পানী তুলে দেবার ধাপ্পা। কিন্তু কেন? ধরো, ডায়মণ্ডের ম্যানেজমেন্ট এখন গুজরাতিদের হাতে, সুপ্রীম সেরামিক্স সুজিত নন্দীদের. গ্লোবের অবশ্য মেজর শেয়ার হোল্ডার কেউ নেই, তবু মোটামুটি ওমপ্রকাশ সালধানাই চালাচ্ছে। তা, এখানেও তো কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না।'

দময়ন্তী বলল, 'এমন তো হতে পারে যে কেউ এদের অবস্থা একেবারে খারাপ করে দিয়ে সস্তায় কিনে নেবার চেষ্টা করছে?'

'তা হতে পারে। তবে, চারটে কম্পানীকে একসঙ্গে আক্রমণ করার কি দরকার? একটা একটা একটা করে করলেই সেটা স্বাভাবিক হত, তাই না?'

শিবেন বলল, 'দেখুন, সমরেশের কথাটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নাও হতে পারে। সত্যি সত্যি হয়তো প্রথম তিনটে হাত-মক্সোর ব্যাপার। আসল লক্ষ্য হোয়াইট স্টার।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াইট স্টারই কেন?'

'অশোকনাথের কথা শুনে একটা ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর ছেলেটি একটি একগুঁয়ে উগ্র স্বভাবের লোক। নারীঘটিত কোন ব্যাপার থাক বা না থাক, তার উন্নতিতে বাধা দেবার লোকের বোধ হয় অভাব নেই। আর, হোয়াইট স্টার উঠে যাওয়া মানে অলোকনাথেরও বারোটা বাজানো।'

'কিন্তু, গত বছরেই অলোকনাথের বিরোধী পক্ষের জিঘাংসা বেড়ে উঠল কেন? এর আগে তো এরকম কোন ব্যাপার ঘটে নি। অথচ, হোয়াইট স্টার বহুবার পতন উত্থানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।'

'সেটাই খোঁজ নেওয়া দরকার। গত এক বছরে কি ঘটে থাকতে পারে? অলোকনাথ কাকে ঘাঁটিয়ে থাকতে পারেন? কোন পুরোনো শত্রু নতুন করে মাথা চাড়া দিল, না সত্যি সত্যি কোন নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন?'

সমরেশ বলল, 'গত এক বছরে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অতীন্দ্রনাথ হোয়াইট স্টারে ঢুকেছে।'

'এবং অশোকনাথ তার মাথায় ঢুকিয়েছেন যে তার পিতৃদেবই তার সবচেয়ে বড় শত্রু।'

দময়ন্তী অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যে মাঝে মাঝে তোমাদের কম্পানীর ব্যালান্স শীট বলে কি একটা বই নিয়ে এসে মন দিয়ে পড়ো, সেটা কি?'

সমরেশ বলল, 'ব্যালান্স শীট হচ্ছে একটা কম্পানীর এক বছরের কৃতকর্মের ইতিহাস। তার যাবতীয় আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি এই ব্যালান্স শীটে লেখা থাকে।'

'তার মানে, এই চারটে কম্পানীরও এই ধরনের ব্যালান্স শীট আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'সেগুলো পাওয়া যায়? মানে, গোপনীয় কিছু নয় তো?'

'না, না। এরা পাবলিক লিমিটেড কম্পানী, এদের ব্যালান্স শীট একেবারেই গোপনীয় নয়।'

'আচ্ছা, বেশ। তাহলে শিবেনবাবু, আপনি এই চারটে কম্পানীর গত কয়েক বছরের ব্যালান্স শীট আমাকে জোগাড় করে এনে দিতে পারেন?'

শিবেন বলল, 'পারি। কিন্তু আপনি পড়ান ইতিহাস, ব্যালান্স শীট পড়ে কি কিছু বুঝতে পারবেন? সমরেশ ইঞ্জিনীয়ার, চাকরি করে, ও-ই কিচ্ছু বোঝে কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

সমরেশ বলল, 'যা যাঃ, না বোঝার কি আছে রে? আমি কি তোর মত পুলিশ যে ব্যালান্স শীট দেখলে ভয় পাব?'

দময়ন্তী এই বাক্যালাপে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার বোঝার দরকার নেই। আপনি আমাকে ওগুলো এনে দিন, তারপর ওদের কম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিমলবাবুকে দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ নেব।'

'সেটা মন্দ কথা নয়—' বলল সমরেশ, 'বিমলদা তোমাকে এই রকম ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে যে কী খুশি হবেন তা আর বলার নয়। কেবল, তোমাকে আবার তেল-কৈ রাঁধতে হবে।'

দময়ন্তী সহাস্যে বলল, 'তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বিমলচন্দ্র শিকদারের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। মাথার সব চুল পাকা, গোঁফ ভুরু পাকা, এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত পেকে গেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে অটুট। রোজ দুবেলা চার মাইল হাঁটেন, সকালে ছ'টা আর রাত্রে আটটা রুটি খান। আর নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে নিয়ম-কানুন বড়-একটা মানতে পারেন না, খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যেখানে-সেখানে যার-তার নেমন্তন্নে তিনি যান না। বেছে বেছে মাত্র কয়েকজনের নিমন্ত্রণই

গ্রহণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য দময়ন্তী এই মাত্র কয়েকজনের একজন।

বিমলবাবু পরিতৃপ্ত মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসে বললেন, 'তোমার রান্নার প্রশংসা আর করব না দময়ন্তী, আমার খাওয়ার বহর দেখেই নিশ্চয়ই আমার মতামত বুঝতে পেরেছ। এবার তাহলে কাজের কথায় আসি। সমরেশের দেওয়া ব্যালান্স শীটগুলো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখেছি। তুমি জানতে চেয়েছো যে এই চারটে কম্পানীর মধ্যে কোথায় কোথায় মিল আছে। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি শুনে যাও।

'এক নম্বর, চারটে কম্পানীই এককালে বৃটিশ মালিকানার প্রতিষ্ঠান ছিল, আজ পুরোপুরি ভারতীয়।

'দু নম্বর, এদের সকলেরই রেজিস্টার্ড হেড অফিস কলকাতায়।

'তিন নম্বর, এদের প্রত্যেকেরই অতীতের রমরমা আর নেই, বরং অবস্থা বেশ খারাপই বলা চলে। ফলে, এদের সকলেরই শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে।

'চার নম্বর, এদের সকলেরই কয়েকজন কমন ডিরেক্টর আছেন। যথা, রাজা বিনয়কৃষ্ণ সিংহরায়, শেঠ মুলচাঁদ আগরওয়াল, ব্যারিস্টার লালমোহন দে, মিস্টার এ. এন. ঘোষাল, আর মিস্টার ডি, পি, খান্না।

'পাঁচ নম্বর, এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এই সব ক'টা কম্পানীর গত বছরের চেয়ারম্যানের বক্তৃতায় দেখতে পাচ্ছি তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে এই বছরে তাঁরা বিরাট অর্ডার পাবেন যাতে করে কম্পানীর প্রবল উন্নতি হবে। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু এটা যে একটা মিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

বিমলবাবু চুপ করলেন। দময়ন্তীও কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাই প্রশ্ন করল, 'হোয়াইট স্টারে কি দুজন এ. এন. ঘোষাল ডিরেক্টর?'

বিমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না, একজন।'

'ডিরেক্টরদের ঠিকানা দেওয়া আছে ?'

'আছে।'

'ঘোষালদের ঠিকানাটা একটু দেবেন ?'

বিমলবাবু চারটে ব্যালান্স শীটের বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, 'ভেরি সরি। আমারই ভুল। ঠিকানাটা চেক করে দেখা উচিত ছিল। হোয়াইট স্টারের ঘোষাল থাকেন যোধপুর পার্কে। বাকি ক'টা কম্পানীর ঘোষাল থাকেন হাঁসপুকুর লেনে। এঁরা তুজনে ভিন্ন ব্যক্তি।' বলে আশ্চর্য বিস্ময়ে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে রইলেন।

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই, আমি এই ঘোষালদের সম্পর্কে শুনেছি।' বলে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আচ্ছা বিমলদা, ডিরেক্টর কারা হন ?'

বিমলবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'যাঁদের ডিরেকশন দেবার ক্ষমতা আছে, তাঁরাই ডিরেক্টর হন। ব্যবসাবুদ্ধিতে যাঁরা ঝানু বা টেকনিক্যালি যাঁরা খুব পাকাপোক্ত বা যাঁদের এমন মহলে যাতায়াত আছে যেখান থেকে ব্যবসা জোগাড় করা যায়, তাঁরাই ডিরেক্টর হন। যেমন ধরো, কোন ওষুধ তৈরির কম্পানীতে একজন ডাক্তার ডিরেক্টর হতে পারেন, আবার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলও হতে পারেন।'

'তার মানে এঁদের কোন কমন কোয়ালিফিকেশন থাকার দরকার নেই ?'

'না। কেবল এঁদের প্রত্যেককে তাঁরা যে কম্পানীর ডিরেক্টর তার শেয়ার হোল্ডার হতে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। যে কম্পানীতে আমার শেয়ার নেই, সে কম্পানীর ভালোমন্দে আমার কি উৎসাহ থাকতে পারে ?'

'আর একটু বুঝিয়ে বলুন।'

'এঃ, তুমি দেখছি এসব ব্যাপারে একেবারেই বোঝো না। তবে শোন। যে কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা করতে গেলে টাকার দরকার হয়। যাকে বলে মূলধন। এই মূলধন আসে কোথা থেকে ? এক,

কেউ তার পকেট থেকে দিতে পারে। দুই, কেউ জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে সেই টাকা ওঠাতে পারে। শেয়ার মানে অংশ, সে ক্ষেত্রে যারা শেয়ার কেনে তারা সেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয় পাবলিক লিমিটেড কম্পানী। এদের ডিরেক্টর বোর্ড তখন জনসাধারণের টাকায় ব্যবসা করে এবং যে লাভ হয় তার অংশ শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। একে বলে ডিভিডেণ্ড। এখন তুমি যদি কোন কম্পানীর শেয়ার হোল্ডার না হও, অর্থাৎ তোমার টাকা যদি সেই কম্পানীতে না খাটে, তাহলে তার উন্নতি অবনতি নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কী দরকার?'

'কম্পানীর উন্নতি হলে আমার কি লাভ?

'বাঃ! লাভ নেই? উন্নতি হলে কম্পানী তোমাকে বেশি করে লভ্যাংশ দেবে। তোমার টাকা ঘরে বেশি টাকা আনবে। তাছাড়া, তোমার শেয়ারের দাম বাজারে বেড়ে যাবে। ধরো, তুমি কোন কম্পানীর দশ টাকার শেয়ার একশোটা কিনলে। হাজার টাকা খরচা হল। কাল সেই কম্পানী প্রচুর উন্নতি করল, প্রচুর লভ্যাংশ ঘোষণা করল, তখন বাজারে তার শেয়ারের দাম বেড়ে দাঁড়াল ত্রিশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গে তোমার শেয়ারের দাম হয়ে গেল তিন হাজার টাকা। তখন যদি তুমি সেই শেয়ার বিক্রি করে দাও, তাহলে হাজার টাকায় দু হাজার টাকা লাভ।'

'আর যদি অবনতি হয়?'

তাহলে তুমি লভ্যাংশ কম পাবে বা পাবেই না। বাজারে তোমার শেয়ারের দাম কমে যাবে।'

'কত কমবে? আমি যে দামে কিনেছি তার নিচে তো আর যাবে না?'

'নিশ্চয়ই যাবে। দশ টাকার শেয়ারের দাম আট আনা, চার আনা, এমন কি শূন্যও হতে পারে।'

'শেয়ারগুলো কিরকম দেখতে ?'

'বড় বড় মোটা কাগজের দলিল। তাতে কম্পানীর নামধাম আর যে কিনলো তার নামধাম লেখা থাকে।'

'তার মানে দাঁড়াল এই যে আমি যদি কোন কম্পানীর অংশীদার হই, তাহলে কখনোই চাইব না যে সেই কম্পানীর অবনতি হোক বা কোনরকম ক্ষতি হোক। তাই তো ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আচ্ছা, এই শেয়ার কেনা-বেচা হয় কোথায় ? দামই বা কিভাবে ঠিক হয় ?'

'শেয়ার কেনা-বেচা হয় স্টক মার্কেটে বা শেয়ার বাজারে। আর দাম ঠিক হয় কম্পানীর কাজকর্ম দেখে, ভূত ভবিষ্যৎ দেখে। দামটা ঠিক করে স্টক এক্সচেঞ্জ। তারা অনেক কিছু বিচার করে দাম ধরে। যেমন ধরো, কোন প্রতিষ্ঠান খুব ভাল ব্যবসা করছে—তার শেয়ারের দাম বাড়বে। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যিনি ঝানু ব্যবসাদার, প্রায় নিজের হাতে কম্পানীটা চালাচ্ছিলেন, ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন, অমনি তার শেয়ারের দাম কমতে শুরু করবে।'

'তার মানে,আপনি যে বললেন আমাদের এই চারটে প্রতিষ্ঠানের ব্যালান্স শীটে দেখানো ছিল যে তারা এ বছর মস্ত অর্ডার পেতে যাচ্ছে, তার ফলে তাদের কম দামের শেয়ারের দাম বেড়ে যেতে পারতো ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বেড়ে যেতে পারতো নয়, বাড়ছিল।'

'এ বছরের অন্তর্ঘাতের ফলে উল্টে তাদের দাম তাহলে আরও কমে গেল ?

'হ্যাঁ। যাচ্ছেতাই ভাবে কমে গেল।'

'এই দুষ্কর্ম কি তাহলে কোন শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে করা সম্ভব ?'

'সম্ভব, তবে উচিত নয়। যদি কোন শেয়ার হোল্ডার এই অন্তর্ঘাতগুলোর পেছনে থাকে, তাহলে বলতে হবে সে পাগল, নয়তো তার আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছে রয়েছে।'

শিবেন এসে রোববার সন্ধ্যেবেলা বলল, 'বিমল শিকদারের সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ হল?'

দময়ন্তী মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। বলল, হয়েছে বৈকি। শেয়ার, স্টক মার্কেট, লিমিটেড কম্পানী ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক জ্ঞান লাভ হল।'

'আর এই অন্তর্ঘাতগুলো? সে ব্যাপারে কিছু বুঝলেন?'

'কিছু বুঝেছি, সবটা নয়। ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বলে মনে হচ্ছে। একটা যোগসূত্র আছে।'

সমরেশ বলল, 'ভ্যাখ, আমার মাথায় একটা থিওরি এসেছে। এমন তো হতে পারে যে চারজন লোক চারটে কম্পানী কিনতে চাইছে। তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে একই লোকের কাছে গেছে যে সাবোটাজ করায় এক্সপার্ট। সেক্ষেত্রে ব্যালান্স শীট দেখে সেই যোগসূত্র তুমি খুঁজে পাবে না। কারণ, চারজন খরিদ্দার আর সাবোটাজ করনেওলা বদমাইশটা সকলেই বাইরের লোক।'

শিবেন বলল, 'ভ্যাখ, তোর থিওরিটা একদম বাজে। এরকম সাবোটাজ এক্সপার্ট যদি কেউ থাকত যার বাজারে এত নাম যে একই সঙ্গে চার চারজন মক্কেল তার পেছনে ঘুরঘুর করছে, তাহলে সে খবরটি আমাদের কানে আসত।'

সমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। আর একটা কথা বলি। আমি এর আগের দিন বলেছিলুম যে একজন লোক একসঙ্গে একাধিক কম্পানী আক্রমণ করে না। সেটা অবশ্য পরে ভেবে দেখেছি, ঠিক নয়। করতে পারে, তবে যদি তেমন তেমন কম্পানী

হয়। আর সে লোকও যদি তেমন তেমন মালদার পার্টি হয়। কিন্তু এসব যা কম্পানী, এদের কিনতে কোন সত্যিকারের মালদার লোক এগিয়ে আসবে তা মনে হয় না। সেইজন্যেই ভাবছিলুম, হয়তো চারটে আলাদা লোক হতে পারে। তারা যে একই বছরে অ্যাকশনে নেমেছে সেটা নিতান্তই সমাপতন!'

'না, সেটা অসম্ভব। সমাপতনেরও একটা সীমা আছে। চার চারটে লোক একই বছরে একই ঠিকাদারকে দিয়ে চারটে কারখানায় একই ধরনের বোমা ফাটিয়ে তাদের কেনবার চেষ্টা করছে, এটা হতে পারে না। অতএব, তোর থিওরি এবার বন্ধ কর। বৌদি কি বলেন, এবার শুনি।'

দময়ন্তী বলল, 'দেখুন, আগেই বলেছি যে আমার মনে হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে এবং সেই যোগসূত্রের খবর রাখেন শ্রীঅশোকনাথ ঘোষাল। নইলে, আমাদের ডেকে, তাঁর ছেলের বৌয়ের পঁচিশ বছর আগেকার প্রেমিক প্রতিহিংসা নেবার জন্যে এই কাজ করছে, এই ধরনের আষাঢ়ে গল্প শোনাতেন না। বুড়ো রামঘুঘু—আমাকে একটা লীড দিচ্ছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।'

'তার মানে, এই মক্সো করার ব্যাপারটা আপনি বিশেষ আমল দিচ্ছেন না, এই তো?'

'আমি বিমলবাবুর সঙ্গে কথা যেটুকু বলেছি, তাতে বুঝেছি যে এই কারখানাগুলোর আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল না হলেও তারা এখনও চলছে। তার মানে, তাদের সিকিউরিটি আছে, লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এর মধ্যে খামোকা রিস্ক নিয়ে, লাঞ্চ আওয়ার হলেও, কার দায় পড়েছে বলুন তো হাত-মক্সো করার? তাছাড়া, এদের ইতিহাসও বলছে যে এদের যেমন তেমন ভাবে পছন্দ করা হয় নি। সেখানেও একটা প্যাটার্ন আছে।'

সমরেশ বলল, 'স্বয়ং অশোকনাথই তো এই যোগসূত্র হতে

পারেন ?'

'তা পারেন। কিন্তু তিনি তো এই সব ক'টা কম্পানীর শেয়ার হোল্ডার। তাহলে বিমলবাবুর কথায় বলতে হয় যে তিনি পাগল বা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছেন। তাছাড়া, তিনি এর মধ্যে থাকলে আমাকে ডেকে পাঠাবেনই বা কেন ?'

শিবেন বলল, 'একদম ঠিক কথা। আপনি এখন তাহলে কি করতে চান ?'

'আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'প্রথমেই প্রশান্ত ঘটকের সঙ্গে, তাই না ?'

দময়ন্তী হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক।'

গাড়িতে যেতে যেতে দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'প্রশান্ত ঘটক সম্পর্কে কি কি খবর পেলেন, বলুন।'

শিবেন বলল, 'প্রশান্ত ঘটকের বাবা স্বর্গীয় অমুতোষ ঘটক ছিলেন কলকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে। প্রশান্ত মেজো। অত্যন্ত মেধাবী ছেলে, লেখাপড়ায় আগাগোড়া প্রথমে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্সের স্নাতক, তারপর হার্ভার্ড। অতঃপর চাকরি। প্রথমে কিছুদিন ছিলেন একটা ছোট ফার্মে, তারপরে হোয়াইট স্টার। এখন সেল্‌স ডিরেক্টর। এছাড়া নানারকম জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যাদের বলা হয় সোশ্যাল সার্ভিস অরগ্যানাইজেশন, তাদের সঙ্গে জড়িত আছেন। বিয়ে করেন নি। থাকেন উডবার্ন গার্ডেন্সে, মালকোষ অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেই আপাততঃ আমরা যাচ্ছি।'

'আমাদের যাবার কথা শুনে আশ্চর্য হন নি ?'

'হয়েছিলেন হয়তো। গলা শুনে বুঝতে পারি নি। টেলিফোনের ওই তো দোষ। অবশ্য বালিটিকুরির বিস্ফোরণের ব্যাপারে কথা বলতে চাই শুনে খুশি হলেন বলে মনে হল। তবে, আমার সঙ্গে

একজন ভদ্রমহিলা আর তাঁর হাজব্যাণ্ড থাকবেন, কারণ সেই ভদ্রমহিলাও আমাদের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত আছেন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। একটু অবাক হয়েছেন, সন্দেহ নেই। অফিসে যেতে বললেন প্রথমে। তারপর কি ভেবে বললেন বাড়িতে আসতে। সন্ধ্যেবেলা।'

মালকোষ অ্যাপার্টমেন্ট দশতলা বাড়ি, তার সাতভলায় প্রশান্ত ঘটকের ফ্ল্যাট। পালিশ করা দরজার ওপর চকচকে পেতলের নেমপ্লেটে ঘটক সাহেবের নাম লেখা। কলিং বেল বাজাতে নীল ফুলপ্যাণ্ট আর সাদা বুশশার্ট-পরা একটি লোক এসে দরজা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে একপাশে সরে দাঁড়াল। তার পেছনে একটি প্রায়ান্ধকার ঘর, সিঁড়ির উজ্জ্বল আলো থেকে ভেতরে ঢুকলে প্রথমটা কিছুই ঠাহর হয় না। একটু বাদে বোঝা যায় যে ঘরটা মস্ত বড়, যতটা লম্বা ততটা চওড়া নয়। একদিকের লম্বা দেওয়াল জুড়ে থিয়েটার স্টেজের স্ক্রীনের মত মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ধূসর রঙের পর্দা ঝোলানো। তার পেছনে যে টানা জানলা আছে, সেটা পর্দার ওপর চলমান আলো দেখলে বোঝা যায়। লম্বা দেওয়ালের একদিকে একটা গ্রিলে ঢাকা বারান্দা, অন্যদিকে বোধ হয় বেডরুমে যাবার দরজা। সিঁড়ি থেকে ঘরে ঢোকার দরজাটা অন্য লম্বা দেওয়ালটার মাঝখানে। তারও দুপাশে দুটো দরজা, কিসের কে জানে। সবাই ভেতরে ঢুকলে নীল ফুলপ্যাণ্ট একটা বড় আলো জ্বেলে দিল।

ঘরটির আসবাবপত্র মহার্ঘ না হলেও সুরুচিপূর্ণ। পুরোনো আর হালফ্যাশনের একটা সুন্দর সমন্বয়। দেওয়ালে একদিকে যামিনী রায় অন্যদিকে গণেশ কর্মকার। বইয়ের আলমারিতে রবীন্দ্রনাথ আর য়াসুনারি কাওয়াবাতার সহজ সহাবস্থান।

প্রশান্ত ঘটক সাদা ট্রাউজার্স আর হলুদ রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি পরে একটা সোফার ওপর বসেছিলেন। অতিথিদের দেখে উঠে

দাঁড়ালেন। মিউজিক সিসটেমে মৃদু স্বরে স্বরোদ বাজছিল। সেটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এগিয়ে এলেন সবাইকে স্বাগত জানাতে। অত্যন্ত সুপুরুষ লম্বা রোগাটে গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে তদ্রুপ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, স্টিল ফ্রেমের চশমার পেছনে একজোড়া চঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল চোখ।

শিবেন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর, নীল ফুলপ্যান্টকে চা আনবার আদেশ দিয়ে দময়ন্তীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ডিটেকটিভ? আপনাকে কিন্তু দেখলে শিক্ষা জগতের লোক বলে মনে হয়।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'মূলত আমি কিন্তু শিক্ষাজগতেরই লোক। ভুবনেশ্বরী দেবী গার্লস কলেজে ইতিহাস পড়িয়ে থাকি। রহস্য খুঁজে বেড়ানোটা আমার নেশা, পেশা নয়।'

'সে ভালো কথা। কিন্তু আপনাকে তো কেউ এই কাজে নিযুক্ত করেছে? তিনি কে? না কি আপনি পুলিশ বিভাগেই আছেন?'

'আমি পুলিশকে সাহায্য করে থাকি ঠিকই, যদি ওঁরা চান। তবে এক্ষেত্রে আমাকে নিযুক্ত করেছেন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন শেয়ার হোল্ডার।'

'শেয়ার হোল্ডার? লেবার য়ুনিয়ন নয়?'

'না। আপনাদের বড় শেয়ার হোল্ডারদের একজন। তবে তাঁর নাম বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না, না, তার দরকার নেই।' বলে প্রশান্ত ঘটক যেন একটু স্বচ্ছন্দ হলেন। আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'আশ্চর্য। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তার মানে আমাদের কোন কোন শেয়ার হোল্ডার ভাবছেন যে আমরা যে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছি, তার মধ্যে কোন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, আমরা পুলিশকে যতটা সাহায্য করা দরকার, ততটা করছি না। ব্যাপারটা কি ভাই?'

'ব্যাপারটা অনেকটা তাই বটে। কিন্তু আপনি যে অর্থে বললেন, ঠিক সেই ভাবে নয়।'

'কি ভাবে সেটা যদি একটু খুলে বলেন।'

'বলব, কিন্তু তার আগে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ইচ্ছে হলে উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না।'

'তা তো বটেই। আমার সাংবিধানিক অধিকার আমার ভালই জানা আছে। কিন্তু, এ কথাটা আপনি বললেন কেন? আপনার কি ধারণা যে এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আমার এড়িয়ে যাবার দরকার হতে পারে?'

'হ্যাঁ, পারে। কারণ, প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগত।'

'ব্যক্তিগত?' প্রশান্ত আবার সোফার ওপরে খাড়া হয়ে বললেন, 'বলেন কি? আপনি কি তদন্ত করে এই সাবোটাজগুলোর ব্যাপারে আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন নাকি?'

'এখনও করি নি। তবে সন্দেহভাজনদের মধ্যে যে আপনি একজন, সে কথাটা ঠিক।'

'ঠিক? কী সর্বনাশ! আপনি বোধ হয় হোয়াইট স্টারের ইতিহাস জানেন না।'

'খুব ভাল করে জানি। এর উন্নতির পেছনে আপনার অবদানের কথাও আমাদের অজানা নয়।'

'অজানা নয়? তবু আপনার সন্দেহভাজনদের মধ্যে আমি একজন? ভালো কথা। তাহলে শুরু করুন আপনার প্রশ্ন।' বলে প্রশান্ত আবার পেছনে হেলান দিয়ে বসলেন। মুখের মৃদু হাসি দেখে মনে হল, বেশ মজা পাচ্ছেন, মোটেই উদ্বিগ্ন নন।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এই ফ্ল্যাটটা আপনার?'

'হ্যাঁ। বছর ছয়েক আগে কিনেছি।'

'এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?'

'ম্যাকম্যাহন স্ট্রীটে, যার বর্তমান নাম বিপ্লবী উমেশ দত্ত সরণী।

বাগবাজারে। আমার পৈতৃক বাড়ি সেখানেই।'

'সে বাড়ি ছেড়ে দিলেন কেন?'

'আমার বাবা মারা যাওয়ার পর যখন সম্পত্তি ভাগ হয়, তখন আমি বাড়ির অংশ না নিয়ে টাকা নিয়েছিলুম। যদি জিজ্ঞেস করেন কেন, তাহলে তার উত্তর হচ্ছে যে একটা দোতলা বাড়ি তিন ভাইয়ের মধ্যে ভাগ না হয়ে দু' ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আমি একা, অতএব আমার সরে আসাই স্বাভাবিক।'

'সে কথা ঠিক। শুনেছি, আপনারা তিন ভাই, দুই বোন। তাঁরা কে কি করেন?'

'আমার বড়দা বাবার মতই, এডভোকেট। ছোট ভাই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। মুখার্জি অ্যাণ্ড ঘটকের সীনিয়ার পার্টনার। এর পর ছোট দুই বোন। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। একজনের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়, অন্যজনের কানপুরে।'

'আপনার দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে?'

'হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়ে আছে।'

'আপনি বিয়ে করেন নি কেন?'

প্রশান্ত ঘটক চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'এটা একটা বাস্তবিক ব্যক্তিগত প্রশ্ন বটে। ভালো কথা। এর সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর বলতে পারেন, ব্যর্থ প্রেম।'

'অর্থাৎ আপনি একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু...'

প্রশান্ত আবার খাড়া হয়ে বসলেন। দময়ন্তীকে বাধা দিয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'না, না, একটি মেয়েকে কেন? অনেক মেয়েকেই। যাকেই বলি, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' অমনি সে দৌড়ে গিয়ে আর একজনকে বিয়ে করে বসে। এমন করলে কখনো কারুর বিয়ে হয়?'

প্রশান্তর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। দময়ন্তী হাসতে হাসতে বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু আপনি এড়িয়েই যাচ্ছেন, মিস্টার ঘটক।'

প্রশান্তর হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল। ঈষৎ রুষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আমার এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি, বিশেষত এমন একটা ব্যাপারে যার সঙ্গে আমাদের কারখানার বিস্ফোরণের কোনরকম সম্পর্ক থাকার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না?'

দময়ন্তী স্মিত মুখে বলল, 'সম্পর্ক যে থাকতে পারে না, সে কথা কি জোর করে বলা যায়, মিস্টার ঘটক?'

'বলা যায় না?' বলে প্রশান্ত দু' হাত জোড় করে বললেন, 'একটু খোলসা করে বলবেন কি, আপনার সন্দেহ? দয়া করে আমাকে একটু তমসা হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন?'

'আমার এখনও সঠিক কোন সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে নি। তবে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আপনি কোন একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যাঁর কাছে হেরে গিয়েছিলেন, আজ তাঁর ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে আপনি এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন।'

স্থির, স্তম্ভিত, নিষ্পলক চোখে প্রশান্ত দময়ন্তীর কথাগুলো শুনলেন। তাঁর ফর্সা মুখটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ মাথাটা পেছনে হেলিয়ে একটা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাসিটা কোরকমে সামলে রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কে বলেছে আপনাকে এরকম কথা? আমাদের একজন শেয়ার হোল্ডার? উঃ, কী ভয়ানক ব্যাপার! মানুষের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই? এতদিন আগেকার ঘটনা! বাপরে বাপ!'

দময়ন্তী অবিচলিত গলায় প্রশ্ন করল, ঘটনাটা কি সত্যি নয়?'

হাত নেড়ে প্রশান্ত বললেন, 'না, না, সত্যি, একশোবার সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম জানেন? ধরুন আমি যদি বলি, ঔরংজেবের কুশাসনের ফলেই আজকের ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা, তাহলে আপনি হাসবেন, কিন্তু ঔরংজেবের কুশাসনটা কি মিথ্যে? সেইরকম আমি একদা একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু পারি নি—সেটা সত্যি হলেও তার জন্যে আজ আমি আমাদের কারখানায় বোমা মেরে আর আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছি, সে কথাটা কিন্তু হাস্যকরই হয়ে পড়ে।'

'ঘটনাটা কি ঘটেছিল, একটু বলবেন?'

'দেখুন, ব্যর্থ প্রেমের ঘটনাটা লোকে লুকিয়েই রাখে, গেয়ে বেড়ায় না। তবু বলছি, কেন বলছি, বুঝতেই পারবেন। উঃ, সে কোন কালের ব্যাপার! আমি এবং আমার এক সহকর্মী একই মেয়ের প্রেমে পড়েছিলুম। মেয়েটির দাদা আমাদের বন্ধু ছিল, আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কফি হাউসে আড্ডা দিত। তার মাধ্যমেই আলাপ, পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। মেয়েটি আমাকে বিয়ে করল না, করল আমার সহকর্মীকে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ তারা দুজনেই একই রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল আর আমি কোন রাজনীতির মধ্যে ছিলুম না। তাদের বিয়ের পর আমি যে কিছুদিন দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বিমনা হয়ে বেড়াই নি, এমন কথা বলতে পারব না। তবে তখন বয়েস অল্প, ভাঙা হৃদয় এবং বন্ধুত্ব জোড়া লাগতে বিশেষ সময় লাগল না। আজ আমরা তিনজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রেম যেটা ছিল, সেটা ঠিকই আছে, কেবল তার চরিত্রটা পাল্টে গেছে।'

'আপনার এই বন্ধুর নাম-ঠিকানা বলতে আপনার কোন আপত্তি আছে?'

'আছে। মনে রাখবেন তারা একটি সুখী সন্তুষ্ট পরিবার। তাদের এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের নোংরামির ভেতর কেন টেনে

আনতে যাব?' তারপর একটু থেমে প্রশান্ত মৃদু হেসে বললেন, 'তাছাড়া, আপনার সেই শেয়ার হোল্ডারটি তো আছেনই। তিনি এত খবর রাখেন আর এই খবরটা রাখেন না?'

'তা হয়তো রাখেন। সেটা পরে দেখা যাবে 'খন। আমরা এখন তাহলে চলি। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলুম।'

'না, না, কি যে বলেন। তবে এবার আমি একটা প্রশ্ন করব?'

'করুন।'

'আমার ওপরে কি এখনও আপনার সন্দেহ আছে?'

দময়ন্তী হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, আছে।' বলে উঠে দাঁড়াল।

প্রশান্তও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এইবার বুঝলুম পুলিশকে পুরো সাহায্য না করার অর্থ কি।'

শিবেন প্রশ্ন করল, 'এবার কার সঙ্গে দেখা করবেন? অলোকনাথের সঙ্গে কি?'

দময়ন্তী বলল, 'না। বালিটিকুরির ফ্যাক্টরির সিকিউরিটির যিনি প্রধান, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

ফ্রেডারিক ডিসিলভা। আগে ক্যালকাটা পুলিশেই ছিলেন। খুব ভালো করেই চিনি। রয়েড স্ট্রীটে বাড়ি। ওঁকে এখানেই নিয়ে আসি?'

'তাহলে খুব ভালোই হয়।'

'দাঁড়ান, তাহলে একটা ফোন করি।'

'এই এখন? রাত হয়ে গেল যে!'

'রাত? পুটেদার কাছে এখন তো সন্ধ্যেই হয় নি।'

'পুটেদা?'

'হ্যাঁ। ফ্রেডারিক থেকে ফ্রেডিদা পুলিশ মহলে কবে যেন পুটেদা হয়ে গেছে।' বলে শিবেন ফোন করতে উঠল। খানিকক্ষণ কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে বলল, 'পুটেদা এক্ষুণি আসছেন। এতটা

উৎসাহের কারণ বিস্ফোরণ-রহস্য না আপনি সেটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তা সে যাকগে। এবার বলুন, প্রশান্ত ঘটকের সঙ্গে কথা বলে কি মনে হল?'

'অত্যন্ত মসৃণ ব্যক্তিত্ব। এতই মসৃণ যে প্রায় পেছল বলা চলে।'

'এই ঘটনার পেছনে ওঁর হাত থাকা সম্ভব?'

'সম্ভব।'

'আর পঁচিশ বছর আগেকার ব্যর্থপ্রেমের প্রতিহিংসা?

'সেটাও অসম্ভব নয়।'

এরপর আর বিশেষ কথা হল না। শিবেন আর সমরেশ বসল দাবা নিয়ে, দময়ন্তী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ফ্রেডারিক ডিসিলভা এলেন আধ ঘণ্টা বাদে। নাম শুনলে যেমন পোর্তুগিজ জলদস্যু মার্কা অতিকায় চেহারার কোন লোক বলে মনে হয়, আসলে মোটেই সেরকম নন। বরং পুটেদা নামটাই বেশি সঙ্গত বলে মনে হল। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় একরাশ পাকা চুল, শীর্ণ মুখে পাকানো পাকা গোঁফ, অনতিদীর্ঘ রোগাটে শরীর, পরনে একটা নীল হাওয়াই শার্ট আর কালো ট্রাউজার্স, পায়ে কোলাপুরি চটি। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'খুব হতাশ হলেন তো? ভেবেছিলেন একটা লালমুখো সায়েব গটমট করতে করতে আসবে। এল কিনা একটা ভেতো বাঙালী।'

সমরেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বাঙালী নাকি?'

প্রবল বেগে মাথা নেড়ে ডিসিলভা বললেন, 'আলবৎ বাঙালী। ক্রীশ্চান বটি, কিন্তু নিবাস মিদনাপুর জেলার গেঁওখালির কাছে, গ্রামের নাম কুলহাটি।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াইট স্টারে কতদিন আছেন?'

'বেশি নয়, বছর তিনেক। পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করে পর্যন্ত এইখানেই আছি।'

'এই বালিটিকুরিতেই ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এই কারখানায় যে বিস্ফোরণটা হয়েছিল, সে ব্যাপারে একটু বলবেন ?'

'দেখুন, বলবার তেমন কিছু নেই! সেদিন ছিল বুধবার, দুপুর-বেলা পৌণে দুটো নাগাদ বিস্ফোরণটা ঘটে। আমি তখন গেট অফিসে লাঞ্চ সেরে আরও তিনজন অফিসারের সঙ্গে তাস খেলছিলুম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ! আমি তাড়াতাড়ি গেট অফিস বন্ধ করে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে বারণ করে দিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তরুণ চাকিকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলুম। দেখি, সব্বাই ফাউণ্ড্রির দিকে দৌড়ুচ্ছে। আমিও দৌড়োলুম! সেখানে পৌঁছে দেখি ভয়াবহ ব্যাপার। ফাউণ্ড্রি শপ একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। দুটো কিউপোলা ভেঙে দুমড়ে পড়ে আছে, বড় বড় প্যাটার্নগুলো ছত্রাকার, ছাদের অ্যাসবেসটস অনেক জায়গায় ফেটে চৌচির, মেঝে বালিতে ভর্তি। প্রথমেই লোকজন সামলে ভেতরে ঢুকলুম। আমার মনে একটাই চিন্তা, কেউ মরে নি তো ? না, কেউ মরে নি! কেবল প্যাটার্ন রাখার গোডাউনের ভেতর একজন ওয়ার্কার টিফিন করছিল। সে আহত হয়েছে আর অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলুম।

'পুলিশ এল ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। লালবাজার থেকে এক্সপার্টরা এলেন ঘন্টা তিনেক বাদে। বোঝাই গেল, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে টাইম বোমা। পরে শিবেনবাবুর কাছে জানতে পারি যে এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে—অন্য ফ্যাক্টরিতে।

'সেদিন পুলিশ ফাউণ্ড্রি শপের দু'চারজনকে জেরা করল। কিছুই বোঝা গেল না। ফাউণ্ড্রি শপে অনেক লোকের আনাগোনা, অফিসার থেকে সুইপার। তাদের সবাই সন্দেহভাজন আবার কেউই নয়। তবে, তার পরদিন থেকে দুজন ওয়ার্কার বেপাত্তা হয়ে গেল।

একজন মহাবীরপ্রসাদ, চোর, মাতাল, জুয়াড়ি, দু-তিনবার হাজত-বাস করে এসেছে। অন্যজন প্রভুদয়াল, এক নম্বরের চোর, বলতে পারেন ক্লেপ্টোম্যানিয়াক, চুরি না করে থাকতে পারে না, তার ওপর চরিত্রদোষও আছে। এদের দুজনের মিল হচ্ছে যে এরা সব সময় পয়সার অভাবে থাকে। ধারের ওপর ধার। আর একটা মিল, এরা কেউই ফাউণ্ড্রিতে কাজ করে না।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'এরা সেদিন ফাউণ্ড্রি শপে গিয়েছিল?'

'গিয়ে থাকতে পারে। অসম্ভব নয়। তবে, কেউ তাদের লক্ষ্য করে নি।'

'আচ্ছা, এরকম তো হতে পারে যে এই দুই নাককাটা সেপাই এত বড় গণ্ডগোল দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছে? কারণ, তারা জানে পুলিশ তাদের হেনস্থা করতে পারে। হয়তো গোলমাল মিটলেই তারা ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, এটা যে অসম্ভব তা বলব না। বরং বলব ভীষণভাবে সম্ভব।'

'আচ্ছা, সেদিন আপনাদের ফ্যাক্টরিতে যাঁরা যাঁরা গিয়েছিলেন, মানে বাইরে থেকে, তার কোন রেকর্ড আছে কি?'

'আছে। সেদিন যে ক'জন ভিজিটার এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা এবং ঢোকা আর বেরুনোর সময় লেখা আছে।'

'তাদের কেউ ফাউণ্ড্রিতে গিয়েছিলেন?'

'না। মানে, কাগজে কলমে না। ধরুন, কেউ গিয়েছেন মেশিন শপে। ফেরার সময় ফাউণ্ড্রি ঘুরে গেলেন। সেটা ধরবার উপায় নেই।'

সমরেশ বলল, 'আচ্ছা, আপনাদের হেড অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যদি কেউ এসে থাকেন, তাদের নামও কি আপনারা রেকর্ড করেন?'

ডিসিলভা মাথা নেড়ে বললেন, 'না, তাদের নাম রেকর্ড করা হয় না। তবে, হেড অফিস বা ব্রাঞ্চ অফিস থেকে সাধারণত অফিসাররাই আসেন। তাঁরা তো আর এ কাজ করতে যাবেন না।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি? এ ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ নেই?'

'না, কোন সন্দেহ নেই।'

'ভাল। তবে সেদিন কোন অফিসার এসেছিলেন কিনা আপনার মনে পড়ে?'

'না। তাছাড়া, তাঁরা গাড়ি করে আসেন। কম্পানীর গাড়ি দরোয়ানরা চেনে। দেখলে গেট খুলে দেয়। গাড়ির ভেতরে কারা বসে আছেন সেটা আর লক্ষ্য করে না।'

'তার মানে কোন অফিসার যদি সঙ্গে করে এমন কোন লোক গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে আসেন, যে হয়তো সেই অফিসারের অজান্তেই কারখানার ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করল, তাকে ধরবার কোন উপায় নেই?'

ডিসিলভা একটু ভেবে বললেন, 'না, নেই। তবে এমন ঘটনা ঘটা কি সম্ভব? কোন অফিসার কি কারখানার ক্ষতি করতে পারেন? তাহলে তো তাঁরই ক্ষতি। আর, এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে কোন অফিসার ঘুষ খেয়ে এরকম কাজ করবেন না।'

দময়ন্তী আবার হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, তা আশা করা যায় বটে।'

ডিসিলভা চলে গেলে দময়ন্তী বলল, 'পুলিশ হিসেবে আপনার পুটেদা কিন্তু বেশ নাঈভ—সরলচিত্ত লোক।'

শিবেন বলল, 'তা যা বলেছেন। সেইজন্যেই ওঁর বড় একটা উন্নতি হয় নি। সবাইকে অপক্ষপাতে বিশ্বাস করতেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, পুলিশে এমন লোক কিন্তু বিরল নয়। আগেও

ছিল, এখনও আছে। কিন্তু, তা নাহয় হল, পুটেদার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেন?'

'পারলুম বৈকি। যেমন ধরুন, বালিটিকুরির কারখানার ক্ষতি যদি কেউ সত্যি সত্যি করতে চায়, তাহলে তাকে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। মানে, ওখানকার সিকিউরিটি একেবারে নিশ্ছিদ্র নয়।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অন্য যে কারখানাগুলোতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানেও কি সিকিউরিটির এই রকম অবস্থা?'

শিবেন বলল, 'হ্যাঁ, অল্পবিস্তর এরকমই। তাছাড়া, সিকিউরিটি ব্যাপারটা একেবারে নিশ্ছিদ্র হতেও পারে না। চুরিচামারি হয়তো বেশ কিছুটা আটকাতে পারে, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যদি কেউ কারখানার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাকে শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারে না।'

দময়ন্তী বলল, 'বুঝতে পেরেছি।' বলে চুপ করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। খানিক বাদে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, অলোকনাথ আর অতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গোপনে যা যা খবরাখবর সংগ্রহ করা সম্ভব, সেটা করা যাবে কি?'

শিবেন বলল, 'যাবে। কত দিন সময় নেবেন?'

'সাত দিন।'

'ঠিক আছে।'

'আর একটা কথা। অতীন্দ্রনাথের কোন গার্লফ্রেণ্ড আছে কিনা সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে খোঁজ নেওয়া দরকার। থাকলে, তার সম্পর্কেও যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।'

'অতীন্দ্রনাথের যে বিবরণ তার ঠাকুর্দা দিয়েছেন, তাতে তার একাধিক গার্লফ্রেণ্ড থাকাই সম্ভব বলে মনে হয়।'

'তা যদি থাকে, তাহলে তাদের সকলের সম্পর্কেই খোঁজখবর

নেওয়া দরকার।'

শিবেন এল সাত দিন বাদে, সন্ধ্যেবেলা। হাতে একটা পেটমোটা ফাইল। সোফায় বসে সেই ফাইল খুলতে খুলতে বলল, 'খবর অনেক কিছুই পাওয়া গেল বৌদি, কিন্তু কোনটাই তেমন জোরদার বলে মনে হচ্ছে না।'

দময়ন্তী বলল, 'খবরগুলো শোনা তো যাক, তারপর দেখা যাবে তারা জোরদার কি জোরদার নয়।'

শিবেন বলল, 'বেশ, তাহলে শুরু করি? প্রথম, অলোকনাথ ঘোষাল। এঁর ছাত্রজীবনের কথা আমরা অশোকনাথের মুখেই শুনেছি। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে হোয়াইট স্টারে কর্মজীবন শুরু করেন। এককালে ঘোর বামপন্থী ছিলেন, লেবার য়ুনিয়নের অফিস বেয়ারাও ছিলেন। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে কখনও ফাঁকি ছিল না। ফলে, কর্মজীবনে ক্রমাগত উন্নতি হয়ে গিয়েছে। হোয়াইট স্টারের লেবার য়ুনিয়নের সঙ্গে সম্প্রতি ওঁর সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, অলোকনাথকে মনে মনে এখনও অনেকেই অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস না করারই পক্ষপাতি।'

সমরেশ জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক কি এখনও রাজনীতি করেন নাকি?'

'না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, শুনলুম, এখনও নাকি বেশ বামঘেঁষা। তা সে যাই হোক, ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন তাঁর বাবার অমতে আজ থেকে বছর ছাব্বিশ আগে। স্ত্রী ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্রজীবনে দুবার জেলও খেটে এসেছেন। আপনি হয়তো তাঁর প্রাকবিবাহ নাম শুনেও থাকতে পারেন। তিনি তপতী গোস্বামী।'

দময়ন্তী বলল, 'না, তপতী গোস্বামীর নাম শুনেছি বলে মনে

হচ্ছে না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে রাজনীতি করতেন যাঁরা, খুব বিখ্যাত না হলে তাঁদের নাম শুনে থাকলেও মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'তা যা বলেছেন। তপতী গোস্বামী কোনদিনই একেবারে সামনের সারির নেতা ছিলেন না। তবে, রাজনৈতিক কাজকর্ম করতেন। ওঁর বাবা কিন্তু এককালে খুব নামকরা লোক ছিলেন। মন্মথনাথ গোস্বামীর নাম শুনেছেন?'

'কোন মন্মথনাথ গোস্বামী? সঙ্গীতাচার্য?'

'হ্যাঁ, উনিই। ওঁর দুই মেয়ে। তপতী আর প্রণতি। প্রণতি আজ বিয়ের পর প্রণতি উকিল হয়েছেন। উনিও গান করেন। টপ্পা আর ঠুংরিতে প্রণতি উকিলের নাম বড় কম নয়। রেকর্ড যদিও বেশি নেই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রণতি উকিলের নাম আমরা সবাই জানি।' বলল সমরেশ, 'গত বছর পূর্ব কলকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে হোরি আর কাজরী গেয়ে আসর মাত করে দিয়েছিলেন। তার পরেই ছিল ওস্তাদ দাউদ জৌনপুরির সরোদ। তিনি তো রেগে কাঁই।'

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'ব্যস! ওই পর্যন্ত।'

দময়ন্তী বলল, 'অনুও খুব ভাল গায়। আমাদের কলেজের সব ফাংশনে ওর গান থাকবেই। বুঝতে পারছি, গান ব্যাপারটা ওর রক্তে আছে। কিন্তু, অশোকনাথ যে বলেছিলেন যে তাঁর পুত্রবধূ নিরক্ষর, কদাকার, বস্তিতে বড় হয়ে ওঠা, ওঁর বাড়িতে ঢোকার অনুপযুক্ত, সেটা কি ব্যাপার?'

'নিরক্ষর মানে আই-এ পাশ। রাজনীতি করতে গিয়ে বি-এটা পাশ করে ওঠা হয় নি। তার ওপর তপতী পড়াশুনো করেছেন শ্যামবাজারের এক গার্লস হাই স্কুলে, কোন কনভেন্টে নয়। কিন্তু, ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছিলেন। অতএব অশোকনাথের কাছে যে ইনি নিরক্ষর হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? কদাকার? চেহারা দেখি নি, বলতে পারব না। বস্তিতে মানুষ? সেটা মিথ্যে

নয়, অন্তত অশোকনাথের স্ট্যাণ্ডার্ডে। সঙ্গীতাচার্য মন্মথনাথ সারা জীবন গানের মধ্যে ডুবে থেকেছেন। টাকা রোজগার করাটাই জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য, এই ধারণাটাই তাঁর ছিল না। তাছাড়া, সে যুগে স্রেফ সঙ্গীতসাধনা করে একটা ভয়ঙ্কর ধরনের অর্থোপার্জন করার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। তবু বলব, খুব একটা দারিদ্র্যের মধ্যেও বোধ হয় ছিলেন না। বাড়ি ছিল বাগবাজারের অনুকূল বড়াল লেনে। পাড়াটা মধ্যবিত্ত ভদ্র এলাকা। আর একটা কথা। এই অনুকূল বড়াল লেন বেরিয়েছে বিপ্লবী উমেশ দত্ত সরণী থেকে।

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

'এরপর আসছে অতীন্দ্রনাথ। অশোকনাথের কাছে সে অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট হতে পারে, কিন্তু লেখাপড়ায় কখনোই খুব একটা ভাল রেজাল্ট করে নি। বরং, কোনরকমে টেনেমেনে পাশ করেছে। স্কুলে তো এক বছর ফেলই করেছিল। কিন্তু, খেলাধুলোয় এক্সপার্ট। সে টেনিসে য়ুনিভার্সিটি ব্লু, এ বছর স্টেট রেপ্রেসেন্ট করতে পারে। তাছাড়া, রোয়িং-এ খুব ভাল। ফার্স্ট ডিভিশনে ক্রিকেট খেলে। কন্দর্পকান্তি চেহারা। কেবল একটা দোষ আছে। ভয়ানক মাথা-গরম ছেলে—অ্যাংরি ইয়ংম্যান বলতে যা বোঝায়। ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে, ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। একটা সাড়ে তিন হর্স পাওয়ারের মোটর সাইকেল আছে, সেইটে নিয়ে বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ায়। কেবল, একটা সময় ছাড়া।'

'কোন সময়? যখন ওর সঙ্গে ওর গার্লফ্রেণ্ড থাকে?'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক ধরেছেন। ছেলেটার মুখের রেখাগুলো তখন নরম হয়ে আসে, মুখে হাসি ফোটে। পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্টুরেন্টে ছোকরাকে একদিন দেখেছি, সঙ্গে মেয়েটি ছিল। রীতিমত হা হা করে হাসছিল।'

'একজনই গার্লফ্রেণ্ড, না একাধিক?'

'ছেলেটির চরিত্র সেদিক দিয়ে ভাল। কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছে, কাজেই অনেক বান্ধবী থাকাই সম্ভব। কিন্তু যাকে দেখলে ছোকরা খুশি হয়ে ওঠে, সে একজনই।'

'এই একজন সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন?'

'নিয়েছি। কিন্তু, আপনার কি সত্যি মনে হয় যে এ মেয়েটি এই ঘটনার সঙ্গে কোনভাবে জড়িত থাকতে পারে? নাকি বিশুদ্ধ সার সে লা ফ্যম থিওরি চালাচ্ছেন?'

'পরে বলব। আগে মেয়েটির বিষয়ে বলুন।'

শিবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মেয়েটির নাম বৈদেহী চ্যাটার্জি। বাবা নাম করা ডেন্টিস্ট, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। বাড়ি জাস্টিস শশিশেখর মিত্র রোডে। আপাতত বি-এ পড়ছে, সেন্ট লুসিয়া কলেজে, অঙ্কে অনার্স।'

'দেখতে কেমন?'

'তেমন আহা মরি কিছু নয়, তবে মোটের ওপর ভাল দেখতে। রোগাপটকা, চোখে চশমা—যেমন হয় আর কি।'

'এই বৈদেহীর সঙ্গে অতীন্দ্রনাথের পরিচয় হল কি করে?'

'জানা যায় নি।'

অতীন্দ্রনাথের মামাতো ভাইয়ের খবর নিয়েছেন? যাঁর কথা অশোকনাথ বলেছিলেন?'

'নিয়েছি। সে তার পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই থাকে। জুয়েল ছেলে। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, চাকরিতেও শুনেছি উন্নতি করছে। নাম পবিত্র চক্রবর্তী। মিসেস ঘোষালের মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে। সেই ভাই অনেকদিনই মারা গেছেন। ভাইয়ের স্ত্রী কোথায় আছেন জানি না, খুব সম্ভবত তিনিও বেঁচে নেই। ছেলেটির মেরিট দেখে অলোকনাথ তাকে ছেলেবেলা থেকেই নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছেন, এবং, অশোকনাথের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে, নিজের ছেলের চেয়ে একেই উনি বেশি ভালবাসেন।

আর সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। চালচলনে কথাবার্তায় এর পাশে অতীন্দ্রনাথকে বখাটে বলেই মনে হয়। পবিত্র চক্রবর্তী সার্থকনামা ছেলে।'

সমরেশ বলল, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'একটু যে যাচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু, ছেলেটিকে দেখলে আর তার সঙ্গে কথা বললে, তোরও বাড়াবাড়ি করতে ইচ্ছে করবে।'

দময়ন্তী বলল, 'অশোকনাথ বলেছিলেন যে এরা দুই ভাই সহকর্মী…'

'হ্যাঁ, এরা দুজনেই হোয়াইট স্টারে আছে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনী। অতীন্দ্রনাথ পার্সোনেলে আর পবিত্র কোয়ালিটি কণ্ট্রোলে।'

সমরেশ বলল, 'কোয়ালিটি কণ্ট্রোলে? তার মানে পবিত্র ইঞ্জিনীয়ার?'

'হ্যাঁ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। তার পিসেমশাইয়ের মত।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'পার্সোনেলে কি করতে হয়?'

'পার্সোনেলে, মানে হোয়াইট স্টারে যারা চাকরি করেন, তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানতে হয়, তাদের দেখভাল করতে হয়, তাদের বদলি, উন্নতি বা অবনতি, শাস্তি বা পুরস্কার, ছুটিছাটা, ছাঁটাই বা নতুন লোক ঢোকানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আর কোয়ালিটি কণ্ট্রোলে?'

সমরেশ বলল, আমি বলছি। কোয়ালিটি কণ্ট্রোলে কোয়ালিটি কণ্ট্রোল করতে হয়। অর্থাৎ, যে মাল বাজারে বেরুচ্ছে সেটা সঠিক মানের হল কিনা সেটা দেখতে হয়, মাল নিচু মানের হলে সেটা বাদ দিতে হয়।'

'কোন কাজটা বেশি কঠিন?'

'দুটোই সমান কঠিন।'

'কোন কাজে ফ্যাক্টরির ভেতরে ঘুরে বেড়াতে হয়?'

'দুটোতেই হয়।'

দময়ন্তী হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, 'দুটোতেই হয়, না?' বলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ম্যানেজমেন্টে ট্রেনীরা কি ফ্যাক্টরিতে থাকে, না হেড অফিসে বসে?'

শিবেন বলল, 'হেড অফিসে। প্রয়োজনে ফ্যাক্টরিতে যায়।'

'বৈদেহী চ্যাটার্জির সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। যত শিগগির সম্ভব।'

'দেখছি। পরশু একটা ছুটির দিন আছে। সেদিন চেষ্টা করা যাবে। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে কিছু বলব? না, তাঁকে না জানিয়ে ব্যবস্থা করব?'

'আপাতত না জানিয়ে ব্যবস্থা করুন।'

'বেশ, তাই করা যাবে।'

'আর একটা কথা। বৈদেহীর সঙ্গে যেদিন দেখা হবে, তার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্যামাক স্ট্রীটে হোয়াইট স্টারের হেড অফিসে অলোকনাথের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। পারবেন?'

'চেষ্টা করে দেখব।'

বৈদেহী এল বিকেলের দিকে। শিবেন আর রমলা আগে থেকেই এসে বসেছিল। দেখা গেল, মেয়েটি বেশ সাদাসিধে, যেমনটি শিবেন বলেছিল। ফ্যাশনের মধ্যে চোখে একজোড়া মস্ত স্টিলফ্রেমের চশমা। তবে, মেয়েটির বড় বড় চোখ আর শান্ত নির্বিরোধ মুখে এমন একটা কিছু আছে যা মনকে খুশি করে তোলে।

দময়ন্তী হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা করল, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, 'বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় নি তো?'

বৈদেহী মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, কোন অসুবিধে হয় নি। শিবেনবাবু এমন সুন্দর ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন যে বাড়ি ভুল করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।'

'শিবেনবাবু তোমার এখানে আসাটা গোপন রাখতে বলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি কাউকে বলি নি। বাড়িতে বলে এসেছি, বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি। আমাদের বাড়ি থেকে এ বাড়ি তো খুব দূর নয়।'

'না, তা নয়। আচ্ছা, তুমি তো জানো যে শিবেনবাবু পুলিশের লোক। আমি কে জানো ?'

বৈদেহী ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। অনিন্দিতা আমাকে বলেছে।'

'আমি তোমাকে কেন ডেকেছি, জানো ?'

এইবার বৈদেহীর মুখে একটা কালো ছায়া নামল। বলল, 'ঠিক জানি না। তবে, অনুমান করতে পারি।'

'কেন বল তো ?'

অতীনের সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তো ? আমাকে বলবেন যে সে একজন ক্রিমিন্যাল, একজন ভয়ানক খারাপ লোক। আমার উচিত তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করা, তার মুখ না দেখা। অতীনের বাবা যা পারেন নি, আপনি সেটাই করবেন। আপনি ভাবছেন যে যেহেতু আপনি ডিটেকটিভ, ক্রিমিন্যালদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, অতএব আপনি যা বলবেন আমি তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেব। আমি অনুর কাছে শুনেছি আপনার সম্পর্কে অনেক কথা। আমি বিশ্বাস করি আপনি টাকা নিয়ে এত বড় মিথ্যেটা আমার সামনে সত্যি বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু, আপনাকে অতীনের বাবা কি বলেছেন আমি জানি না, তবে আপনি যদি সেগুলো বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে সেটা মস্ত ভুল। সে কথাগুলো সব মিথ্যে, বিশ্বাস করুন, সব মিথ্যে কথা। উনি আমার বাবাকে বলে আমাকে অতীনের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেছেন।

আপনাকেও করতে হবে।' বলতে বলতে বৈদেহীর গলা আটকে গেল। কান্না আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টায় মুখে রুমাল গুঁজে বসে রইল ঠিকই, কিন্তু দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে যেতে থাকল।

মেয়েটির মুখে কথা শুনে ঘরের বাকি চারজন স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দময়ন্তী বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তোমার ধারণা ভুল, বৈদেহী। আমার বিশ্বাস অতীনের পরিবারের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। তোমাকে ডেকেছি, কিভাবে সেই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করা যায় সে বিষয়ে পরমর্শ করবার জন্যে।'

দময়ন্তীর কথায় বৈদেহীর বিশেষ কোন ভাবান্তর হল না। নতনেত্রে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনাকে কি পরামর্শ দেব? আপনি ঠাট্টা করছেন আমাকে? আপনি ওর বাবাকে বলুন, ওর মাকে বলুন।'

'তুমি বিশ্বাস কর বৈদেহী, আমি ওর বাবাকেও চিনি না, মাকেও চিনি না। তাঁদের সঙ্গে আমার কখনও কোনরকম ভাবে যোগাযোগ হয় নি। আচ্ছা, তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে অতীনের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্ক ভাল নয়, কেন?'

'তা, আমিও ঠিক জানি না। উনি অতীনকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। খালি বলেন, আমার ছেলেটা খারাপ, নষ্ট হয়ে গেছে, ক্রিমিন্যাল হয়ে গেছে। অথচ, কি খারাপ কাজ যে অতীন করেছে, তা আমি আজও জানতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, উনি যেরকম চেয়েছিলেন, অতীন সেরকম হয় নি। উনি চেয়েছিলেন অতীন হবে আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক, প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং ইত্যাদি। তার বদলে, সে হয়েছে বহির্মুখী, ফুর্তিবাজ। সব সময় গোমড়া মুখে ঘরের কোণায় বসে অনবরত নানারকম সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করে, সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়—এই বোধ হয়

তার অপরাধ।'

'অতীনের মারও কি এই রকমই মনোভাব?'

'না। উনি আছেন বলেই অতীন বেঁচে আছে। উনি যদি ওকে সবসময়ে আগলে না রাখতেন, তাহলে ওকে বোধ হয় এতদিনে রাস্তায় দাঁড়াতে হত।'

'তুমি যে বললে, অতীন ফূর্তি করতে ভালবাসে, জীবনকে উপভোগ করতে চায়, তাতে তো অনেক টাকা লাগে। অতীন কি সে টাকা রোজগার করে?'

'না, তা করে না। তবে, ও কখনও টাকা ওড়ায় না। যদি টাকায় কিছু কম পড়ে, তাহলে ওর মা লুকিয়ে টাকা দেন। ওর ঠাকুর্দাও দেন। জানেন, ওর টেনিস র‍্যাকেট কিনে দিয়েছেন ওর ঠাকুর্দা, রোয়িং ক্লাবের চাঁদার টাকা দেন ওর মা। ওর বাবা হলে এক পয়সাও দিতেন না। অথচ, আগামী বছর ও যাচ্ছে টেনিসে স্টেট রেপ্রেজেন্ট করতে। ওর বাবা ওর খেলাধুলো করাটাও পছন্দ করেন না। কিছুই পছন্দ করেন না।'

'ওঁর আদর্শ বোধ হয় অতীনের মামাতো ভাই পবিত্র, তাই না?'

বৈদেহী বিস্ফারিত চোখে বলল, 'ঠিক বলেছেন। উঃ, ওটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। সারা বিশ্বের সমস্ত দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে কেবল জাবর কাটতে পারেন। অথচ জিজ্ঞেস করুন বিয়ন বর্গ কে অথবা এ বছর মোহনবাগানের ক্যাপ্টেনের নাম কি—হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। এসব ওঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার।'

'মোহনবাগান তুচ্ছ ব্যাপার?' সমরেশ হাঁইমাই করে লাফিয়ে উঠল, 'এ লোকটা তো মানুষ খুন করতে পারে দেখছি।'

এতক্ষণে বৈদেহীর মুখে হাসি ফুটল। তা যা বলেছেন।'

দময়ন্তী একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'তুমি এই পরিবারের সবাইকে কতটা চেনো? খুব ঘনিষ্ঠভাবে চেনো কি?'

বৈদেহী মাথা নাড়ল। বলল, 'খুব যে একটা ঘনিষ্ঠভাবে চিনি

তা নয়, তবে ওদের বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই যাই আর কি।
আসলে আমার মা আর অতীনের মা বন্ধু, মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত হয়। অতীনের বাবাকে ছেলেবেলা থেকেই এড়িয়ে চলি। বাকি সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ভালই।'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'তা তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। অতীনের বাবার স্বাস্থ্য কেমন?'

'ভালো নয়। গত বছর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। এখন খুব সাবধানে থাকেন। উত্তেজনা ওঁর পক্ষে এখন খুব ক্ষতিকারক।'

রমলা বলল, 'মেয়েটি ভারি মিষ্টি। কিন্তু, অতীন ছেলেটি খুব সুবিধের বলে মনে হল না। যার বাবা তাকে উন্মার্গগামী বলে মনে করে, তার সঙ্গে তোর মেলামেশা করার দরকারটা কি?'

শিবেন বলল, 'এঁঃ, উন্মার্গগামী! ভালো ভালো বাংলা বলা হচ্ছে। নিজের কথা ভুলে গেলে? তোমার বাবা তো আমাকে উন্মার্গগামী তো কম কথা, একেবারে নরকের কীট বলে ভাবতেন। পুলিশ, তার মানে নিশ্চয়ই ঘুষ খায়, নিশ্চয়ই দুশ্চরিত্র। কিন্তু, তাতে কি আমার সঙ্গে মেলামেশা সব বন্ধ করেছিলে তুমি? এসব হচ্ছে ভালোবাসার ব্যাপার, বুঝেছো?'

সমরেশ হাত নেড়ে বলল, 'ধুত্তোর ভালোবাসা! রমলা তো ঠিকই বলেছে। অতীনকে খারাপ ছেলে বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তার বাবা, তোকে তো আর তোর বাবা নরকের কীট বলেন নি। বাপ নিজের ছেলেকে চিনতে ভুল করবেন না, অন্যের ছেলেকে করতে পারেন।'

শিবেন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর লেকচার দিতে হবে না। আপনি বলুন তো বৌদি, কতদূর কি বুঝলেন?'

দময়ন্তী বলল, 'সবটা বুঝেছি তা নয়। তবে একটা ছবি ফুটে উঠছে। কেবল একটা বিষয়ে জানা দরকার, তাহলেই সব সন্দেহের

নিরসন হয়।'

'কি বিষয়ে?'

'যে চারটে কম্পানীতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কিনা। অর্থাৎ, সুপ্রীম সেরামিক্স, ডায়মণ্ড গ্লাস, গ্লোব ইনসুলেটারস আর হোয়াইট স্টার—এরা পরস্পরকে মাল সাপ্লাই করে কিনা। করলে, তার কোন বিশেষ পদ্ধতি আছে কিনা।'

'বেশ, এ খবরটা কাল পাবেন। কাল মিস্টার সুজিত নন্দীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে—অন্য ব্যাপারে—তখনই ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাবে। তাছাড়া, কাল বিকেল চারটের সময় আমরা হোয়াইট স্টারের হেড অফিসে যাচ্ছি। সমরেশ অফিস থেকে এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে রাখিস, আমি বৌদিকে কলেজ থেকে তুলে নিয়ে তোর অফিসে চলে যাব। তারপর সেখান থেকে ক্যামাক স্ট্রীট তো কয়েক মিনিটের রাস্তা।'

সমরেশ গাড়িতে উঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।'

শিবেন বলল, 'কি করে বুঝলি?'

'কাল রাত দেড়টার সময় একবার ঘুম ভাঙল। দেখি দময়ন্তী প্যাট প্যাট করে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার ঘুম ভাঙল। দেখি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অর্থাৎ, দেড়টা থেকে আড়াইটের মধ্যে…'

'সমাধান পাওয়া গেছে—সত্যি নাকি বৌদি? বোমাবাজকে ধরে ফেলেছেন?'

দময়ন্তী সজোরে মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, বোমাবাজকে ধরতে পারি নি। তবে ব্যাপারটা কি ঘটছে এবং কেন ঘটছে, সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি।'

'তবে তো বোমাবাজকে ধরে ফেলার আর বেশি দেরি থাকা উচিত নয়। অতীনকে কিন্তু আমার বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। বাপের সঙ্গে যার এত শত্রুতা, তার পক্ষে এভাবে প্রতিহিংসা নেওয়াটা অসম্ভব নয়।'

'তা হয়তো নয়। তবে, আমার ধারণা অন্যরকম। বললুম তো, বোমাবাজটি যে কে তা এখনও পুরোটা বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু, আমি যে একটি খবর চেয়েছিলুম, তার কি হল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই তো আপনাকে বলা হয় নি। যে চারটে কম্পানীর কথা আপনি বললেন, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। সুপ্রীম সেরামিক্স, গ্লোব ইনসুলেটারস আর ডায়মণ্ড গ্লাস, প্রত্যেকেই হোয়াইট স্টারকে মাল সাপ্লাই করে থাকে। এদের সকলেরই পুরোন বাঁধা খদ্দের হল হোয়াইট স্টার।'

দময়ন্তী বলল, 'আমি ঠিক এটাই আশা করছিলুম।' বলে স্থির দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। শিবেনের গাড়ি ক্যামাক স্ট্রীটে ঢুকল।

অলোকনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বাবা অশোকনাথের প্রবল সাদৃশ্য। একই ধরনের রোগাটে চেহারা, ফর্সা গায়ের রঙ, পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক, ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, সজাগ তীক্ষ্ণ চোখ। মস্ত টেবিলের ওপাশে ভদ্রলোকের শরীরের অধিকাংশই অদৃশ্য, কেবল সাদা শার্টের খানিকটা আর একটা নীল সাদায় ডোরাকাটা টাই দৃশ্যমান।

অনেকে আছেন, যাঁদের ঘরে ঢুকলে অতিথিরা তাঁদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। সেরকম শঙ্কা-জাগানো ব্যক্তিত্ব অলোকনাথের নয়। প্রথমত, ঘরে ঢুকে তাঁকে তো রীতিমত যেন খুঁজে নিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের দেওয়ালে একগাদা গ্রাফ, চার্ট আর বড় বড় ফ্যাক্টরির বাঁধানো ছবির বদলে একটা হাল্কা নীল

রঙের নিরাভরণ শূন্যতা প্রীতিপ্রদ বলেই মনে হয়। তৃতীয়ত, ভদ্রলোকের শান্ত, মার্জিত এবং অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শ্রোতাকে শশব্যস্ত করে তোলে না। তবে, সেই সঙ্গে তার কথা বলার ভঙ্গি এতই শীতল এবং ধারালো যে যত তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে থেকে সরে যাওয়া যায়, ততই শ্রেয় বলে মনে হয়। আর, আর একটা কথা বলে রাখা ভাল যে অলোকনাথকে কেউ কোনদিন হাসতে দেখে নি এবং তাঁকে হাসানোর প্রচণ্ড দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দু-একজন অতীতে করে থাকলেও কখনোই তা সফল হয় নি। তার ফলে, এমনিতেই এয়ারকণ্ডিশনড তাঁর ঘরে ঢুকে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে একেবারে উত্তর মেরুর মধ্যিখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

প্রাথমিক ভদ্রতা বিনিময়ের পর অলোকনাথ চোখের সামনে একটা লাল কালোয় ডোরাকাটা পেন্সিল ধরে প্রশ্ন করলেন, 'আমি আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

দময়ন্তী বলল, 'আমি কেন এসেছি, আপনি তা জানেন নিশ্চয়ই?'

'জানি। শুনেছি আপনি বালিটিকুরির ডিসিলভাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এখন আমার কাছে কি জানতে চান, বলুন?'

'আপনি কি জানেন যে বালিটিকুরির ফ্যাক্টরিতে যে বিস্ফোরণ ঘটে, সেরকম ব্যাপার এর আগে অন্য কয়েকটা ফ্যাক্টরিতেও হয়েছে?'

'হয়ে থাকতে পারে। এরকম ব্যাপার একেবারেই বিরল নয়। কিন্তু, অন্য কোন ফ্যাক্টরিতে যদি এই রকম ঘটনা ঘটেও থাকে, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের ঘটনাটার সম্পর্ক কোথায়? এবং, এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা বা না জানায় আপনার তদন্তের কি এসে যায়?' অলোকনাথের দৃষ্টি তখনও পেন্সিলে।

'এসে যায়, মিস্টার ঘোষাল। গত এক বছরে আপনার ফ্যাক্টরি ছাড়াও আরও তিন জায়গায় এই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই

চারটে ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য এতই বেশি যে সেটাকে ঠিক কাকতালীয় বলে ধরে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনারা ছাড়া অন্য তিনটে সংস্থা হচ্ছে ডায়মণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড, গ্লোব ইনসুলেটরস লিমিটেড এবং সুপ্রীম সেরামিক্স লিমিটেড।' বলে দময়ন্তী চুপ করল, যেন কোন প্রশ্ন করে না থাকলেও অলোকনাথের কাছ থেকে কোন মন্তব্য আশা করছিল।

অলোকনাথের দৃষ্টি পেন্সিল থেকে উঠে দময়ন্তীর মুখের ওপর পড়ল। প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বললেন 'এসব জায়গায় বোমাবাজি হয়েছে বলে জানি, কিন্তু এটা আমার জানা ছিল না যে চারটে ঘটনাই একেবারে একরকম।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ। এ ছাড়া সাদৃশ্য আরও আছে। চারটে সংস্থাই অতীতে বিদেশী মালিকানায় ছিল, চারটেরই আর্থিক অবস্থা আজ বেশ খারাপ, চারজনই পরস্পর পরস্পরকে তাদের মাল সরবরাহ করে থাকে, চারটে কম্পানীরই ডিরেক্টর বোর্ডে একজন করে মিস্টার এ. এন. ঘোষাল আছেন।' বলে দময়ন্তী আবার চুপ করে গেল।

অলোকনাথ কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকে অতি সামান্য উঁচু গলায় বললেন,'এই এ. এন, ঘোষালরা একই লোক নন।'

'আমি জানি। এবং এত জানি যে তাঁরা একই পরিবারভুক্ত। তাছাড়া মিস্টার ঘোষাল, সাদৃশ্য আরও আছে। এই চারটে কম্পানীরই শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছে এবং গত আর্থিক বছরের শেষে চারজনেই ঘোষণা করেছিল যে পৃথক পৃথক ভাবে তারা বড় অর্ডার পেয়েছে যাতে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এর মধ্যে আপনি কি কোন পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন?'

অলোকনাথের দৃষ্টি আবার পেন্সিলে ফিরে গেল। বললেন, 'এখনও নয়। আপনি যে কি বলতে চাইছেন, আমি এখনও বুঝতে

পারছি না।'

দময়ন্তী মৃদু হাসল। বলল, 'মিস্টার ঘোষাল, আপনার কি মনে হয় না যে এই সাবোটাজগুলোর উদ্দেশ্য একটাই—যেন এই কম্পানীগুলোর উন্নতি না হতে পারে?'

অলোকনাথ হিমশীতল গলায় বললেন, 'তা তো বটেই। কারুর উন্নতি করার জন্যে কেউ তো তার কারখানায় বোমা মারে না। আর কম্পানীগুলোর সাদৃশ্যের মধ্যে আপনি এ এন ঘোষালদের কথা বললেন। আপনার কি ধারণা যে এই কারখানাগুলোর ক্ষতি করার জন্যে তাঁরা কেবল বোমা মেরে বেড়াচ্ছেন? তাতে কার লাভ?'

'আমার ধারণার কথা আমি পরে বলব, মিস্টার ঘোষাল। তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কি এই চারটে সংস্থারই শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদার?'

হঠাৎ অলোকনাথের মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ল। বললেন, এখন আর নয়, আগে ছিলুম।'

'শেয়ারগুলো কি বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'না, আমার স্ত্রী আর মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি অনেক দিন আগে। নিজের কাছে হোয়াইট স্টারের সামান্য কয়েকটা আছে।'

'চারটে কম্পানীর শেয়ারই এইভাবে দিয়ে দিয়েছেন?'

'কেবল চারটে কেন? আরও অনেক কম্পানীর শেয়ার ছিল, সেগুলোও দিয়ে দিয়েছি।'

'ছেলেকে দেন নি?'

'না। এবং দয়া করে কেন দিই নি সেকথা জিজ্ঞেস করবেন না।'

'না, তা করব না। আচ্ছা, মিস্টার অশোকনাথ ঘোষালের এই চারটে কম্পানীর শেয়ার আছে কিনা আপনি জানেন?'

'জানি। উনি এদের সকলেরই অংশীদার ছিলেন।'

'ইনিও ছিলেন ? এখন আর নেই ?'

'না। আমি আমার স্ত্রী আর মেয়েকে আমার শেয়ারগুলো দিয়ে দেবার পর উনি জিদ করে এবং আমার প্রতি ওঁর রাগের বশে ওঁর শেয়ারগুলো আমার ছেলেকে দান করে দেন।'

'আপনি তো আপনার শেয়ার দান করেছেন সম্পত্তি কর বাঁচানোর জন্যে, অশোকনাথ দান করতে গেলেন কেন ? স্রেফ আপনার প্রতি রাগের বশে ?'

অলোকনাথের মুখে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠে এল। তবে সেটা এক লহমার জন্যে। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবং আমার ছেলের প্রতি অযৌক্তিক অন্ধ স্নেহের বশে।'

'বেশ। তার মানে আজকে কোন এ এন ঘোষালই এই কম্পানী-গুলোর অংশীদার নন ?'

'না।' এইবার অলোকনাথের গলাটা সামান্য উঠল, 'অংশ নেই ঠিকই, কিন্তু এই চারটে কম্পানীর পেছনেই এদের দুজনেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান আছে। কাজেই এদের কোনটারই ক্ষতি করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'সেটা আমরা পরে বিচার করব মিস্টার ঘোষাল। কিন্তু, এখন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি যে, যে সাবোটাজ করছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন এই কম্পানীগুলোর আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি না হয় এবং শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ারের দাম ক্রমাগত পড়েই যেতে থাকে ?'

'সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই আছে, তবে এটা একটা সম্ভাবনা সেটা মানতেই হবে। তবে, তাতে কার কি লাভ ?'

'ধরুন, আপনার কাছে কোন কম্পানীর অনেক শেয়ার আছে, কিন্তু সেই কম্পানীগুলোর প্রতি আপনার বিশেষ কোন দরদ নেই, সেটা যে কোন কারণেই হোক। সেক্ষেত্রে সেই কম্পানীর শেয়ার বাজারে দর যদি ক্রমাগত পড়ে যেতে থাকে, তাহলে তার থেকে

আপনি কি লাভ করতে পারেন না ? অনেক টাকার লাভ ?'

অলোকনাথের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার পেন্সিল থেকে দময়ন্তীর মুখে উঠে এল। তাঁর ফর্সা মুখটা ফ্যাকাশে বলে মনে হল। ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁ, করতে পারি বটে।'

'সেক্ষেত্রে সেই কম্পানীর যদি উন্নতি হয় এবং শেয়ার বাজারে তার দর উঠতে থাকে, তাহলে সেই কম্পানীর উৎপাদন আটকানোর জন্যে বোমাবাজি করা অস্বাভাবিক নয়, তাই না ?'

'না, তা নয়।' যন্ত্রচালিতের মত মাথা নাড়লেন অলোকনাথ। তারপর বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝেছি। কিন্তু আপনার অনুমান ঠিক নয়। এই চারটে কম্পানীর শেয়ার আমার পরিবারের যাদের কাছে আছে, তাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দরদ হয়তো নেই, কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা এদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি তা প্রমাণ করে দেব।' বলে টেলিফোন তুলে বললেন, 'মিসেস সাহা, আমার বাড়িতে আমার স্ত্রীকে একটু দেবেন।'

শিবেন প্রশ্ন করল, 'কিভাবে প্রমাণ করবেন ?'

অলোকনাথ বললেন, 'উনি কি ভাবছেন, আপনি তা নিশ্চয়ই জানেন ?'

শিবেন মাথা নাড়ল। বলল, 'না।'

অলোকনাথ একটু যেন আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'জানেন না ? উনি যা বলতে চাইছেন সেটা শেয়ার বাজারে একেবারে অপরিচিত খেলা নয়। এটা কোন কোন অসৎ ব্যবসায়ী করে থাকে। হয় কি, যখন কোন কম্পানীর শেয়ার পড়ে যাচ্ছে, ধরুন দশ টাকার শেয়ার আট টাকা হয়েছে, তখন আপনি আপনার শেয়ার বিক্রি করে দিলেন। আপনি আট টাকা পেলেন। পরদিন শেয়ারের দাম ছ' টাকা হয়ে গেল। তখন আবার আপনি সেই শেয়ারগুলো কিনে নিলেন। এবার আপনার ঘর থেকে বেরুলো ছ টাকা। দু' টাকা

আপনার ঘরে রয়ে গেল। এই লেনদেনটা যদি কয়েক হাজার শেয়ারে হয়, তাহলে লাভের পরিমাণটা কম হয় না।'

শিবেন মাথা চুলকে বলল, 'কিন্তু লাভটা যে কোথায় হচ্ছে, সেটাই তো বুঝলুম না। শেয়ারগুলো বেচে দিয়ে দশ টাকায় আপনি অন্তত আটটা টাকা পেয়েছিলেন। সেটা যখন আবার কিনে নিলেন, তখন দুটো টাকা ঘরে রইল বটে, কিন্তু দশ টাকার শেয়ারটা তো তখন ছ' টাকা হয়ে গেছে, এরপর পাঁচ টাকা কি চার টাকায় দাঁড়াবে। তখন সেটা বেচলেও তো আপনি ঘরের দু' টাকা ধরেও আট টাকা পাবেন না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে, বললুম তো, এটা করে অসৎ ব্যবসায়ীরা। তারা জোর করে বা ষড়যন্ত্র করে কোন বিশেষ শেয়ারের দাম কমায়, তারপর কেনাবেচাটা হয়ে গেলে আবার তার দাম বেড়ে যেতে দেয় যাতে করে সেটা আবার তাদের কেনা দামে উঠে আসে। তখন, তাদের আসল দামটাও ঠিক রইল, মাঝ থেকে বেশ কিছু টাকা ঘরে এসে গেল।'

শিবেন মাথা নেড়ে বলল, 'খেলাটা বুঝেছি, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে এ থিওরিটা দাঁড়াচ্ছে কি? যিনি বোমা মেরে শেয়ারের দামের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করলেন, তিনি কি আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের কম্পানী আবার বিরাট উন্নতি করবে? আপনাদের যা ক্ষতি হয়েছে, এখন তার থেকে বেরিয়ে আসতে তো অনেক সময় লাগবে।'

'খুব সত্যি কথা। আর সে কথাই তো আমি বলতে চাইছি।'

দময়ন্তী বলল, 'শেয়ারগুলো যদি বিনে পয়সায় পাওয়া হয়, তাহলে এই রকম কাণ্ড করে যা পাওয়া যায়, সেটাই তো লাভ, তাই না? আমার তো কেনা দাম বলে কিছু নেই। কেবল শেয়ারগুলো আছে।'

শিবেন হাত নেড়ে বলল, 'সেক্ষেত্রে শেয়ারগুলো কি সোজাসুজি

বিক্রি করে দেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত নয়? এত ঝামেলা করে যে টাকা পাওয়া গেল, তার থেকে তাতে বেশি বই কম পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য, শেয়ারগুলো বিক্রি করায় যদি কোন বাধা বা অবরোধ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।'

অলোকনাথ অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমার আত্মীয়দের যে শেয়ার আমি দিয়েছি তাতে কোন বাধা নেই। তারা সেই শেয়ার-গুলো বিক্রি করুক, ফেলে দিক, দান করুক, যা খুশি করুক, আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। যাই হোক, বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যদি দেখা যায় যে সেই শেয়ারগুলো সম্প্রতি অল্প ক'দিনের মধ্যে কেনাবেচা হয় নি, তাহলেই বোঝা যাবে যে আপনাদের অনুমান ভুল। শেয়ার কেনাবেচা হলে, শেয়ার কাগজের পেছনে তার রেকর্ড বা খতিয়ান থাকে, তা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে?'

বলতে বলতেই টেলিফোন বাজল। অলোকনাথ তাড়াতাড়ি ফোন তুলে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো, তপতী? শোন, তোমাকে এখুনি একটা কাজ করতে হবে। মন দিয়ে শোন, আমি তোমাকে আর অমুকে যত শেয়ার লিখে দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে এক্ষুণি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এখানে চলে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কি বললে? হ্যাঁ, সবগুলোই চাই। কয়েকটা হলে চলবে না কি? খুঁজে দেখতে হবে? তার মানে? সেগুলো যত্ন করে রাখা নেই? কি? তোমার গুলো তিমুকে রাখতে দিয়েছ? তিমুকে? কে তোমাকে সেগুলো তিমুকে দিতে বলেছে? আমি তোমাকে ওগুলো দিয়েছিলুম তিমুকে দেবার জন্যে নয়। না, সেই শেয়ার-গুলোতে আমার কোন অধিকার ছিল না ঠিকই। কিন্তু তাই বলে… কি বললে? তিমুকে লিখে দিয়েছ? উফ্!' বলে দড়াম করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর দু'হাতে মাথা টিপে ধরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

শিবেন দময়ন্তীর দিকে 'এবার কি করা যায় ?' দৃষ্টিতে তাকাল। দময়ন্তী বাঁ হাতে টেবিলের নিচে একটা বরাভয় মুদ্রা দেখালো, অর্থাৎ, 'চুপ করে বসে থাকুন। কিচ্ছু করার দরকার নেই।'

প্রায় দু' মিনিট একভাবে বসে রইলেন অলোকনাথ। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে সোজা হয়ে বসলেন। টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে বোধ হয় কলিং বেল বাজালেন, কারণ পাশের ঘরে গাঁক করে বেল বাজার শব্দ হল। তৎক্ষণাৎ একটি সুসজ্জিতা মহিলা নোট নেবার খাতা আর কলম হাতে ঘরে ঢুকলেন। অলোকনাথ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিসেস মজুমদার, আমার ছেলেকে একটু খুঁজে বের করতে পারেন ? নিজের ডিপার্টমেন্টে যে সে নেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অন্য যেখানেই আড্ডা দিক না কেন, তাকে এক্ষুণি একবার এখানে আসতে বলবেন ?'

'এখানে স্যার ? এই আপিসে ?' মিসেস মজুমদারের গলায় অকপট বিস্ময়।

'হ্যাঁ। এখানে। এই অফিসে।' বললেন অলোকনাথ, 'আর একটা কথা। এঁদের জন্যে কফি তৈরি রাখতে বলেছিলুম। দেখুন সেটা কতদূর হল।'

'আচ্ছা, স্যার।' বলে মিসেস মজুমদার বেরিয়ে গেলেন।

কফিটা এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু, অতিথিরা সেটা মুখে তোলবার আগেই হঠাৎ দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন প্রশান্ত ঘটক। আজকে তাঁর পরনে অফিসের পোশাক— গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট, সাদা শার্ট আর গাঢ় নীল আর মেরুনে ডোরাকাটা টাই।

ঘরে ঢুকেই অতিথিদের দিকে দৃকপাত না করে অলোকনাথকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই যে সাহেব, তোমার জন্যে একটু আগে কয়েক মিনিটের মধ্যে দু-দুজন মহিলার টেলিফোন পেলুম। কি

হয়েছে, কি ?'

সাহেব বললেন, 'তুমি মহিলাদের টেলিফোন পাবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? তার জন্যে আমাকে দায়ী করা কেন ?'

'আলবৎ তোমাকে দায়ী করব। তোমার গিন্নি, তোমার সেক্রেটারি এই অবেলায় আমাকে টেলিফোন করে কেন ? আমার কি কাজকর্ম কিছু নেই ?'

'তপতী তোমাকে ফোন করেছিল, বটে ? কি বলল সে ? তবে হ্যাঁ, আগে এসো, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।'

প্রশান্ত ঘটক অতিথিদের দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, 'দরকার নেই। পরিচয় হয়ে গেছে। এঁরা আমার বাড়ি গিয়েছিলেন এবং এই ভদ্রমহিলা বলে এসেছেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই আমাদের কারখানায় সাবোটাজ করছি। সেদিনই যে আমাকে গ্রেপ্তার করেন নি, সেই আমার পূর্বপুরুষের ভাগ্যি।'

'তুমি সাবোটাজ করছ বলে সন্দেহ করেছেন ? কেন !'

'সেটা পরে বলব। তা ওঁরা এখানে কি মনে করে ? তোমার কাছে আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন ?'

'না, আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। উনি বলছেন যে আমি নাকি বোমা মেরে কম্পানীকে ডুবিয়ে তার শেয়ার নিয়ে শর্ট সেলিং করছি।'

হঠাৎ প্রশান্ত ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু অলোকই কেন ? এ কাজ তো যে কোন শেয়ার হোল্ডারই করতে পারে ? আমিও করতে পারি।'

দময়ন্তী মাথা নাড়ল। বলল, 'না, যে কোন শেয়ার হোল্ডার পারেন না। পারেন তিনি যিনি বোমা বানাতে বা বোমা নাড়াচাড়া করতে পারেন, যেসব কারখানাগুলোর কথা বললুম সেখানে অবলীলাক্রমে ঢুকতে বেরুতে পারেন, সেই সব জায়গার প্রোডাকশন

ইউনিট বা উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে যেতে পারেন কারুর নজরে না পড়ে, কোন এক কোণায় বোমাটা রেখে আবার কারুর নজরে না পড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। এটা যে-কোন শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনার পক্ষেও সম্ভব নয়, কারণ আপনি সেলসের লোক। অন্য কোন সংস্থার উৎপাদন কেন্দ্রে সবার অলক্ষ্যে আপনার পক্ষে ঢোকা বা বেরুনো অসম্ভব। তাছাড়া, বোমা বানানো বা তা হাতে করে ঘুরে বেড়ানোও আপনার বা কোন অংশীদারের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি তো কোন পেশাদার লোক লাগিয়ে থাকতে পারি?'

'তা পারেন, কিন্তু সেরকম কোন সুপার এক্সপার্ট পেশাদার যদি কেউ কলকাতার অপরাধ জগতে থাকতো, তাহলে তাকে ধরতে পারুক না পারুক, পুলিশ ঠিক তার সন্ধান রাখত। কিন্তু সেরকম কেউ নেই।'

'তবে আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে একটা অবাস্তব গল্প ফেঁদে বসেছিলেন কেন?'

দময়ন্তী ক্ষীণ হাসল। বলল, 'গল্পটা অবাস্তব কিনা সেইটে যাচাই করার জন্যে।'

দময়ন্তীর কথার মধ্যেই আবার ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মিসেস মজুমদার সশঙ্ক মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'অতীন এসেছে স্যার।'

অলোকনাথ বললেন, 'এখানে পাঠিয়ে দিন।'

কিন্তু মিসেস মজুমদার দরজার পেছনে অদৃশ্য হবার আগেই প্রশান্ত হাত তুলে বললেন, 'দাঁড়াও, লীনা, এখুনি পাঠিও না। একটু অপেক্ষা করতে বল। আমি গিয়ে ডেকে আনব।'

মিসেস মজুমদার একটা ম্লান কৃতজ্ঞ হাসি হেসে বললেন, 'আচ্ছা স্যার।' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ অলোকনাথের দিকে ঘুরে বসলেন প্রশান্ত। বললেন, 'ব্যাপারটা কি। হঠাৎ তিন্নুকে ডেকে পাঠিয়েছ যে। এই এত বছরে,

কখনো তো দেখি নি। লীনার তো ধারণা যে আজই তিন্নুর শেষ দিন।'

অলোকনাথ বললেন, 'ও, তাই মিসেস মজুমদার তোমাকে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। অন্যায় কিছু করে নি।'

'নাঃ, অন্যায় আর বলি কি করে। ডু য়ু থিংক, শী ইজ দি লেটেস্ট ভিকটিম অফ ছাট স্টাড?'

'হাউ ক্যান য়ু বি সো মীন, অলোক? তুমি তিন্নুর চরিত্র জানো না? আফটার অল, হি ইজ এ স্পোর্টসম্যান। এসব ব্যাপারে ও কখনোই নেই। লীনা ওকে স্নেহ করে।'

'হ্যাঁ, যেমন তুমি করো, তপতী করে, মিস্টার অশোকনাথ ঘোষাল করেন। আর তাই আজ তোমার লীনা আর তপতী তোমাকে ফোন করে তিন্নুকে সাহায্য করতে বলেছে, নয়? মিস্টার অশোকনাথ ঘোষাল ফোন করেন নি?'

প্রশান্ত বিকৃত মুখে চুপ করে রইলেন। বোঝা গেল এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার কোন প্রবৃত্তি তাঁর নেই। অলোকনাথ বলে চললেন, 'কিন্তু প্রশান্ত, আজ যে প্রমাণ হবে যে আমার মানুষ চিনতে ভুল হয় না। আমি অনেক দিন আগে যখন বলেছিলুম যে তোমাদের তিন্নু এই বংশের মুখে চুনকালি দেবে, তখন তোমরা আমাকে গঞ্জনা দিয়েছিলে। আজ বোধ হয় তোমাদের ভুল শোধরাবার সময় এসেছে। যাও, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।'

প্রশান্ত বিস্ফারিত চোখে বললেন, 'তুমি প্রমাণ করতে চাইছ যে তিন্নু শেয়ার নিয়ে খেলছে আর সাবোটাজ করছে? তাই তুমি তপতীকে কাগজগুলো আনতে বলেছো? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না। প্রমাণ যা কিছু করার করবে ওই কাগজগুলো। যা অবশ্যম্ভাবী, সেটা ঘটতে দেওয়া মাথা

খারাপের লক্ষণ হতে পারে না, পারে কি ?'

'সত্যি তুমি উন্মাদ হয়ে গেছো। জানি না তিমু সত্যি সত্যি এই কাজ করেছে কিনা। যদি করেও থাকে, সেটা কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ছিল না। তোমার ক্রমাগত দুর্ব্যবহারের জন্যেই করেছে। তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে যা করেছ, তাতে যদি সে আজ অসামাজিক অপরাধীতে পর্যবসিত হয়, তাহলে আমি তাকে দোষ দিতে পারি না। দোষ তোমার। তুমি আজ পর্যন্ত যে কথাটা বুঝে উঠতে পারলে না তা হচ্ছে কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। নীতিবোধেরও না। সর্বমত্যন্তম গর্হিতম কথাটা তোমার নিশ্চয়ই শোনা আছে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্ত বললেন, 'যাকগে, আমার কি ? তোমার ছেলে মরল কি বাঁচল তাতে আমার কি এসে যায় ? তবে মনে রেখ, তিমু যদি শাস্তি পায়, তাহলে সে শাস্তিটা তোমারও প্রাপ্য।'

'শাস্তি আমি সারাজীবনই পেয়ে আসছি প্রশান্ত। যাও, তিমুকে ডেকে নিয়ে এসো। সময় নষ্ট করো না।'

অতীন্দ্রনাথ ঘোষাল সত্যিই অত্যন্ত সুদর্শন। যেমন অসাধারণ স্বাস্থ্য তেমনি সুন্দর মুখাবয়ব। গায়ের রঙ তার বাবারই মত। তার চলা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কিন্তু তার বাবার শীতলতা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং কিছু অতিরিক্ত উষ্ণতাই প্রকট। ঘরে ঢুকে সকলকে অগ্রাহ্য করে গটগট করে হেঁটে গিয়ে অলোকনাথের টেবিলের উল্টোদিকে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

অলোকনাথ বললেন, 'তোমার মা তোমাকে কিছু শেয়ার দিয়েছেন। সেই কাগজগুলো কোথায় ?'

অতীন্দ্রনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'আছে কোথাও, বাড়িতেই।'

'কোথায় আছে মনে করতে পারছ না ?'

ভুরু কুঁচকে অতীন্দ্রনাথ বলল, 'অনেকদিন আগেকার ব্যাপার

ঠিক মনে নেই। পবিত্র বলতে পারবে।'

'পবিত্র? সে বলতে পারবে কেন?'

'আমার যদ্দুর মনে পড়ে মার দেওয়া শেয়ারের কাগজগুলো ও-ই কোথায় যেন যত্ন করে তুলে রেখেছিল। কম্পানীর কাগজ নিয়ে কি সব লেকচারও দিয়েছিল। বলেছিল, যেখানে সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয়, ইত্যাদি।'

'চমৎকার! যাও, এক্ষুণি বাড়ি থেকে কাগজগুলো নিয়ে এস। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়।'

'ঠিক আছে!' বলে অতীন্দ্রনাথ অ্যাবাউট টার্ন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। ইনি মিসেস মজুমদার নন। লম্বা-চওড়া শরীর, গায়ের রঙ কালো নয়, কিন্তু ফর্সাও বলা চলে না। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত ছোট করে ছাঁটা, ধারালো নাক-মুখ, চোখে সরু কালো ফ্রেমের ফ্যাশনেবল চশমা। পরনে হাল্কা সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি, গায়ে কাশ্মিরী সুতোর কাজ করা সাদা স্টোল। কাঁধে লম্বা চামড়ার স্ট্র্যাপওলা সোয়েডের ব্যাগ।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢোকা মাত্র প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে 'এসো তপতী, আমরা তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।' বলে আপ্যায়ণ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। বোঝা গেল, ইনিই মিসেস ঘোষাল। এঁকে যে কী করে অশোকনাথ কুৎসিত বললেন, তা তিনিই জানেন। তবে শীর্ণকায় অলোকনাথের ছেলে যে তার মায়ের কাছ থেকেই লম্বা-চওড়া ফিগারটি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রশান্ত সকলের সঙ্গে তপতীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সহাস্যে সকলকে নমস্কার করলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুই চোখে একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা গোপন করতে পারলেন না। অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ হলে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর দিকে ফিরে

জিজ্ঞেস করলেন, 'তিমুকে দেখলুম এক ছুটে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল?'

প্রশান্ত যেন একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলে?'

তপতী বললেন, 'হ্যাঁ। আমাকে তো দেখতেই পেলো না। কোথায় গেল?'

'আমি ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছি ওর শেয়ারের কাগজগুলো আনবার জন্যে।' বললেন অলোকনাথ।

'আমি অমুর শেয়ারগুলো এনেছি। এতে হবে?' বলে তপতী তাঁর কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা বড় মোটা খাম বের করলেন।

অলোকনাথ তার ভেতর থেকে কতকগুলো বড় বড় সার্টিফিকেটের মত দেখতে ছাপানো কাগজ বের করে সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখে আবার খামের ভেতর ঢুকিয়ে রাখলেন।

তপতী আবার জিজ্ঞেন করলেন, 'এতে হবে?'

মাথা নাড়লেন অলোকনাথ। বললেন, 'নাঃ। তোমার ছেলের কাগজগুলো চাই।'

'কেন? কি আছে ওই কাগজগুলোর ভেতরে? আমি তো তোমার অফিসের শ্রীধরনকে দিয়ে ট্রান্সফার করিয়েছি। সে তো বলেছিল কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

'তা হয়তো নেই। গোলমাল অন্যত্র।'

'কিসের গোলমাল? কি করেছে তিমু? আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'আমি বলছি, মিসেস ঘোষাল।' বলল দময়ন্তী, 'ব্যাপারটা আপনারও জানা দরকার। আঘাতটা যখন আপনাকেও পেতে হবে...'

'আঘাত? কিসের আঘাত? আর কত সহ্য করতে হবে আমাকে?'

দময়ন্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বলল, 'তাহলে শুনুন।'

দময়ন্তী বলছিল, 'আপনি সাবোটাজগুলোর কথা তো শুনলেন। এখন প্রশ্ন হল, এই সাবোটাজগুলো কে করতে পারে? মনে রাখতে হবে, এগুলো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক বা একাধিক লোকের একটি গোষ্ঠী এই কাজটা করছে। এখন, আমরা যদি এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে কি দেখব? প্রথমত, এই ষড়যন্ত্রটি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে, সে হয় একটি অভিজ্ঞ, অসৎ ব্যবসায়ী যার এই ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় আছে, অথবা এমন একজন লোক যার অঙ্কে মাথা একেবারে পরিষ্কার। দ্বিতীয়ত, এই একই লোকের অথবা তার দলভুক্ত লোকেদের বিজ্ঞান সম্পর্কেও বেশ জ্ঞান আছে যাতে করে তার পক্ষে ছোট, বহনযোগ্য অথচ শক্তিশালী টাইম বোমা বানানো সম্ভব। তৃতীয়ত, যেসব জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই সব জায়গায় তার পক্ষে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে ঢোকা এবং বের হয়ে আসা সম্ভব। চতুর্থত, তার এই চারটে কারখানাতেই অবাধ গতিবিধি আছে। এবং পঞ্চমত, এই সব কম্পানীর শেয়ারের কাগজ তার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব।

'এই ধরনের কোন লোক বা গোষ্ঠীকে কি আমরা চিনি? যদি ধরে নিই যে এই কাজ করেছে কোন বাইরের লোক যার এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তাহলে সেটা মেনে নেওয়া কিন্তু বেশ কঠিন হয়। বরং এটা কোন ভেতরের লোকের কাজ, সেটাই অনেক সহজ সিদ্ধান্ত।'

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এরকম তো হতে পারে যে কোন বাইরের লোক ভেতরের লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে?'

'তা অবশ্যই হতে পারে। তখন সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, এই ভেতরের লোকটি কে? সে কি হোয়াইট স্টারের লোক না ডায়মণ্ড গ্লাস বা অন্য দুটো কম্পানীর লোক? আমরা জানি যে হোয়াইট স্টার বাকি

তিনটে সংস্থার কাছ থেকে মাল কেনে অর্থাৎ হোয়াইট স্টার পারচেজার, বাকি তিনটে সাপ্লায়ার। এখন, সাপ্লায়ারের তরফের কোন লোকের পক্ষে পারচেজারের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে অবাধে ঘোরাঘুরি করা কি সম্ভব, না তার উল্টোটা? মিস্টার ঘোষাল কি বলেন?'

মিঃ ঘোষাল দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'অবাধে ঘোরাঘুরি করা কোথাও সম্ভব নয়। তবে পারচেজারের লোকের পক্ষে সাপ্লায়ারের কারখানায় যাওয়াই বেশি হয়ে থাকে।'

'তাহলে এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দরকার হবে। মিসেস ঘোষাল, আপনি কি জানেন যে কোন কোন কম্পানীর শেয়ার আপনি আপনার ছেলেকে লিখে দিয়েছেন। নাম বলার দরকার নেই, ক'টা কম্পানী বললেই হবে।'

তপতী একটু চিন্তা করে বললেন, 'সাতটা, হোয়াইট স্টারকে ধরে।'

'বেশ। আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, এই সাতটার মধ্যে চারটের কথা আমরা জানি। তাদের অবস্থা পড়তির দিকে। বাকি তিনটের অবস্থা কি?'

অলোকনাথ বললেন, 'তাদের মধ্যে দুটোর অবস্থা আমাদেরই মত।' বলে হঠাৎ চুপ করে কি চিন্তা করতে লাগলেন। একটু বাদে বললেন, 'আশ্চর্য, অন্যটার সঙ্গে আমাদের কম্পানীর আশ্চর্য মিল ছিল, কিন্তু আজ আর নেই।'

প্রশান্ত বললেন, 'রয়াল বেঙ্গল ইকুইপমেণ্ট লিমিটেড?'

অলোকনাথ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ। ওরা আর আমরা একই ধরনের ইকুইপমেণ্ট বানিয়ে থাকি। আমাদের দুজনেরই অবস্থা পড়তির দিকে ছিল। যে মস্ত অর্ডারটা আমাদের বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারতো, তার কিছুটা তো ওরাও পেয়েছিল। আজ ওদের দশ টাকার শেয়ারের দাম বাইশ

টাকায় উঠে এসেছে। আর আমাদের ?'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ওখানে কোন সাবোটাজ হয় নি ?'

'না। অন্তত আমার জানা নেই।'

'ওদের সিকিউরিটি কি আপনাদের ফ্যাক্টরির চেয়ে বেশি জোরদার ?'

'একেবারেই না।' বললেন প্রশান্ত, 'গুটিকয়েক লিকলিকে দরোয়ান। আর সিকিউরিটির যিনি ইন-চার্জ, তিনি আবার একটি পর্বতাকার মানুষ। তিনি গেটের কাছে দাঁড়ালে হয়তো চোর-ছ্যাঁচোররা ভয় পেত, কিন্তু তিনি হরদম নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। ফ্যাক্টরিতে ডাকাত পড়লেও উঠবেন কিনা সন্দেহ।'

দময়ন্তী বলল, 'তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই ঘটনাগুলোর যোগসূত্র হচ্ছে হোয়াইট স্টার। রয়াল বেঙ্গল ইকুইপমেণ্টের সঙ্গে হোয়াইট স্টারের কোন যোগাযোগ নেই, তাই সেখানে কোন সাবোটাজ হয় নি। অতএব যিনি নাটের গুরু তিনি এখানেই, মানে এই প্রতিষ্ঠানেই আছেন। এরকম কাউকে আপনি চেনেন, মিস্টার ঘোষাল ?'

অলোকনাথ কিছু বলবার আগেই প্রশান্ত বললেন, 'আমি চিনি।'

অলোকনাথ ব্যাকুল চোখ তুলে বললেন, 'কে ? কে ?'

'তার নাম শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ঘোষাল। যে পাঁচটি লক্ষণের কথা আপনি বললেন, তার সব ক'টিই এর মধ্যে প্রবল ভাবে বিদ্যমান। যেমন, প্রথমত, অঙ্কে এর মাথা প্রচণ্ড রকমের পরিষ্কার। সেদিন একটা রিপোর্টে দেখি সাতাশের সঙ্গে একান্ন যোগ দিয়ে দিব্যি অবিচলিত কলমে লিখেছে ছিয়াত্তর। আর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যদি সে কখনও হিসেব করে, তাহলে তার ডিপার্টমেণ্টের অন্তত চারজন সেই হিসেব চেক করে নেয়। দ্বিতীয়টা যেন কি বললেন ? ও হ্যাঁ, বিজ্ঞানে জ্ঞান ? সেও অসাধারণ। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম,

বল তো ব্যাটা, ইলেকট্রিক তারে দুটো তার থাকে কেন ? সে বললে, খুব সহজ, একটা দিয়ে কারেন্ট আসে, অন্যটা দিয়ে ফিরে যায়। তৃতীয়টা ছিল এই চারটে কম্পানীতে তার অবাধ গতিবিধি আছে কিনা ? হোয়াইট স্টারে আছে, তবে অন্য তিনটেতে আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এসব ক্ষেত্রে সে অবশ্য লোক লাগিয়ে বোমা বসাতে পারে। চতুর্থ বোধ হয় বলেছিলেন সকলের অলক্ষ্যে সে ঘোরাঘুরি করতে পারে কিনা। মানে, সে কোন প্রোডাকশন য়ুনিটে গেল, এদিক ওদিক ঘুরল, বেরিয়ে চলে এল, তখন সবাই তাকে দেখল অথচ খেয়াল করল না, এই তো ? এটা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ সে পার্সোনেলের লোক, তার কাজ অফিসে, কারখানার ভেতরে নয়। তবে সেক্ষেত্রেও সে লোক লাগাতে পারে। পঞ্চমত, শেয়ার বা কম্পানীর কাগজ। সে তো তার আছেই। তার মা দিয়েছেন। কিন্তু সে জানে যে খুব সম্ভবত সেটা তার বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। অতএব, সেগুলো সোজাসুজি বিক্রি করে দিলে অনর্থ হবার সম্ভাবনা। তাই সে শর্ট সেলিং করেছে। আর তাছাড়া তার হাবভাবটা লক্ষ্য করেছেন ? তার বাবা তাকে শেয়ারের কাগজগুলো আনতে বলা মাত্র সে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোন ইতস্তত করা নেই, কোন আমতা আমতা করা নেই, কোনরকম সময় নষ্ট নেই। যার মনে কোন পাপ আছে সে-ই তো এরকম করে, তাই না ?'

অতীন্দ্রনাথের গলা আবার হিমশীতল হয়ে এল। বললেন, 'তোমার বিদ্রূপগুলো বাজে-খরচা হচ্ছে, প্রশান্ত।'

প্রশান্ত সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। বললেন, অতএব, বিনা দ্বিধায় আপনারা ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। সেখানে তাকে আড়ং ধোলাই দিলে সে হয়তো সবই স্বীকার করে নেবে।'

প্রশান্তর কথা শুনে তপতী শিউরে উঠলেন।

অলোকনাথ বললেন, 'তোমার এত বড় লেকচারটার উদ্দেশ্য কি, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, প্রশান্ত। তুমি এঁদের দৃষ্টি তিমুর ওপর থেকে সরিয়ে অন্য একজনের ওপর দিতে চাইছ। হ্যাঁ, একথা সত্যি যে তার অঙ্কে মাথা আছে, সে ইঞ্জিনীয়ার, ইনসপেকশনে আছে বলে আমাদের এবং সাপ্লায়ারদের কারখানায় তার অবাধ গতিবিধি এবং হয়তো অগোছালো তিমুর আলমারি থেকে শেয়ারের কাগজপত্রও তার পক্ষে বের করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এ কাজ সে করবে কেন? তার কিসের অভাব? তাছাড়া, তুমি জানো যে সে মিথ্যে কথা বলে না। আমি এক্ষুণি তাকে ডেকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি, দেখি সে কি উত্তর দেয়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। আমি জানি তুমি তাকে পছন্দ করো না। আশ্চর্য, যার জন্যে আমাদের গর্বিত বোধ করা উচিত, তাকেই তুমি অপছন্দ করো।'

প্রশান্ত অবিচলিত মুখে বললেন, 'তোমার লেকচারটাও বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। তোমার সেই জুয়েলটিকে যদি ডাকতে হয় তো ডাকো।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। তবে, একটা কথা। তাকে কেবল আপনি নন, আমরা সবাই প্রশ্ন করব।'

তপতী বললেন, 'কী যে ঘটেছে, তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি, তিমুই বলুন আর পবিত্রই বলুন, দুজনের কেউই কোন অপরাধ করে থাকতে পারে না। তিমু হয়তো লেখাপড়ায় ভাল নয়, পড়ার টেবিলের চেয়ে খেলার মাঠেই ওর মন বেশি পড়ে থাকে, কিন্তু লেখাপড়ায় ভাল না হলেই কি গুণ্ডা-বদমাইশ হতে হবে? পবিত্র সত্যিই সব দিক দিয়ে আদর্শ ছেলে, তার পক্ষে কোন অন্যায় কাজ করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা এই ছেলেদুটোকে ছাড়া আর কাউকে কি ধরতে পারেন না?'

প্রশান্ত বললেন, 'ছুটোকে কোথায়? ধরা তো হয়েছে একটাকে। এই কম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং বলেছেন যে ছেলেটা বদমাইশ, ক্রিমিন্যাল। তার কারণ, সে লেখাপড়ায় দিগগজ নয়, সে খেলাধুলো ভালবাসে, দেশের দশের দুরবস্থা আর অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে কোনমতেই মাথা ঘামাতে রাজী নয়। সে আনন্দ করতে চায়, লাফাতে চায়, হাসতে চায়—সে ক্রিমিন্যাল হবে না তো কে হবে? আর ছেলেটার জিদও আছে। কতদিন বলেছি, তিনে, এখানে থাকিস নি, অন্য কোথাও চাকরি ছাখ। তোর মত স্পোর্টসম্যানকে অনেক কম্পানী লুফে নেবে। তা শুনল আমার কথা? না, এখানেই থাকবে, বাবার কাছে প্রমাণ করে দেবে যে সে অপদার্থ নয়। এখন? জেলে পচে মর!'

অলোকনাথ অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রশান্ত, তুমি বড্ড বেশি বকবক করছো। আগে পুরো ব্যাপারটা শেষ হোক, তারপর যা বলবার বলো।'

দময়ন্তী বলল, 'মিস্টার ঘটক, আপনি সত্যিই অকারণে আপনার বন্ধুর ওপর রাগ করছেন। তিনি যে তাঁর ছেলের ওপর অসন্তুষ্ট, তার জন্যে তাঁর জীবনের ঘটনা পরম্পরা যতটা দায়ী, তাঁর আপন মানসিকতা হয়তো ততটা নয়। আপনি যখন ওঁকে বিদ্রূপ করছেন, তখন আঘাতটা গিয়ে লাগছে একটা অসহায় মনে।'

প্রশান্ত বললেন, 'বুঝিয়ে বলুন।'

'আপনি তো তাঁকে অনেক দিন থেকেই চেনেন। অল্প বয়েসে ইনি ছিলেন একজন প্রচণ্ড আদর্শবাদী এবং গুরুতর রক্ষণশীল রাজনীতিক। এই আদর্শবাদ ও রক্ষণশীলতার জন্যে কখনও আবার কাজেও ফাঁকি দেন নি। ফলে, তাঁর জীবনে উন্নতি এল অবশ্যম্ভাবী রূপে। তখন উনি বোধ হয় এই বলে নিজের সঙ্গে আপোষ করলেন যে উন্নত অবস্থার মধ্য দিয়েই উনি ওঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসগুলোর আরও ভাল রূপ দিতে পারবেন। এদিকে এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

এল ক্ষমতা, এল অর্থ, এল প্রতিপত্তি। তখন আবার আপোষ। এই ক্রমাগত আপোষ একটি রক্ষণশীল মনের ওপর কী পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তা বোঝবার ক্ষমতা আমাদের মত সাধারণ মানুষের নেই। নেই, তার কারণ, আমরা তো প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে সব কিছুর সঙ্গেই আপোষ করে চলেছি।

'এই মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে যাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন মনের মিলের জন্যেই। কিন্তু তখন তাঁর সন্তান হয়েছে। তিনি আপনার বন্ধুকে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল, ততটা দিতে পারেন নি। ফলে, সান্ত্বনা পাওয়া তো দূরের কথা, আপনার বন্ধুর মনে রাগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। আর সেই রাগ গিয়ে পড়েছে তাঁর ছেলের ওপর। এমনিতেই পোসেসিভ বাপেদের তাদের ছেলেদের ওপর অল্পবিস্তর যৌন ঈর্ষা থাকেই। তার ওপর এক্ষেত্রে আপনার বন্ধুর মনে হল যে তাঁর ছেলে তাঁর স্ত্রীকে কেবল তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাই নয়, তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকেও বিচ্যুত করল। সেই ছেলে যত বড় হতে লাগল আর দেখা যেতে লাগল যে সে তার বাবার পছন্দসই আদর্শবাদী ছেলে তৈরি হচ্ছে না, রাগ ততই বাড়তে লাগল। তার মা যে তাকে গোপনে মদত দিয়ে থাকেন, আদর্শ মানেন না, তাতে রাগের আগুন আরও বাড়ল বই কমল না। এরই পাশাপাশি এল পবিত্র, আদর্শ ছেলে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সমস্ত অপত্য স্নেহটা গিয়ে পড়ল এর ওপর। তাই বলছি, আপনি অকারণে রাগ করছেন, মিস্টার ঘটক। এটা আপনার অনুচিত হচ্ছে।'

দময়ন্তী চুপ করল। প্রশান্ত আর অলোকনাথ, দুজনেই কি যেন বলতে গিয়েও না বলে চুপ করে রইলেন। কেবল দেখা গেল, তপতীর দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল পড়ে যাচ্ছে।

শিবেন নৈঃশব্দ ভেঙে বলল, 'আপনার বিশ্লেষণ৷ বড় নিষ্ঠুর হল, বৌদি।'

দময়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, তা অবশ্য হল। তবে কি জানেন, নিজের স্বরূপ জানা থাকে না বলে আমরা আমাদের নিজেদের সঙ্গে শত্রুতা করি, নিজেরা নিজেদের ঠকাই। আমরা যদি নিজেদের আসল চেহারাটা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ না করি, তাহলে কিন্তু অনেক মানসিক যন্ত্রণা, অনেক অন্যায় কাজের হাত থেকে বাঁচতে পারি। যেমন ধরুন, সম্পত্তিকর বাঁচানোর জন্যে মিস্টার ঘোষাল নিজের অনেক শেয়ার বেনামী করেছেন, তাতে তাঁর ভেতরে নিজের ওপরে যে রাগের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা তিনি আরোপ করেছেন ছেলের ওপর। তাকে বঞ্চিত করে নিজে শান্তি পাচ্ছেন। তিনি যদি নিজের সম্পর্কে নিষ্ঠুর বিশ্লেষণটা সাহস করে করতেন, তাহলে এই কষ্টটা তাঁকে পেতে হত না।'

অলোকনাথ ম্লান হেসে বললেন, 'আপনার বিশ্লেষণটা অবশ্যই খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু সমালোচনার অযোগ্য নয়।'

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই দরজা খুলে একটি তেইশ-চব্বিশ বয়সের ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। রোগা, বেঁটেখাটো চেহারা, মাথার চুল কদমছাঁট করে কাটা, চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটের ওপর একজোড়া মোটা গোঁফ, পরনে সাদা শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্স। মুখে একটা শান্ত বিষণ্ণতা। একনজরে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে অলোকনাথকে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

অলোকনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, পবিত্র। এসো, বসো। এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে? পরিচয় করিয়ে দি।' বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করানো হল।

পবিত্র বলল, 'এঁরা এসেছেন কেন? কোন গণ্ডগোল হয়েছে কি?'

অলোকনাথ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ, শেয়ার নিয়ে আর আমাদের কারখানায় যে বোমা ফেটেছিল, তাই এঁরা তদন্ত করতে

এসেছেন।'

'শেয়ার নিয়ে? তাই কি তিনু আমার কাছে ওর শেয়ারগুলো কোথায় আছে তা নিয়ে খোঁজ করতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। তুমি জানো শেয়ারগুলো কোথায় আছে?'

'জানি বৈকি। ও তো বড্ড অগোছালো ছেলে। ওর সব জিনিসপত্রের খোঁজ আমাকে রাখতেই হয়। শেয়ারগুলো কোথায় আছে বলে দিয়েছি।'

হঠাৎ দময়ন্তী প্রশ্ন করল, 'অতীন্দ্র যখন আপনাকে এই খোঁজ দিতে বলেছিল, তখন আপনি নিশ্চয়ই আরও দু-তিনজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'অতীন্দ্র যদি আপনাকে আড়ালে প্রশ্নটা করত, তাহলেও কি আপনি বলতেন যে শেয়ারগুলো কোথায় আছে সে খবরটা আপনিই দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, বলতুম বৈকি। মিথ্যে কথা আমি বলি না।'

'তাই নাকি? অতীন্দ্রের কত টাকার শেয়ার আপনি কেনাবেচা করেছেন?'

'আমি? শেয়ার? কি বলছেন? আমি জীবনে শেয়ার কেনাবেচা করি নি।'

'আপনার বয়েস খুব কম, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে শেয়ার কেনাবেচার গলিঘুঁচিগুলোর সঙ্গে আপনার এখনও পরিচয় হয় নি। তাহলে, সেক্ষেত্রে আপনার ভরসা এই কম্পানীরই শেয়ার ডিপার্টমেন্টের কোন লোক যিনি শেয়ার ব্রোকারদের সঙ্গে সম্ভাব্য মক্কেলদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাদের মাধ্যমে কেনাবেচায় সাহায্য করেন। প্রশান্তবাবু, এরকম কোন লোক কি এই প্রতিষ্ঠানে আছেন?'

প্রশান্ত বললেন, 'আছেন। কর্পোরেট সেকশনের শ্রীধরন এই

কাজ করে থাকে। আমাদের কম্পানীর যারা শেয়ার কেনাবেচা করে, তারা ওর মাধ্যমেই করে।'

'বেশ। এই শ্রীধরনকে ডেকে যদি আপনি চাকরি চলে যাবার এবং হাজতবাসের ভয় দেখান, তাহলে কি সে বলবে যে সে গত এক বছরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ছেলের শেয়ার কেনাবেচা করেছে কিনা, এবং কার কথায় করেছে?'

প্রশান্ত পুলকিত মুখে বললেন, 'আলবৎ বলবে। লোকটা একটু অসৎ, টাকাপয়সার প্রতি লোভও আছে, কিন্তু প্রচণ্ড ভীতু। অলোককে আর আমাকে তো যমের মত ডরায়। আর তারপর ধরাচুড়ো পরা পুলিশের ত্র্যহস্পর্শ যোগ। দাঁড়ান, ওকে এক্ষুণি ডাকছি।'

পবিত্র তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলল, 'দাঁড়ান কাকাবাবু, শ্রীধরনকে ডাকার দরকার নেই। আমি সত্যি সত্যি শ্রীধরনকে দিয়ে তিন্নুর শেয়ার কেনাবেচা করেছি। তিন্নু আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল যেন এই কাজটি আমি গোপনে করে দি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে কাউকে বলব না। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলুম না।'

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, 'গোপনে কেনাবেচা করতে বলেছিল কেন?'

'ওর ধারণা, এই ধরনের কাজ করলে মেসোমশাই ভয়ানক অসন্তুষ্ট হবেন। অথচ, ওর টাকার খুব দরকার ছিল।'

'শ্রীধরনের কাছে সে নিজে গেল না কেন?'

'শ্রীধরনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়। এই অফিসে অনেকের সঙ্গেই তিন্নুর সদ্ভাব নেই।'

'কত টাকার লেনদেন হয়েছে?'

'প্রায় এক লক্ষ টাকা।'

'বটে? এত টাকার তার দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ। শুনেছি সম্প্রতি ও কিছু বদ নেশা ধরেছিল। কিন্তু কি নেশা তা আমি জানি না।'

'ও, তাও শুনেছেন? চমৎকার। তা, যে চায়টে ফ্যাক্টরিতে সাবোটাজ হয়েছে, সেগুলোও কি অতীন্দ্রই আপনাকে করতে বলেছিল?'

'সাবোটাজ? সে সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানি না। শেয়ার সম্পর্কে জানি। তিমু বিক্রি করেছে, তিমু কিনেছে, টাকা ও পেয়েছে, আমি কেবল কাগজগুলো শ্রীধরনকে পৌঁছে দিয়ে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছি। এ ছাড়া আর আমার কিছুই জানা নেই।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স কাকে বলে জানেন?'

'জানি।'

With Compliments from :-

Phone : 35-9202

BHOLANATH TIN WORKS

Manufacturers of all shorts of Metal & Tin Boxes.
Fancy Screw Caps (Aluminium, Tin, Brass etc.)

102, Raja Dinendra Street,
Calcutta-700006

'আচ্ছা, প্রশান্তবাবু, আপনাদের সাপ্লায়ারদের ফ্যাক্টরিতে ইন্সপেকশনে কবে কবে কে কে গেছেন, তার গত এক বছরের কোন রিপোর্ট আছে কি?'

'আছে বৈকি। এমন কি কোন কোন বিশেষ দিনে আর কে কে সেখানে গেছেন অথবা যান নি, তারও হিসেব আছে।'

পবিত্র একটু উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'যেখানে সাবোটাজ হয়েছে সেখানে সেইদিন যদি আমি গিয়ে থাকি, তাতে প্রমাণ হয় না যে আমিই সাবোটাজ করেছি।'

দময়ন্তী বলল, 'না, তা হয় না। কিন্তু যে যে কম্পানীর শেয়ারের দাম বাজারে পড়ে গেলে যদি কারুর সুবিধে হয়, আর ঠিক সেই সেই কম্পানীর শেয়ার নিয়েই যদি তিনি কেনাবেচা করেন, তাহলে সেই সব ক'টা কম্পানীর সাবোটাজের দিনে সেখানে তাঁর উপস্থিতি কিছু একটা প্রমাণ করে বৈকি।'

অলোকনাথ হাত নেড়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ব্যস, ব্যস। যথেষ্ট হয়েছে। পবিত্র, এ কাজ তুমি কেন করলে? আমি তোমার কী অপকারটা করেছি বলতে পারো?'

পবিত্র দৃঢ় ভাবে বলল, 'আমি কিছুই করি নি মেসোমশাই। এসব ষড়যন্ত্র। আমার বিরুদ্ধে কোন কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।'

দময়ন্তী মৃদু হেসে বলল, 'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ব্যাপারটা আপনি যতটা ফেলনা ভাবছেন ততটা কিন্তু নয়।'

এই কথার মধ্যে পুনরায় দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন মিসেস মজুমদার। বিস্ফারিত চোখে উর্ধ্বশ্বাসে তড়বড় করে বললেন, 'স্যার! রাজাবাহাদুর এসেছেন।'

তৎক্ষণাৎ অলোকনাথ আর প্রশান্ত সটান খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তপতী উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের এক কোণে চলে গেলেন যাতে সকলের চোখের আড়ালে থাকতে পারেন। বাকি তিনজন ইতস্তত করছিল, কিন্তু ঘরে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে তারাও উঠে

দাঁড়াল। রায়বাহাদুর অশোকনাথ ঘোষাল, পরনে থ্রী-পীস স্যুট, গলায় বো-টাই, একটু সামনে ঝুঁকে ধীর কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন। হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বলে নিজে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'আমি দুঃখিত মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল যে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই চলে আসতে হল।' বলে চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তপতী ঘরে আছেন কিনা দেখে নিয়ে বললেন, 'তারপর, দময়ন্তী, আসামী ধরা পড়ল?'

উত্তর দিলেন অলোকনাথ। বললেন, 'হ্যাঁ, একজন ধরা পড়েছে।'

বৃদ্ধ মৃদু হাসলেন। বললেন, বটে? সে কে?'

'তদন্ত এখনও চলছে। শেষ না হলে নাম বলা বোধ হয় ঠিক হবে না।' বলে পবিত্রর দিকে তাকিয়ে অলোকনাথ বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তবে, আমার অনুমতি ছাড়া অফিস থেকে বেরিয়ো না।'

পবিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই, অলোকনাথ টেলিফোন তুলে সম্ভবত সিকিউরিটিকে আদেশ দিলেন যেন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—

তাজা ফলের প্রাণরসে ভরপুর

প্রিক্স

জ্যাম, জেলি আচার

পবিত্রকে অফিস থেকে বেরুতে দেওয়া না হয়। তারপর শিবেনকে বললেন, 'আপনি সম্ভব হলে এক্ষুণি সার্চ ওয়ারেন্ট দিয়ে আমার বাড়িতে লোক পাঠান। পবিত্রর ঘর সার্চ করা উচিত। আমি জানি ওর ঘরে একটা ছোট ল্যাবোরেটরি মতন আছে, সেখানে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট সে করে থাকে।'

শিবেন বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে আপনার অপারেটারকে একটু লালবাজার দিতে বলবেন?'

অলোকনাথ পুনশ্চ ফোন তুলে মিসেস সাহাকে শিবেনের কথা মত লাইন দিতে বললেন।

প্রশান্ত গলা খাঁকারি দিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, এঁদের যিনি নিয়োগ করেছেন, শুনেছি তিনি এই কম্পানীর একজন শেয়ার হোল্ডার বা অংশীদার। সেই অংশীদারটি কি আপনি?'

রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'এরকম গাধার মত প্রশ্ন করো কি করে? জানো না, আমি আমার অংশ তিনকড়িকে লিখে দিয়েছি? তবে হ্যাঁ, নিয়োগ আমিই করেছি আর সেটা করেছি একজন অংশীদারের প্রতিনিধি হিসেবে।'

প্রশান্ত ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তিনু আপনাকে বলেছিল?'

'আবার! আবার সেই গাধার মত প্রশ্ন। তিনু কি এসব জানে, না বোঝে? আমি নিজেই তার প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেছি। তার অনুমতিটা যথাসময়ে নিয়ে নেওয়া যাবে অখন।' বৃদ্ধের মুখ তখন চাপা হাসিতে ফুসকায়িত।

দময়ন্তী বলল, 'মিস্টার ঘোষাল, আপনি কিন্তু গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন এই কীর্তিটি কার। তবুও একটা বিচ্ছিরি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছিলেন কেন?'

'তোমার এত বুদ্ধি দময়ন্তী, আর এইটে বুঝতে পারলে না?'

'আমি যা বুঝেছি, বলব?'

'বলো।'

'বাশিটিকুরির বিস্ফোরণটার পরেই আপনি ব্যাপারটা কি ঘটছে, তা ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা এমন ভাবে করা হয়েছে যে আপনি সোজাসুজি গিয়ে আপনার ছেলেকে কিছুই বলতে পারছিলেন না। তার কারণ, সবাই জানে যে অতীন্দ্রের প্রতি আপনার পক্ষপাত আছে, অতএব আপনি অন্য যার প্রতি দোষারোপ করছেন তাকে ফাঁসানোই যে আপনার উদ্দেশ্য, সেটাই আপনার ছেলের ভেবে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল। তখন যদি কম্পানীর কাগজগুলো পরীক্ষা করা হত, তখন দেখা যেত যে তাদের কেনা-বেচায় অতীন্দ্র ছাড়া অন্য কোন লোকের চিহ্নমাত্র নেই। তখন যদি ঐ ধরনের খোঁজ পাওয়া যেত, তখন তাকে কেউ চাকরি যাবার বা হাজতবাসের ভয় দেখাতো না এবং তখন সে যেসব মিথ্যে কথা বলতো, সেগুলো সত্য বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা বোধ করত না। ষড়যন্ত্রকারীটি তখন বেশ সুচারু রূপে অতীন্দ্রর সর্বনাশটি করে

With Best Compliments of :-

ROY ENTERPRISES

26/1A, Paik Para Row,

Calcutta-37.

মাসিমা-মেসোমশাইয়ের সংসারে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসতো। আর মেসোমশাইয়ের শরীর খারাপ, বেশি উত্তেজনা সয় না। নিজের ছেলে জেলে গেছে, এ ধাক্কাটা বেশিদিন আর সইতে পারতেন না।

'তখন আমাকে এই কাজে লাগিয়ে আপনি আমাদের ভুল পথে চালালেন। ফলে, নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের বন্ধুর পথে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে হল। আমি বাইরের লোক, আমার কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকার কথা নয়। অতএব, আমার যুক্তিগুলো সবাইকে মন দিয়ে শুনতে হল। এবং, যেহেতু সকলেই বুদ্ধিমান লোক, অতএব সমস্ত ঘটনাটার স্বরূপ যুক্তির আলোয় সকলেই দেখতে পেলেন। তবে হ্যাঁ, কারুর কারুর চোখের সামনে কতগুলো মানসিক বিকারের পর্দা ছিল, রূঢ়ভাবে হলেও সেই পর্দা-গুলো আমাদের ছিঁড়ে দিতে হয়েছে।'

রায়বাহাদুর সহাস্য মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমার সবক'টি কথাই প্রায় ঠিক, কেবল একটি ছাড়া। আমি কিন্তু তোমাদের নেহাৎ ভুল পথে চালাই নি। কেবল অতীতের এক ঘটনাকে বর্তমানে এনে ফেলেছিলুম এই কারণে যে পাত্রপাত্রীদের নাম পাল্টে দিলে সেটা আজকের এই ব্যাপারেও সত্য। ভেবে ছাখ, এই ঘটনাটা আদৌ ঘটল কেন? অলোক যার নাম করতে চায় না, সে ছেলেটি যে ব্রিলিয়াণ্ট তাতে তো সন্দেহ নেই। তা নাহলে এরকম একটা ষড়যন্ত্র তার মাথা থেকে বেরোয়? কিন্তু প্রশ্ন হল, এ হেন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে এরকম একটা কাজ করতে গেল কেন? তিনকড়িকে এইভাবে না ফাঁসালেও, একদিন না একদিন তার বাপ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হত। এই নিষ্ঠুরতার কি দরকার ছিল? আসলে কি জানো দময়ন্তী? সম্পত্তিটা বড় কথা নয়, এটা ক্রাইম প্যাশিওনেল বা রিপুজনিত অপরাধ। আষাঢ়ে গল্পটা বলার একটা উদ্দেশ্য ছিল এই ইঙ্গিতটা দেওয়া যে ঈর্ষা এবং প্রতিহিংসা—এই দুটো ব্যাপার যেন তোমার

দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।'

দময়ন্তী রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'বৈদেহী? আমি এইরকমই সন্দেহ করেছিলুম!'

'দোষ তার নয় দময়ন্তী। দোষ যৌবনের আর তার পুত্র ওই মিস্টার অলোকনাথ ঘোষালের। উনি আড়ালে ঘটকালি করেছিলেন। তাই না মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল?'

অলোকনাথ কোন জবাব দিলেন না। নিঃশব্দে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অতীন্দ্রনাথ। ঠাকুর্দাকে দেখে ফিক করে হেসেই গম্ভীর হয়ে তার বাবার টেবিলের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে একটা মোটা খাম তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। অলোকনাথ ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে না খুলেই প্রশান্তকে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওখানে কি আছে, আমি জানি। তবু একটু চেক করে দেখো।' তারপর মুখ তুলে ছেলেকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরুবে না আর

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—

স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধতার প্রতীক

রাজীব ঘি

প্রস্তুতকারক :

রাজীব ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম

১৫৯, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৪-৩৮৬৫

একটু ভদ্রস্থ পোশাক আশাক পরে থাকবে। আমি ডক্টর ব্রজেন চ্যাটার্জি আর বৈদেহীকে নিয়ে আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি আসব। বৈদেহীর বিয়ের কথাবার্তা বলবার জন্যে।'

অতীন্দ্রনাথের সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'সেখানে আমার থাকার কি দরকার ? পবিত্র থাকলেই তো হল।'

অলোকনাথ স্বভাবসিদ্ধ হিমশীতল গলায় বললেন, 'বাজে বকো না। তোমার সঙ্গে বিয়ে আর তুমি না থেকে পবিত্র থাকলেই হবে ?'

'আমার সঙ্গে ?' ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠল অতীন্দ্র। ঠাকুর্দার চেয়ারের পেছনটা ধরে যেন টাল সামলালো। আর ঠিক তক্ষুণি একটা অদ্ভুত আওয়াজে সবাই পেছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, তপতী একহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিস্ফারিত চোখে। সেই চোখে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ এবং হয়তো আরও অন্য কিছু।

প্রশান্ত অতীন্দ্রর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বুঝলি তিনে, তোর বাপ আমাকে তোদের বাড়ি আজ যেতে বলে নি বটে, কিন্তু আমি যাবই। তুই ব্যাটা যা ক্যাবলা, হবু শ্বশুরের সামনে কি করতে কি করে বসবি।'

অশোকনাথ বললেন, 'না। তুমি আজ সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে যাবে। আর যাবার সময় অনুকে নিয়ে আসবে। তিনকড়ি আসবে তার মোটর সাইকেলে বৈদেহীকে নিয়ে। আর মিস্টার অলোকনাথ ঘোষাল ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসবেন। আমি এখন বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

প্রশান্ত ঘটকের মুখটা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। খাবি খেতে খেতে বললেন, 'বৌমা, মানে, তপতী ?'

'আবার গাধার মত প্রশ্ন। তোমার নাম ঘোটক না হয়ে গর্দভ হওয়া উচিত ছিল। আমার বৌমা আর কে হতে পারে ? [illegible]

যদি বিয়ে করতে তাহলেও বা একটা কথা ছিল। আর হ্যাঁ, এই যে তোমরা। তোমরাও আসবে। আর সেন সাহেব, গিন্নিটিকে আনতে ভুলবেন না যেন।'

দময়ন্তী সহাস্যে মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই যাব। কেবল একটা শেষ প্রশ্ন। যিনি আপনাকে আমার নাম বলেছিলেন, অতীন্দ্রের আড়ালে বৈদেহীর সঙ্গে যে অন্য রকমের বিয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে তার খবর দিয়েছিলেন, অতীন্দ্র এবং বৈদেহীর মনের কথা যিনি জানিয়ে ছিলেন এবং আপনার সাহায্য চেয়েছিলেন, অতীন্দ্রকে যে ফাঁসানোর কোন রকম একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, সে বিষয়ে তাঁর ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সন্দেহের কথা বলেছিলেন এবং আজকে এই অফিসে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি কি একই ব্যক্তি?'

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই। তিনি ছাড়া আর কে হবেন?'

'তাই যদি হবে, তবে তাঁর সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর কথা বলেছিলেন কেন?'

'তার কারণ, তুমি যদি জানতে যে আমার সংবাদদাতাটি কে, তাহলে তুমি সোজাসুজি তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করতে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার অলোকনাথের তোমার ওপর সন্দেহ গড়ে উঠত। তোমার বিশ্লেষণ সে শুনতে হয়তো রাজীই হত না। তাছাড়া, একসময় আমি তাঁর ওপর অনেক অন্যায় করেছি। কিন্তু তিনি যে আজ সেসব কথা ভুলে গিয়ে আমাকে একটা প্রকাণ্ড অপরাধবোধের বোঝার থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সে কথা আমার পুত্র জানতে পারলে সে যে কী মূর্তি ধরতো, তা তো আমার জানা ছিল না। ব্যস, আর নয়। এসো বৌমা, আমাদের যাবার সময় হয়েছে।'

শিবেন জনান্তিকে দময়ন্তীকে বলল, 'বুড়োকে মোক্ষম বিশ্লেষণটি দিয়েছেন বটে—রামঘুঘু।'

সম্পাদক: রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

১২, হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬, গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅমিত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

MASIK ROMANCHA
PUJA ISSUE 1989

'সোনার আংটি উধাও'

এর পর

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন বই

অভ্র শুভ্রকে নিয়ে লেখা

উপন্যাস

গীতাঞ্জলি

এক্সপ্রেস

দুর্ঘটনা

শিগগিরই বেরোবে

Regd, No WB/NC-26
Price : Rupees Twenty Only